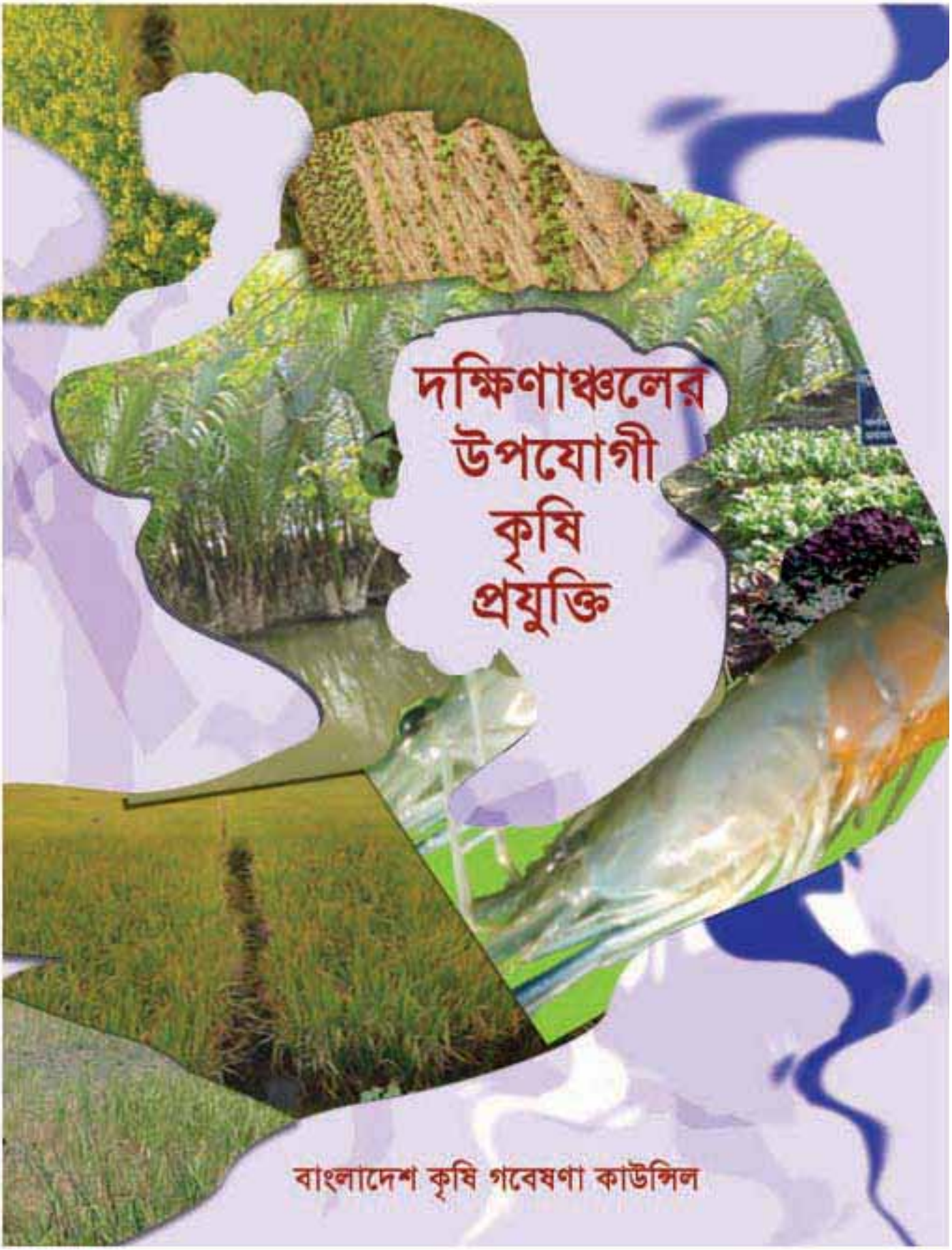

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি

সম্পাদনা পরিষদ

ড. এস এম খলিলুর রহমান
সদস্য-পরিচালক (এইআরএস)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ড. মোঃ আবুল কাসেম
পরিচালক (টিটিএমইউ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ড. মোঃ আবদুছ ছালাম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ড. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সগবি)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি
প্রকাশনায় লেখকের উদ্বৃতি
এস এম খলিলুর রহমান, এম এ কাসেম, এম এ ছালাম, এম এ কাইয়ুম। (২০১৩)
দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বিএআরসি, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশনায়
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা - ১২১৫

প্রচ্ছদ
মাফরুহা বেগম
সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ঢাকা

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০১৩

অর্থায়নেঃ
পিআইইউ-বিএআরসি-এনএটিপি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণঃ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৩৩০৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১

Minister
Ministry of Agriculture
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। এদেশের জলবায়ু সারা বছর ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী হলেও বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির জন্য ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি হতে খাদ্য ও পুষ্টি যোগান একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনহেতু বন্যা, খরা, লবনাক্ততা ও প্রাকৃতিক দৈবপাকে কৃষি উৎপাদন হুমকির মধ্যে পড়েছে।

দেশে নগরায়ণ ও শিল্প বানিজ্যের প্রসার ঘটছে দিন দিন। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে এবং মধ্যাঞ্চলে কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ হার আগামীতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, অতীতে ফসলের জন্য খ্যাত দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকলেও তার সঠিক ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে কৃষির বিরাট সম্ভাবনা। প্রচলিত ফসল উৎপাদন ছাড়াও অপ্রচলিত ও পুষ্টিকর স্থানীয় ফল (পেয়ারা, সফেদা, কদবেল, আশফল, করমচা, কাউফল, আমড়া, জামরুল, আতা ইত্যাদি) ইদানিং হারিয়ে যাচ্ছে। এসকল ফসল উৎপাদনে এ অঞ্চলের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি জমির প্রতিকূলতা দূর করা এবং উৎপাদনে এ অঞ্চলের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি জমির প্রতিকূলতা দূর করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা সম্ভব হলে এসব এলাকার ফসল উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞাননির্ভর ও মাঠ পর্যায় থেকে লব্ধ বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। ইতিমধ্যে, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু কর্মকান্ড এবং স্টাডি হাতে নেয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে কৃষি গবেষণার ফলে লবনাক্ততা, খরা, বন্যা, সহিষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক "দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি" শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল কৃষি সম্প্রসারনের সহযোগিতায় প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও পুষ্ঠি সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পুস্তিকাটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

দক্ষিণাঞ্চলে উপযোগী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে পুস্তিকাটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী)

Secretary
Ministry of Agriculture
Government of the People's
Republic of Bangladesh

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র দূরীকরণ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্লান তৈরি করা হয়েছে। উক্ত মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের জন্য "দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি" পুস্তিকাটিতে অত্র অঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সমূহ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে আগামীতে লবনাক্তা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে আগামীতে কৃষি উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এবং কৃষি উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগে পুস্তিকাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছেও পুস্তিকাটি সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি।

আমি পুস্তিকা প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)

মুখবন্ধ

কৃষি হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত যা কর্মসংস্থান এবং জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখে। এ দেশের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট। মোট জিডিপির প্রায় এক পঞ্চমাংশ কৃষি খাতের অবদান। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের কৃষি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলীয় এলাকার জমির লবণাক্ততা ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদন হুমকির মধ্যে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগ অতীতের চেয়ে বর্তমানে বেশি ঘনঘন ও তীব্রভাবে সংঘটিত হচ্ছে। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থান, রাস্তাঘাট তৈরি এবং শিল্পায়নের ফলে প্রতি বছর আবাদী জমি অকৃষি কাজে চলে যাচ্ছে। তাই ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কৃষি উৎপাদনকে দারুনভাবে ব্যাহত করছে এবং ভবিষ্যতে এসব সমস্যা আরও তীব্রতর হওয়ার আশংকা রয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে যা উপকূলীয় ১৪টি জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এ মাস্টার প্ল্যানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু বান্ধব অবকাঠামো তৈরি এবং ভূ-উপরিস্থিত পানি সেচ পদ্ধতির উন্নয়ন, লবণাক্ত পানিতে চিংড়ির এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র পরিসরে হাঁসমুরগী এবং গবাদিপশুকে সম্প্রসারণ করণ।

লাগসই ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন সম্ভব। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উদ্ভাবিত দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তিসমূহ সংকলিত করে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস উক্ত প্রযুক্তি বইটি দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির উন্নয়নসহ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

ওয়ায়েস কবীর
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি

প্রসঙ্গ কথা

দারিদ্র দূরীকরণ ও দেশের সুষম কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) যৌথভাবে দক্ষিণাঞ্চলের নিমিত্তে "Master Plan for Agricultural Development in the Southern Region of Bangladesh" তৈরি করা হয়েছে। উক্ত মাষ্টার প্লান তৈরিতে কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে মূল্যবান অবদান রাখার সুযোগ হয়েছিলো। মাষ্টার প্লান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত অঞ্চলের জন্য উপযোগী কৃষি প্রযুক্তিসমূহ বাছাই করে পুস্তিকা তৈরির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় আমাকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলোচ্ছাস, ঝড় ও অতিবৃষ্টির কারণে কৃষি উৎপাদন মারাত্বকভাবে হ্রাস পাওয়ার আশঙ্খা আছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য "দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি" পুস্তিকাটি গবেষক, কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই পুস্তিকা তৈরিতে নার্স ইনস্টিটিউটসমূহের প্রধানসহ দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ উপযোগী প্রযুক্তি সমূহ বাছাই ও তথ্য প্রদান করে স্বতঃস্বফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছে। এজন্য তাদেরকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাই। বিশেষ করে ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্য সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশনায় এবং পুস্তিকাটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তার জন্য পরিচালক পিআইইউকে, বিএআরসি, এনএটিপি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. এস এম খলিলুর রহমান
সদস্য-পরিচালক (এইআরএস)
বিএআরসি

সূচীপত্র

ভূমিকা	xi
ধান	০১
গম	২৩
ভুট্টা	২৯
তেল	৩৭
ডাল	৪৯
আখ	৫৩
পাট	৫৭
তুলা	৫৯
ফল	৬১
সবজি	১২২
পান	১৬২
মৎস্য	১৬৫
প্রাণিসম্পদ	১৭৭
বনজ গাছ	১৯০
মাটির লবনাক্তের মানচিত্র	২১০
তথ্য প্রদানকারী ইনস্টিটিউট ও বিজ্ঞানীবৃন্দের তালিকা	২১৩
তথ্য নির্দেশ	২১৪

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৯.২৯%। জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ বসতি স্থাপন, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণের কারণে প্রতি বৎসর প্রায় ০.৭২% হারে কৃষি জমি অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৪.৫০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কৃষির উন্নতির সাথে অংগাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৪৮.৪ লক্ষ হেক্টর জমি রয়েছে তম্মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগ আবাদযোগ্য এবং এই জমি থেকে আমাদেরকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ১৪টি উপকূলীয় জেলা নিয়ে গঠিত যাহা বাংলাদেশের মোট শতকরা ২৭ ভাগ (৩৯৬১৭ বর্গকিলোমিটার) এবং জনসংখ্যার ২১ ভাগ (২.৯৯ কোটি)। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব (৭৫৪ জন প্রতি কিলোমিটারে) কম। বাংলাদেশে খানাপিছু জমির পরিমান ০.৭৯ একর তবে দক্ষিণাঞ্চলে খানাপিছু জমির পরিমান ০.৭২ একর (বিবিএস, ২০১০)। এছাড়া বসতবাড়িতে জায়গার পরিমাণও জাতীয় পর্যায়ের (০.০৮ একর) চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলে (০.০৭ একর) কম। দক্ষিণাঞ্চলে জীবনযাত্রা প্রধানত কৃষি নির্ভর। বর্তমানে বাংলাদেশে ফসলের নিবিড়তা ১৯১% সে তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা (১৩৩%) যাহা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগি কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি নানাবিধ হুমকীর সম্মুখীন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য মাটি ও পানির লবনাক্ততা, জলবদ্ধতা, নদীর ভাঙ্গন, আইলা, বন্যা ইত্যাদি বৈরী পরিবেশ কৃষি উৎপাদনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ঝুকিপূর্ণ কৃষি এতদঅঞ্চলের খাদ্য নিরপত্তাকে সবসময় অনিশ্চিয়তার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখে। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশকে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে কৃষিকে বিনস্ত করে উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

উপকূলীয় এলাকায় তিনটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের অবস্থান রয়েছে, যথা গাঙ্গেয় কটাল পললভূমি (AEZ-13), নব্য মেঘনা মোহনা পললভূমি (AEZ-18) ও চিটাগাং উপকূলীয় সমতল ভূমি (AEZ-23)। যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক এলাকা গাঙ্গেয় কটাল পললভূমির আওতায় পড়ে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৭৩ সালে লবনাক্ত জমির পরিমান ছিল ৮.৩৩ লাখ হেক্টর, তাহা ২০০৯ সালে ১০.৫৬ লাখ হেক্টর (২৬.৭%) নতুন এলাকায় বিস্তৃত হয়। (মানচিত্র ১-৩) লবনের তীব্রতা প্রতি বছর ০.৭৪ হারে বাড়ছে তার প্রধান কারণ হল লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, নদীর উজান থেকে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ, স্লুইস গেট ও পোলডার এর দুর্বল ব্যবস্থাপনা, জোয়ার ভাটার সাথে নিয়মিত লবনাক্ত পানির দ্বারা ডুবে যাওয়া এবং কৌশিক প্রক্রিয়ায় লবন জমা হওয়া ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা ১১.৬১ ভাগ এলাকা লবনাক্ত এবং শুষ্ক মৌসুমে অনেক জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এর প্রধান কারণসমূহ, মাটি ও পানির লবনাক্ততা, বর্ষার পরে দেরিতে পানি নিষ্কাশন, সারা বছর ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা ১.০ মিটারের মধ্যে অবস্থান করা, অনুর্বর জমি, বর্ষায় রোপা আমন রোপনের সময় বেশি পানির অবস্থান, দেরীতে আমন ধান রোপন ও কাটা, দুর্বল পোলডার ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগব্যবস্থা এবং বাজারজাত করার অসুবিধা ইত্যাদি। এ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করতে হলে উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত সমস্যগুলির মধ্যে প্রধান সমস্যা হল মাটি ও পানির লবনাক্ততা। জমির লবনাক্ততার শ্রেনী বিভাগ অনুযায়ী খুব কম লবনাক্ত (S1, 2.0-4.0 dS/m), কম লবনাক্ত (S2, 4.1-8.0 dS/m), মধ্যম লবনাক্ত (S3, 8.1-12.0 dS/m), অধিক লবনাক্ত (S4, 12.1-16.0 dS/m), অত্যাধিক লবনাক্ত (S5, 16.0 dS/m), জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩.২৮, ২.৭৪, ১.৮৯, ১.৬২ এবং ১.০৩ লক্ষ হেক্টর। তবে মোট ১০.৫৬ লাখ হেক্টর লবনাক্ত জমির মধ্যে ৭.৯১ লাখ হেক্টর জমি ফসল উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময় যাহা প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে অধিক পরিমাণ ফসল ফলানো সম্ভব।

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হবে। ইতোমধ্যে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রায় ১৮০০ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বেশিরভাগ কৃষি প্রযুক্তি স্থানীয় মাটি, পানি ও জলবায়ুসহ কৃষকের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে ধান, পাট, আখ, ডাল, তেল, ফল, শাকসব্জির জাতসহ নানা ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জন্য উন্নত প্রযুক্তি বাছাই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বিগত ৩০ মার্চ ২০১৩ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তিসমূহ বাছাই করা হয় যাহা "দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি" বইয়ে এসকল প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করা হয়। সমন্বিত ভাবে বর্ণিত প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার কর্মীগণের জন্য বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কৃষির বিভিন্ন উপখাত অর্থাৎ ফসল, মৎস্য সম্পদ, প্রাণিসম্পদ ও বনজসহ বিষয়ভিত্তিক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করা হয়েছে যাহা কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষকের মধ্যে সেতু বন্ধন আরো সুদৃঢ় করবে এবং কৃষক পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকগণ পছন্দ অনুযায়ী বিবেচনা করে বইটিতে সন্নিবেশিত প্রযুক্তি সমূহের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘাটতি পুরনের সহায়ক হবে। প্রতিটি কৃষকের বাড়ি, জমি ও পুকুরে বইয়ে উল্লিখিত প্রযুক্তিসমূহের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য, পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধিসহ পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ফসলের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ক্ষমতা ইসিঃ (ডিসি/মিটার)

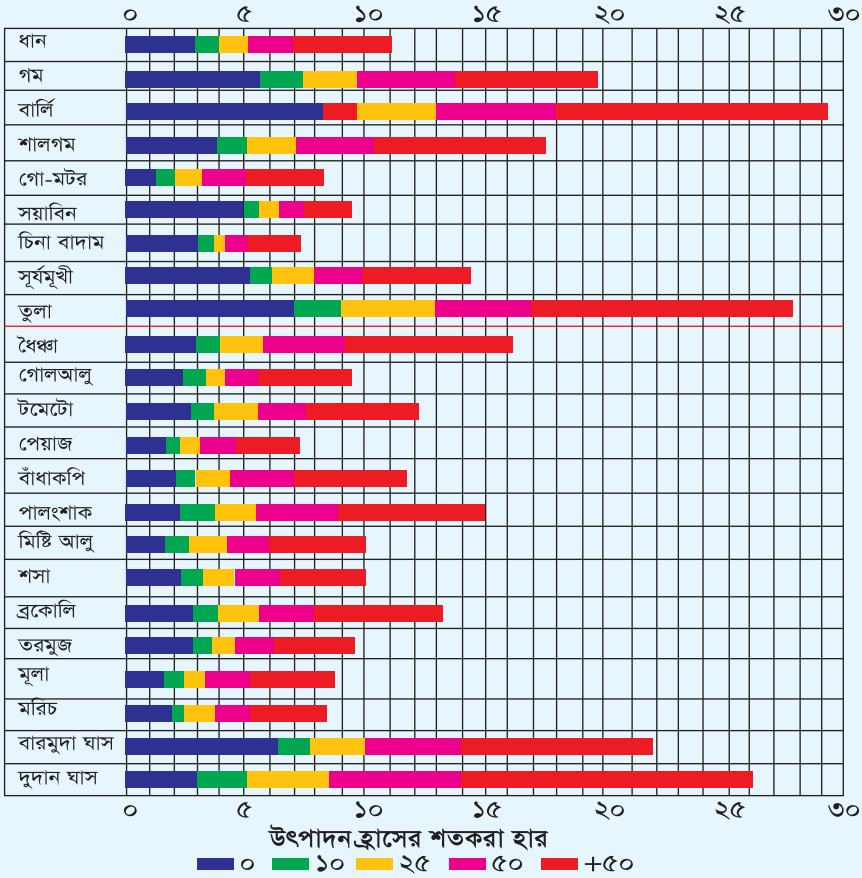

তথ্য সূত্রঃ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

ধান

ধান ফসলের চাষাবাদ কৌশল

***প্রযুক্তি ঃ* ধান চাষ**

লবণাক্ত জোয়ারভাটা অঞ্চলের ধান

বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের মাটিতে ও পানিতে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা বিদ্যমান। জমির অবস্থান এবং বৎসরের সময় ভেদে লবণাক্ততার মাত্রার তারতম্য হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত ব্যবহার করে এ অঞ্চলে অভিযোজিত শস্যের চাষ করা হয়। এ পরিবেশ অঞ্চলের লবণাক্ততার উৎস হল সাগরের পানি। নদী-নালা দিয়ে সাগরের পানি জোয়ারের সময় জমিতে প্রবেশ করে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততা বেশি এবং দূরবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততা কম হয়ে থাকে। এছাড়াও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে লবণাক্ততার তারতম্য ঘটে। শুষ্ক মৌসুমে মাটির নীচের পানি উপর উঠে এসে বাস্পীভূত হয়। ফলে মাটির নীচে অবস্থিত দ্রবীভূত লবণ পানির সাথে মাটির উপরে উঠে আসে এবং পানি যখন বাস্পীভূত হয় তখন লবণ মাটির উপর থেকে যায়। এ অবস্থায় শুষ্ক মৌসুমে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার বৃষ্টিপাতের সময় মাটির লবণ দ্রবীভূত হয়ে লবণক্ততা কমে যায়। বৃষ্টির পানিতে লবণ ধূয়ে নিচে নেমে যায় ফলে এ সময় মাটির উপরোস্থ লবণাক্ততা কমে যায়। এ ছাড়াও এ সময় অলবণাক্ত উজানের নদী প্লাবিত বন্যার পানি ও বৃষ্টির পানির কারণে লবণাক্ততা কমে আসে ফলে জোয়ারের মাধ্যমে সাগরের লোনা পানি জমিতে প্রবেশের মাত্রা কমে যায় বলে মাটির লবণাক্ততা কমে আসে। তাই দেখা যায় জুলাই/আগষ্ট মাসে মাটির লবণাক্ততা সবচেয়ে কম থাকে। পরবর্তীতে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে লবণাক্ততা মার্চ এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পূর্বে সবচেয়ে বেশি থাকে।

আমন মৌসুম

প্রযুক্তি ঃ ব্রি ধান৪০ (আমন জাতের চাষাবাদ কৌশল)

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ একটি উফশী ধানের জাত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে রাজাশাইল, কাজলশাইল, পাটনাই, মরিচশাইল, লক্ষীশাইল ইত্যাদি স্থানীয় জাতের আবাদ হয় সেখানে এ জাতটি আবাদযোগ্য। আলোক সংবেদনশীল জাত। গাছের উচ্চতা ১১৫ সেমি। কান্ড মজবুত তাই হেলে পড়ে না। চাল মাঝারি মোটা এবং ভাত খুব ভাল। শীষের অগ্রভাগে কোন কোন ধানের শুং থাকে। জীবনকাল প্রায় ১৪৫ দিন।

চিত্র : ব্রি ধান ৪০

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি তৈরি ঃ

- চারা রোপনের দুই সপ্তাহ আগে জমিতে পানি প্রবেশ করিয়ে চাষ ও মই দিয়ে আগাছা ও খড়-কুটা পচিয়ে নিতে হবে।
- ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে।

রোপন সময় ঃ ১৫-৩০ আষাঢ় (১-১৫ জুলাই)।

গাছের দূরত্ব ঃ ২৫ × ১৫ সেমি।

বীজের হার (হেক্টরপ্রতি) ঃ ২৫-৩০ কেজি।

বীজতলা তৈরি ঃ

- সেচ সুবিধাযুক্ত এবং প্রচুর আলো-বাতাস পায় এমন স্থান বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে।
- বীজতলার জমিতে এক সপ্তাহ আগে পানি ঢুকিয়ে চাষ ও মই দিয়ে ঘাস ও খড়-কুটা পঁচিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ভালোভাবে জমি চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে বীজতলা তৈরি করতে হবে।
- বীজ বপনের পর থেকে চারার শেকড় মাটিতে লেগে যাওয়া পর্যন্ত (৫-৭ দিন) সেচের পানি দিয়ে নালা ভর্তি করে রাখতে হবে। এতে বীজতলার মাটি নরম থাকে, গজানো বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং বীজতলাও শুকায় না।
- বীজ বপনের ৫-৭ দিন পর বীজতলায় ছিপছিপে অর্থাৎ ২-৩ সেন্টিমিটার (১.০-১.৫ ইঞ্চি) পানি রাখা হলে চারার বাড়তি ভালো হয়। পরে চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সমন্বয় রেখে পানির পরিমাণ ৩-৫ সেন্টিমিটার বাড়ানো যেতে পারে। তবে এর চেয়ে বেশি পানি রাখলে চারা লম্বা ও দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৫০	ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	৯০	
এমপি	৬৮	
জিপসাম	৬০	
জিংক সালফেট	১১	

আগাছা/পরিচর্যা ঃ রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

কর্তনের সময়কাল ঃ ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৫-৩০ অক্টোবর)।

ফলন ঃ ৪.৫ টন/হেক্টর।

প্রযুক্তিঃ ব্রিধান ৪১ (আমন) জাতের চাষাবাদ কৌশল

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ গাছের উচ্চতা ১১৫ সেমি। কুশি উৎপাদন মধ্যম। দানার আকার ও আকৃতি লম্বা ও মোটা, সাদা। লবণ সহিষ্ণুতা ৮ ডিএস/মিটার।

রোপন পদ্ধতি ঃ চারা রোপণ

বীজ বোনার সময় ঃ ২৫ জুন-১৫ জুলাই (১০-৩০ আষাঢ়)

বীজ হার ঃ ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর।

চারা রোপনের উত্তম সময় ঃ মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগষ্ট (শ্রাবণ থেকে ভাদ্র)। নাবীতে রোপনের শেষ সময় মধ্য ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট), এ ক্ষেত্রে ফলন কিছুটা কমে যাবে। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন, নাবীতে রোপনের জন্য ৪৫-৬০ দিন।

চিত্র : ব্রি ধান ৪১

রোপনের দূরত্ব ঃ রোপনের দূরত্ব সারি থেকে সারি ২৫ সেমি এবং সারিতে ২০ সেমি পর পর গর্তে ২-৩ টি চারা রোপন করতে হবে। নাবীতে রোপনের ক্ষেত্রে সারির মধ্যে ১০-১৫ সেমি পর পর গোছায় ৫-৬ টি চারা রোপন করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৪৫	ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর। শেষ কিস্তি চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর। অন্যান্য সার শেষ চাষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় হেক্টরপ্রতি ৫ টন ছাই শেষ চাষের সময় ব্যবহার করলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়।
টিএসপি	৮৭	
এমপি	৬৬	
জিপসাম	৫৯	
জিংক সালফেট	১০	

সেচ প্রয়োগ ঃ সেচ প্রয়োগের সময় খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ প্রদান করা যেতে পারে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দমন চারা রোপনের পর ৪০ দিন পর্যন্ত ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ ধানে সাধারণত মাজরা পোকা, লেদা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং থ্রিপস পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে এবং ডালপাতা পুঁতে আইপিএম পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জমিতে শতকরা ৫-২০ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ফলন ঃ ৪.৫ টন/হেক্টর

জীবনকাল ঃ ১৪৮ দিন

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য করণীয় ঃ

ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- পরিপুষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণের।
- কমপক্ষে শতকরা ৮০ টি বীজ গজায়।
- অন্য বীজের মিশ্রণ নেই। গায়ে কোন দাগ নেই।
- দাঁতে কাটলে কটকট করে। চিটা নেই।
- পোকায় খাওয়া এবং আগাছা বা অন্য ফসলের বীজের মিশ্রণ নেই।
- ভাল বীজ ব্যবহার করলে ধানের ফলন ১০-১৬ ভাগ বেশি হয়।

বীজের জমির পরিচর্যা

- পরিকল্পিতভাবে রগিং করতে হবে। রগিং হলো বীজের জমি থেকে সকল বিজাত, আগাছা এবং খোলপচা ও লক্ষীর গু আক্রান্ত শীষ বেছে ফেলা।
- তিনবার রগিং করতে হবে। প্রথমবার কুশিছাড়ার পর, দ্বিতীয়বার ধানের দুধ অবস্থায় এবং শেষবার ফসল কাটার ৭-৮ দিন আগে।

বীজ ধান কাটা

- জমির শতকরা ৮০ ভাগ ধান পাকলেই ফসল কাটতে হবে। কাটার সাথে সাথে পরিষ্কার স্থানে সম্ভব হলে ত্রিপলের উপর ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করে বীজের জন্য ধান আলাদা করে রাখতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ ঃ সাধারণত বীজ সংরক্ষণের সমস্যা হলো আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা। আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বেশি হলে বীজে পোকা ও ছত্রাকের আক্রমণ হয়। বীজ ভাল থাকে না।

ভাল বীজ ধানের জন্য করনীয় ঃ

- বীজ ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে আর্দ্রতা ১২-১৩% ভাগের নিচে থাকে।
- প্লাস্টিক ড্রাম, টিন, ধাতবপাত্র এবং রং করা মটকায় বীজ ভাল থাকে।
- পাত্রে ভরার আগে বীজ ঠান্ডা করে নিতে হবে।
- নিমপাতা, তামাকপাতা বা বিষকাটালীর গুড়া বীজের সাথে মিশায়ে দিলে ভাল হয়।
- পাত্রের মুখটি ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে বাতাস না ঢোকে।
- নিরাপদ জায়গায় বীজ পাত্র রাখতে হবে।

প্রযুক্তিঃ ব্রি ধান ৪৪ (আমন) জাতের চাষাবাদ কৌশল

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

'ব্রি ধান-৪৪' একটি রোপা আমন জাত। ধান গাছ প্রায় ১৩০ সেমি লম্বা হয় । কান্ড শক্ত ও হেলে পড়েনা। চাল মোটা। ফলন ৬.৫ টন/হেক্টর। জাতটির জীবনকাল ১৪৫ দিন। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্তমুক্ত জোয়ার-ভাটা কবলিত এলাকার জন্য এ জাতটি বেশি উপযোগী।

চিত্র : ব্রি ধান ৪৪

বীজ তলায় বীজ বপনোর সময় ঃ জুন মাসের শেষার্ধ।

বীজের হার ঃ ৩০ কেজি/হেক্টর।

রোপনের সময় ঃ জুলাই-মধ্য আগস্ট।

চারার বয়স ঃ ৩৫-৪০ দিন।

রোপন দূরত্ব ঃ লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি।

চারার সংখ্যা ঃ প্রতি গোছায় ২/৩ টি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৫০	ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি জমি তৈরির শেষ চাষে। ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২০-২৫ দিন এবং শেষ কিস্তি চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর। অন্যান্য সার শেষ চাষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	৯০	
এমপি	৬৭	
জিপসাম	৬০	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ খরা দেখা দিলে সমপূরক সেচ প্রদান জরুরী।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ ধানে সাধারণত মাজরা পোকা, লেদা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং থ্রিপস পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে এবং ডালপাতা পুঁতে আইপিএম পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জমিতে শতকরা ৫-২০ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ফসল কর্তন ঃ মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ।

ফলন ঃ ৫ টন/হেক্টর।

জীবনকাল ঃ ১৬০ দিন।

প্রযুক্তি ঃ ব্রি ধান ৪৬ জাতের চাষাবাদ কৌশল

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ জাতটি আলোক সংবেদনশীল। দিনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে গাছে ফুল আসে। তাই নাবীতে রোপন করলে কিছু না কিছু ফলন পাওয়া যায়। বন্যা আক্রান্ত এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ভাদ্র মাসের শেষ পর্যন্ত এ জাতটির আবাদ করা যায়। ব্রি ধান৪৬ রোপন করা হলে প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে হেক্টরপ্রতি ১-১.৫ টন ফলন বেশি পাওয়া যায়।

চিত্র : ব্রি ধান ৪৬

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ

বন্যা কবলিত এলাকায় যদি বীজতলা করার মতো উচু জায়গা না থাকে বা বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর চারা তৈরির প্রয়োজনীয় সময় না পাওয়া যায় তাহলে খালের পানির উপর কলাগাছের ভেলা করে ২-৩ সেমি কাদার প্রলেপ দিয়ে ভেজা বীজতলার মতো ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যায়।

বপন সময় ঃ ২০-৩০ শ্রাবণ বপন করে সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত রোপন করা যাবে।

চারার সময় ঃ ৩০-৪০ দিন।

রোপন দূরত্ব ঃ লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেমি। চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	৯০	পোলটি লিটার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং ৩-৪ দিন পর চারা রোপন করতে হবে। পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর ইউরিয়া এবং পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া ৪৫ কেজি দিতে হবে।
এমপি	১৭	
পোলটি লিটার	*৩ টন (শুকানো)*	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ জমি থেকে বন্যার পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জলজ আগাছাসহ অন্যান্য আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। এ সময়ে যদি গাছে পঁচা পাতা থাকে তা পরিস্কার করে দিতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার দরকার নেই। ধানের চারা রোপনের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে, যাতে রোপনকৃত চারার সহজে নতুন শিকড় গজাতে পারে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ রোগ ধানের অনেক ক্ষতি করে এবং ফলন কমিয়ে দেয়। এজন্য রোগ সনাক্ত করে তার দমন ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

ফসল কর্তন ঃ ২৫-৩০ অগ্রহায়ণ

ফলন ঃ ৩.৫ -৪.৭ টন/হেক্টর

প্রযুক্তিঃ ব্রিধান ৫৩ (আমন) জাতের চাষাবাদ কৌশল

চিত্র : ব্রি ধান ৫৩

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ উচ্চ ফলনশীল। গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি। চাল মাঝারি, মোটা। চিকন, চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণাক্ত সহনশীল। ব্রি ধান-৪১ জাতের চেয়ে ৮-১০ দিন আগে পাকে।

বীজ তলায় বীজ বপনের সময় ঃ ১৫ জুন - ১৫ জুলাই।

বীজের হার ঃ হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি।

রোপনের সময় ঃ ১৫ জুলাই - ১৫ আগষ্ট।

চারার বয়স ঃ ৩০-৩৫ দিন।

রোপন দূরত্ব ঃ লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৫২	ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর এবং শেষ কিস্তি চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর। অন্যান্য সার শেষ চাষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	৫১	
এমপি	৮০	
জিপসাম	৫৫	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ রোপণের পর ৫০-৫৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ প্রদান করা যেতে পারে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ ধানে সাধারণত মাজরা পোকা, লেদা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং থ্রিপস পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে এবং ডালপাতা পুঁতে আইপিএম পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জমিতে শতকরা ৫-২০ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ফলন ঃ ৪.৫ টন/হেক্টর।

জীবনকাল ঃ ১২৪ দিন।

প্রযুক্তিঃ ব্রিধান ৫৪ (আমন) জাতের চাষাবাদ কৌশল

চিত্র : ব্রি ধান ৫৪

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ উচ্চ ফলনশীল। গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি। চাল মাঝারি, চিকন। চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণাক্ত সহনশীল। ব্রি ধান-৪১ জাতের চেয়ে ২০-২৪ দিন আগে পরিপক্ক হয়।

বীজ তলায় বীজ বপনের সময় ঃ ১৫ জুন - ১৫ জুলাই ।

বীজের হার ঃ হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি ।

রোপনের সময় ঃ ১৫ জুলাই - ১৫ আগষ্ট ।

চারার বয়স ঃ ৩০-৩৫ দিন ।

রোপন দুরত্ব ঃ লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৫২	ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর এবং শেষ কিস্তি চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর। অন্যান্য সার শেষ চাষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	৫১	
এমপি	৮০	
জিপসাম	৫৫	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দমন রোপণের পর ৫০-৫৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে ।

সেচ প্রদান ঃ খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ প্রদান করা যেতে পারে ।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ ধানে সাধারণত মাজরা পোকা, লেদা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং থ্রিপস পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে এবং ডালপাতা পুঁতে আইপিএম পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জমিতে শতকরা ৫-২০ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে ।

ফলন ঃ ৪.৫ টন/হেক্টর ।

জীবনকাল ঃ ১৩৪-১৪০ দিন ।

প্রযুক্তিঃ ব্রিধান ৪৭ (বোরো) জাতের চাষাবাদ কৌশল

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট 'ব্রি ধান-৪৭' নামে একটি লবণাক্ততা সহনশীল জাত বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করে। সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বোরো মৌসুমে এ জাতটি চাষ করে বেশ ভাল ফলন পাওয়া গিয়েছে। জাতটির ডিগপাতা 'ব্রি ধান-২৮' এর চেয়ে চওড়া, খাড়া এবং লম্বা। চালের পেটে সাদা দাগ থাকে। তবে ধান সিদ্ধ করলে ঐ দাগ আর থাকে না। লবণাক্ত অঞ্চলে যেখানে সেচের পানির লবণাক্ততার মাত্রা ৪ ডিএস/মিটার পর্যন্ত আছে সেখানে অনায়াসেই বোরো মৌসুমে এর আবাদ করা যাবে ।

চিত্র : ব্রি ধান ৪৭

বীজ তলায় বীজ বপনের সময় ঃ ১৫ নভেম্বর - ১৫ ডিসেম্বর ।

বীজের হার ঃ হেক্টরপ্রতি ৩০ কেজি ।

রোপনের সময় ঃ জানুয়ারি ।

চারার বয়স ঃ ৩৫-৪৫ দিন ।

রোপন দূরত্ব ঃ লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	২২৪	ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর এবং শেষ কিস্তি চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর। অন্যান্য সার শেষ চাষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	১১২	
এমপি	১১২	
জিপসাম	৬০	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ রোপণের পর ৫৫-৬০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে ।

সেচ প্রদান ঃ সব সময় জমিতে ছিপ ছিপে পানি রাখতে হবে। রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর হতে দানায় দুধ আসা পর্যন্ত জমিতে ৮-১০ সেমি পানি রাখা ভাল। তবে দানা শক্ত হয়ে গেলে পানি সরিয়ে দিতে হবে ।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ ধানে সাধারণত মাজরা পোকা, লেদা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং থ্রিপস পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে এবং ডালপাতা পুঁতে আইপিএম পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জমিতে শতকরা ৫-২০ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে ।

ফসল কর্তন ঃ জমির ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলেই ফসল কাটতে হবে ।

ফলন ঃ ৫ টন/হেক্টর

জীবনকাল ঃ ১৫০-১৫২ দিন

লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত ঃ

লবণাক্ত অঞ্চলে আউশ মৌসুমে ধানের চাষ বেশ অসুবিধাজনক। প্রকৃত পক্ষে যে অঞ্চলে লবণক্ততা কম সেখানেই আউশ ধান চাষ করা যেতে পারে। বীজ থেকে চারা গজানোর পর ধান গাছের লবণাক্ত সহনশীলতা খুব কম থাকে। এ পর্যায়ে অল্প লবণাক্ততাতেই ধান গাছ মারা যায়। তাই বোনা আউশ ধান চাষ করা কষ্টসাধ্য। অন্য দিকে এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না বলে চারা রোপনের জন্য জমি কাদা করা যায় না, ফলে চারা রোপন করাও কষ্টসাধ্য। তবে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেলে আউশ ধানের পরবর্তী পর্যায় তেমন সমস্যা থাকে না। এ সকল দিক বিবেচনা করে কৃষকগণ প্রচলিত প্রথায় কিছুটা উঁচু জমিতে আউশ মৌসুমে স্বল্প জীবন কালের দেশি জাত চাষ করে থাকে। তবে বর্তমানে পোল্ডার দিয়ে ক্ষেতে লবণ পানি প্রবেশ করতে না দিয়ে আউশ ধান চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোল্ডার দিয়ে লবণ পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রন করে অন্য মৌসুমেও ধানের চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব ।

প্রযুক্তি ঃ ব্রি ধান২৭ (আউশ) ধানের জাতের চাষাবাদ ও কৌশল

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ আউশ মৌসুমে জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী । আগাম জাত। গাছের উচ্চতা ১৪০ সেন্টিমিটার। গাছের গোড়ার দিকে পাতার খোল কিছুটা বেগুনী রঙের। গাছ উচু হলেও ঢলে পড়া প্রতিরোধ করতে পারে। চাল মাঝারি মোটা এবং চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮% ।

বীজ বোনার সময় ঃ চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য মার্চ)

রোপন সময় ঃ বৈশাখ - জৈষ্ঠ (মধ্য এপ্রিল- মধ্য মে) ।

বীজের হার ঃ হেক্টরপ্রতি ৪৫-৫০ কেজি ।

চিত্র : ব্রি ধান ২৭

বীজ বপন ঃ

- বীজের হার ঃ হেক্টরপ্রতি ৭০-৮০ কেজি (ছিটিয়ে); ৪৫-৫০ কেজি (সরাসরি সারিতে)।
- সারি করে ঃ সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার এবং ৪-৫ সেমি গভীর সারি করে বীজ বুনতে হবে।
- ডিবলিং পদ্ধতিতে ঃ ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর ।

চারার বয়স ঃ ৩০ দিন।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৪৩	শেষ চাষের সময় সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রথম কিস্তি শেষ চাষের সময় এবং দ্বিতীয় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর।
টিএসপি	৫২	
এমপি	৭৩	
জিপসাম	২৭	

জোঁয়ার ভাটা প্রবণ এলাকায় ধানের চারা লাগানোর ৭-১০ দিনের মধ্যে যখন ভাটা হবে তখন প্রতি চার গোছার মাঝখানে ৫-৭.৫ সেমি কাদার গভীরে গুটি ইউরিয়া পুঁতে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ধান রোপণ করতে হবে সারিবদ্ধভাবে। সারি থেকে সারি এবং গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার। সাধারণত আউশ ও আমন ধানের জন্য ০.৯০ গ্রাম সাইজের দুটি অথবা ১.৮ গ্রাম সাইজের একটি এবং বোরো ধানের জন্য ০.৯০ গ্রাম সাইজের ৩ টি (২.৭ গ্রাম) অথবা বড় সাইজের (২.৭ গ্রাম) একটি গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করতে হবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে ১৫-২০ ভাগ ফলন বেশি পাওয়া যায় এবং শতকরা ২৫-৩০ ভাগ নাইট্রোজেন সার সাশ্রয় হয়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছাদমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।

ফসল কর্তন ঃ ১৫ আষাঢ় থেকে ৩০ শ্রাবণের (৩০ জুন-১৫ আগষ্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

ফলন ঃ ৪.০ টন/হেক্টর

জীবনকাল ঃ ১১৫ দিন

প্রযুক্তি ঃ বিনাধান-৭ (আমন) জাতের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তির বর্ণনা ঃ বিনাধান-৭ আমন মৌসুমের উপযোগী নতুন একটি জাত যা পরমাণু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভিয়েতনামের একটি জাত তাইনেগুয়েন হতে উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০০৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড এ জাতটিকে আগাম উচ্চ ফলনশীল আমন জাত হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়। দক্ষিণাঞ্চলে আমন মৌসুমে উচু বা মাঝারী উচু জমিতে সফলভাবে চাষ করা যায়।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ মাঝারি উচ্চতা (৯৫-১০০ সেমি)। আগাম পাকা জাত। ধান উজ্জ্বল রঙের। বেশ লম্বা ও চিকন, খেতে সুস্বাদু। ১০০০ ধানের ওজন ২৪.৯ গ্রাম। চাউলে অ্যামাইলেজের পরিমান ২৪.৫%। জাতটির পাতা পোড়া, খোল পচা ও কান্ড পচা রোগ ইত্যাদি প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

চিত্র : বিনাধান-৭

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ বেশি নিচু জমি (যেখানে দীর্ঘদিন পানি জমে থাকে) ব্যাতিত প্রায় সব ধরণের জমিতে চাষাবাদ করা যায়। বেলে দো-আঁশ এবং এটেল দো-আঁশ মাটি চাষের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরি ঃ জমিতে প্রয়োজন মত পানি দিয়ে ২-৩টি চাষ ও মই দিতে হবে যেন সমস্ত মাটি সমভাবে থকথকে কাঁদাময় হয়। সময়মত ও উত্তমরুপে জমি তৈরি করলে প্রাথমিকভাবে যে সব আগাছা জন্মায় তা দমন সহজ হয়। প্রথম চাষের পর অন্ততঃ জমিতে ৭ দিনের মত পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এতে আগাছা, খড় ইত্যাদি পঁচে যাবে।

বীজের হার ঃ ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর।

বপনের সময় ঃ জুন মাসে ২য় সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ (আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ বপন করা হয়।

রোপনের সময় ঃ জুলাই মাসের শেষ (শ্রাবণ মাসের ২য়) সপ্তাহের মধ্য ২০-২৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে ৩০ দিনের বেশি বয়সের চারা রোপন করা বাঞ্চনীয় নয়।

গাছের দূরত্ব ঃ ৩-৪ টি সুস্থ্য সবল চারা একত্রে এক গুছি জমিতে রোপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরুত্ব ২০ সেমি এবং সারিতে গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫ সেমি।

বীজ তলা তৈরি ঃ ৫ শতাংশ (২০০ বর্গমিটার) পরিমান বীজতলায় ১০ কেজি বীজ ফেলা হয়।

বীজ তলার পরিচর্যা ঃ সুস্থ্য সবল চারা তৈরি করতে হলে বীজতলার বীজ বপনের পর বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়া দরকার। বীজতলার জমিতে পরিমিত পানি রাখা দরকার। জমিতে সময়মত পানি থাকলে অনেক সময় চারার বাড়বাড়তি কমে যায় এবং চারা দূর্বল হয়ে পড়ে তাই মাঝে মাঝে বীজতলা শুকালে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। উর্বর ও সল্প উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করলে কোনরূপ সার প্রয়োজন হয় না। অনুর্বর ও সল্প উর্বর জমিতে কেবল প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি গোবর বা পচা আবর্জনা সার প্রয়োগ করলে চলে। গজানোর পর চারা হলুদ হয়ে গেলে ২ সপ্তাহ পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পর জমি থেকে পানি নিস্কাশন করা যাবে না। ইউরিয়া প্রয়োগে কাজ না হলে বীজ তলাতে প্রতি বর্গমিটারে ২০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১০০-১২০	রোপনের জন্য জমি তৈরি শেষ চাষের আগে সম্পূর্ণ টিএসপি এবং এমওপি জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে চাষের মাধ্যমে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের অর্ধেক পরিমাণ চারা রোপনের ৭-৮ দিন পর এবং বাড়ী অর্ধেক ২৫-৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে অথবা এক তৃতীয়াংশ চারা রোপনের ৭-৮ দিন পর, এক তৃতীয়াংশ চারা রোপনের ১৮-২০ দিন পর এবং শেষ তৃতীয়াংশ চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে প্রয়োগ করতে হবে। গন্ধক ও দস্তা ঘাটতি এলাকায় হেক্টরপ্রতি জিপসাম ৫০ কেজি এবং দস্তা সার ১০ কেজি হারে দেয়া যেতে পারে। ইউরিয়া সারে প্রয়োগের ২/১ দিন আগে জমির অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। জমির উর্বরতা ও ফসলের অবস্থার উপর নির্ভর করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ মাত্রার তারতম্য করা যেতে পারে।
টিএসপি	৮০-১০০	
এমপি	*৩০-৩৫*	

পরিচর্যা ঃ এ জাতের ধানের পরিচর্যা অন্যান্য উফশী জাতের মতই। তবে এর জীবন কাল কম বিধায় চারা রোপনের পর আগাছা দেখা দিলে দ্রুত নিড়ানি যন্ত্র বা হাতের সাহায্যে আগাছা পরিস্কার ও মাটি নরম করতে হবে। বর্ষা মৌসুমের শেষে ফসল পাকার কিছুদিন পূর্বে পানির অভাব দেখা দিলে সেচের প্রয়োজন হতে পারে। তবে ধান পাকার ১০-১২ দিন আগে জমির পানি শুকিয়ে ফেলা ভাল।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দমনের জন্য আগাছানাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রিটাইলাক্লোর (তরল) ১ লিটার/হেক্টরে ব্যবহার করা যেতে পারে। চারা রোপনের ৫-৭ দিনের মধ্যে তরল জাতীয় আগাছানাশক স্প্রেয়ারের মাধ্যমে স্প্রে করতে হবে এবং দানাদার জাতীয় আগাছানাশক জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে যেন ব্যবহারের সময় রোপনকৃত মাঠে ২-৩ ইঞ্চি পানি দাড়ানো থাকে। মনে রাখতে হবে আগাছানাশক প্রয়োগ করার পর বাহির থেকে পানি ঢুকতে অথবা ক্ষেতের ভিতর থেকে বাহিরে যেন পানি বের হয়ে না যায়। পাইরাজোসালফিউরান ইথাইল ৬০ গ্রাম/একরে আগাছা জন্মানোর পরে অর্থাৎ ১-২ পাতা গজানো আগাছায় স্প্রে করা যেতে পারে।

সেচের প্রদান ঃ আমন ধানে সাধারনত সেচের প্রয়োজন হয় না। ধানের জমিতে সবসময় পানি ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। ধান পাকার সময় দানা শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়। এ জাতটি মাজরা পোকার প্রতি মধ্যম প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রয়োজনে মাজরা দমনের জন্য ডায়াজিনন ১০ জি প্রতিহেক্টরে ১৬.৮০ কেজি ব্যবহার করতে হবে। শুধু মাজরা দমনের জন্য প্রতিহেক্টরে ১০.০০ কেজি ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ০.৪ জি, অথবা থায়োমেথোজাম + ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ৪০ ডব্লিওজি প্রতিহেক্টরে ০.০৭ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। খোল পোড়া এবং ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো অথবা ট্রুপার হেক্টরপ্রতি ৩০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। খোল পোড়া বা সিথ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রোপিকোনাজোল বা হেক্সাকোনাজোল বা ফ্লুসিলাজোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কর্তন ঃ আশ্বিন মাসের শেষ ।

জীবনকাল ঃ ১১০-১১৫ দিন।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ বীজ ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে (১২-১৪% আদ্রতার) টিন, প্লাস্টিক অথবা মাটির তৈরি মটকার উভয় পার্শ্বে এনামেল পেইন্ট দিয়ে ৬-৮ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, বীজ সংরক্ষনের পাত্রটি বায়ু নিরোধক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন এবং পাত্রটিতে বীজ রাখার পর ফাঁকা স্থান অন্য কিছু দিয়ে ভরে রাখতে হবে। ফলে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি ও পোকার ক্ষতি থেকে বীজ রক্ষা পাবে। তাছাড়া নিমপাতা শুকিয়ে অথবা নিম তৈল বীজের সাথে মিশিয়ে রাখলে পোকার আক্রমণ থেকে বীজ ভাল থাকবে।

প্রযুক্তি ঃ বিনাধান-৮ (আউশ ও আমন এবং বোরো)

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ মধ্যম খাটো ও লবণ অসহিষ্ণু আধুনিক ধানের জাত IR29 এর সাথে ভারতীয় লবণ সহিষ্ণু POKKALI ধান জাতের সংকরায়ন করে পরবর্তীতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লবণাক্ত সহিষ্ণু উন্নত কৌলিক সারি IR66946-3R-149- 1-1(PBRCSTL-20) সনাক্ত করা হয়। লবণ সহিষ্ণু উন্নত জাত হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য সারিটিকে "বিনাধান-৮" নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১০ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। উচ্চ ফলনশীল ও ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন আলোক অসংবেদনশীল বোরো ধানের জাত। তবে আউশ এবং আমন মৌসুমেও চাষ করা যায়। এটি কুশি অবস্থা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/মিটার এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া এবং লম্বা। পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা এবং কান্ড সবুজ থাকে, পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেমি। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.৭ গ্রাম। ধান উজ্জল, শক্ত এবং চাল মাঝারি মোটা। জীবনকাল বোরোতে ১৩০-১৩৫ দিন, আউশে ১০০-১০৬ দিন এবং আমন মৌসুমে ১২০-১২৫ দিন। লবণাক্ত জমিতে বোরো মৌসুমে প্রতিহেক্টরে ফলন ৫.০-৫.৫ টন, আউশ মৌসুমে ৪.৫-৫.০ টন এবং আমন মৌসুমে ৪.৫-৫.০ টন।

চিত্র : বিনাধান-৮

জমির ধরণ ঃ বেলে দো-আঁশ এবং এটেল দো-আঁশ জমিতে এ জাতটি চাষের উপযোগী।

বীজ বাছাই ও শোধন ঃ উপযুক্ত ফলন নিশ্চিত করতে হলে পুষ্ট ও রোগবালাই মুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা ভাল। এ ক্ষেত্রে প্রতি ১০ কেজি বীজের জন্য ২৫ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স-২০০ বা ব্যাভিস্টিন ব্যবহার করলে ভাল হয়। এ জন্য বীজে ভালোভাবে ছত্রাকনাশক মিশিয়ে একটি বদ্ধ পাত্রে ৪৮ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।

বীজের হার ঃ ২৫-৩০ কেজি /হেক্টর।

বীজতলা তৈরি ঃ নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সপ্তা (মধ্য কার্তিক থেকে কার্তিকের শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। ১০ কেজি বীজ ৫ শতাংশ বা ২০০ বর্গ মিটার বীজতলায় ফেলা যায়। অনুর্ভর ও স্বল্প উর্বর জমিতে কেবলমাত্র প্রতি বর্গমিটারে দুই কেজি গোবর বা কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করলেই চলে। গজানোর পর চারা হলুদ হয়ে গেলে দুই সপ্তাহ পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পর জমি থেকে পানি নিস্কাশন করা যাবে না।

রোপন পদ্ধতি ঃ ডিসেম্বর মাসের ২য় থেকে ৩য় সপ্তাহ (অগ্রহায়নের শেষ থেকে পৌষের প্রথম সপ্তাহ) পর্যন্ত ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে প্রতি গোছায় ২/৩ টি চারা রোপন করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। সারি হতে সারির দুরত্ব ২০ সেমি এবং এক গুছি হতে অন্য গুছির দুরত্ব ১৫ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	২১৭	রোপা জমি তৈরির শেষ চাষের ১-২ দিন পূর্বে সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং দস্তা সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে ভাল ভাবে মই দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া সমান তিন ভাগে ভাগ করে রোপনের ৭, ২৫ এবং ৪০ দিনে উপরি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়া যথারীতি প্রয়োগ করতে হবে। গুটি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে চারা রোপনের ৫-৭ দিনের মধ্যে মাটি শক্ত হওয়ার পূর্বে ২.৭ গ্রাম ওজনের গুটি ধানের চার গুছির মধ্যবর্তী স্থানে ৫-৭ সেমি মাটির গভীরে পুতে দিতে হবে।
টিএসপি	১১০	
এমওপি	৭০	
জিপসাম	৪৫	
দস্তা	৪.৫	

পরিচর্যা ঃ ধানের এ জাতটির পরিচর্যা অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল বোরো জাতের মতই। চারা রোপনের পর আগাছা দেখা দিলে নিড়ানী বা হাতের সাহায্যে আগাছা পরিস্কার এবং মাটি নরম করতে হবে। ধানে থোড় আসার সময় জমিতে ২-৩ ইঞ্চি পানি নিশ্চিত করতে হবে। তবে ধান পাকার ১০-১২ দিন আগে জমির পানি শুকিয়ে ফেলা দরকার। জমি তৈরির সময় ২/৩ বার স্বাদু পানি দিয়ে লবণাক্ত পানি বের করে দিলে জমির লবণাক্ততা অনেকটা কমে যায়। তাছাড়া কুশি, ফুল আসা ও পরিপক্কতার সময় লবণের মাত্রা ১০ ডিএস/মিটারের বেশি হলে স্বাদু পানি দিয়ে বের করার মাধ্যমে লবণাক্ততা কমিয়ে আনতে হবে।

পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ এ জাতটি মাজরা পোকার প্রতি মধ্যম প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। খোল ঝলসানো বা সিথব্লাইট রোগ দেখা গেলে ফলিকুর বা প্রোপিকোনাজল (টিল্ট ২৫০ ইসি) ১ মিলি বা ব্যাভিস্টিন ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ ছাড়া ব্লাষ্ট রোগ দমনের জন্য হিনোসান ৫০ ইসি বা টপসিন মিথাইল ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। পোকামাকড় দমনের জন্য আইপিএম প্রদ্ধতি সবচেয়ে ভাল। জমিতে মাজরা পোকা, পাতা পোষক পোকা, ফড়িং বা অন্যান্য কীটপতঙ্গের আক্রমণ হলে ডায়াজিনন-১০ (দানাদার) একর প্রতি ৬.৮ কেজি হারে ছিটিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে বা সবিক্রন ৪২৫ ইসি ২০ মিলি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ২০০ বর্গ মিটার (৫ শতাংশ) জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল কর্তন এবং বীজ সংরক্ষণ ঃ ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে ধান কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগমুক্ত, পরিপুষ্ট ও বিশুদ্ধতা ভাল বীজের পূর্বশর্ত। এজন্য ক্ষেতের যে স্থানে ভাল ফসল হয়েছে সে স্থান থেকে পূর্বেই ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলতে হবে। এরপর ধান কর্তন করে এমনভাবে মাড়াই ও ঝাড়াই করতে হবে যাতে কোনভাবে অন্য জাতের ধানের মিশ্রন ঘটতে না পারে। ধান মাড়াই করার সময় ২.৫ (আড়াই) বারি দিয়ে যে পুষ্ট বীজ পাওয়া যায় তাই বীজ হিসাবে রাখতে হবে। বীজ ভালভাবে শুকিয়ে (১২ থেকে ১৪% আদ্রতার) টিন, প্লাস্টিক অথবা মাটির তৈরি মটকার উভয় পার্শ্বে এনামেল পেইন্ট দিয়ে ৬-৮ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, বীজ সংরক্ষণের পাত্রটি বায়ু নিরোধক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন এবং পাত্রটিতে বীজ রাখার পর ফাঁকা স্থান অন্য কিছু দিয়ে ভরে রাখা প্রয়োজন। ফলে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি ও পোকার ক্ষতি থেকে বীজ রক্ষা পাবে। তাছাড়া নিমপাতা শুকিয়ে অথবা নিম তৈল বীজের সাথে মিশিয়ে রাখলে পোকার আক্রমণ থেকে বীজ ভাল থাকবে।

প্রযুক্তি ঃ বিনাধান-১০ (আমন ও বোরো) জাতের চাষাবাদ ও কৌশল

চিত্র : বিনাধান-১০

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ "বিনাধান-১০" এর কৌলিক সারি নং- IR64197-3B-14-2। কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। সারিটি IR42598-B-B-B-B-12 এবং NONA BOKRA এর সাথে সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবনাক্ত (১২-১৪ ডিএস/মিটার) এলাকায় এবং লবনামূক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক বিনাধান-৮ এর চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পরিপক্ক হওয়ায় এবং লবণ সহিষ্ণু উন্নত জাত হিসেবে চাষাবাদের জন্য সারিটিকে "বিনাধান-১০" নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১২ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। উচ্চ ফলনশীল, লবনাক্ততা সহিষ্ণু ও অন্যান্য ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন আলোক অসংবেদনশীল বোরো ধানের জাত। তবে আমন মৌসুমেও চাষ করা যায়। জাতটি কুশি অবস্থা সহনশীল থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ১০-১২ ডিএস/মিটার এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া এবং লম্বা। পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা এবং কান্ড সবুজ থাকে। ১০০০ পুষ্ট দানার ওজন ২৪.৫ গ্রাম। ধান উজ্জল, শক্ত এবং চাল মাঝারী, লম্বা জাতটি পাতা পোড়া, খোল পোড়া, খোল পঁচা ইত্যাদি রোগ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিরোধী। লবণাক্ত জমিতে বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ফলন ক্ষমতা ৫.৫-৬.০ টন এবং আমন মৌসুমে ৫.০-৫.৫ টন, লবণ মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে বোরো মৌসুমে প্রতিহেক্টরে ফলন ক্ষমতা ৮.০-৮.৫ টন এবং আমন মৌসুমে ৫.৫-৬.০ টন। বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পরে না। এ জাতের জীবনকাল বোরোতে ১২৫-১৩০ দিন এবং আমন মৌসুমে ১১৮-১২২ দিন।

জমি ও মাটির ধরণ ঃ বেশি নিচু জমি (যেখানে দীর্ঘদিন গভীর পানি জমে থাকে) ব্যতিত প্রায় সব ধরনের জমিতে চাষাবাদ করা যায়। বেলে দো-আঁশ এবং এটেল দো-আঁশ মাটি উপযোগী।

বীজের হার ঃ ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর ।

বপন/রোপনের সময় ঃ

বোরো মৌসুম ঃ নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সপ্তাহ (মধ্য কার্তিক থেকে কার্তিকের শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। ১০ কেজি বীজ ৫ শতাংশ বা ২০০ বর্গ মিটার বীজতলায় ফেলা যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা রোপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

আমন মৌসুম ঃ জুন মাসের ২য় সপ্তাহ হতে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ (আষাঢ় মাসের শুরু থেকে মধ্য শ্রাবন) পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ ফেলা হয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারা ভার্দ্র মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।

বীজতলার পরিচর্যাঃ সুস্থ্য সবল চারা তৈরি করতে হলে বীজতলার বীজ বপনের পর বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া দরকার। বীজতলার জমিতে পরিমিত পানি রাখা দরকার। জমিতে সবসময় পানি থাকলে অনেক সময় চারার বাড়বাড়তি কমে যায় এবং চারা দূর্বল হয়ে পড়ে তাই মাঝে মাঝে বীজতলা শুকালে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। উর্বর ও স্বল্প উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করলে কোনরূপ সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। অনুর্বর জমিতে কেবল প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি গোবর বা জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। গজানোর পর চারা হলুদ হয়ে গেলে ২ সপ্তাহ পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগের পর জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করা যাবে না। ইউরিয়া প্রয়োগে কাজ না হলে বীজ তলাতে প্রতি বর্গমিটারে ২০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করলে চারা বৃদ্ধি ভাল হয়।

গাছের দূরত্ব ঃ ৩-৪ টি সুস্থ্য সবল চারা একত্রে এক গুছিতে রোপন করতে হয়। সারি হতে সারির দূরত্ব ২০ সেমি এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ১৫ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি*
ইউরিয়া	২১৭	জমি তৈরির শেষ চাষের ১-২ দিন পূর্বে সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং দস্তা সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে ভালভাবে মই দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। জমি তৈরির সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ ইউরিয়া সমান তিন ভাগে ভাগ করে রোপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ৩য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়া যথারীতি প্রয়োগ করতে হবে। গুটি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে চারা রোপনের ৫-৭ দিনের মধ্যে মাটি শক্ত হওয়ার পূর্বে ২.৭ গ্রাম ওজনের গুটি ধানের চার গুছির মধ্যবর্তী স্থানে ৫-৭ সেমি মাটির গভীরে পুতে দিতে হবে।
টিএসপি	১১০	
এমওপি	৭০	
জিপসাম	৪৫	
দস্তা	৪.৫	

পরিচর্যা ঃ পরিচর্যা অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল বোরো জাতের মতই। চারা রোপনের পর আগাছা দেখা দিলে নিড়ানী বা হাতের সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি নরম করতে হবে। ধানে থোড় আসার সময় জমিতে ৫-৭ সেমি পানি নিশ্চিত করতে হবে। তবে ধান পাকার ১০-১২ দিন আগে জমির পানি শুকিয়ে ফেলা দরকার। জমি তৈরির সময় ২/৩ বার স্বাদু পানি দিয়ে লবণাক্ত পানি বের করে দিলে জমির লবণাক্ততা অনেকটা কমে যায়। তাছাড়া কুশি, ফুল আসা ও পরিপক্কতার সময় লবণের মাত্রা ১০ ডিএস/মিটারের বেশি হলে যদি সম্ভব হয় স্বাদু পানি দিয়ে বের করার মাধ্যমে লবণাক্ততা কমিয়ে আনতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দমনের জন্য আগাছানাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রিটাইলাক্লোর (তরল) ১ লিটার/হেক্টরে ব্যবহার করা যেতে পারে। চারা রোপনের ৫-৭ দিনের মধ্যে তরল জাতীয় আগাছানাশক স্প্রেয়ারের মাধ্যমে স্প্রে করতে হবে এবং দানাদার জাতীয় আগাছানাশক জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে যেন ব্যবহারের সময় রোপনকৃত মাঠে ৫-৭ সেমি পানি দাড়ানো থাকে। তবে আগাছানাশক প্রয়োগ করার পর বাহির থেকে পানি ঢুকতে অথবা ক্ষেতের ভিতর থেকে বাহিরে যেন পানি বের হয়ে না যায়। পাইরাজোসালফিউরান ইথাইল ১৫০ গ্রাম/হেক্টরে আগাছা জন্মানোর পরে অর্থাৎ ১-২ পাতা গজানো আগাছায় স্প্রে করা।

সেচ প্রদান ঃ ধানের জমিতে সবসময় পানি ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। পর্যায়ক্রমিক ভাবে ভিজানো এবং শুকানো পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে ফলন কমবে না উপরন্তু পানির পরিমাণ ২০-৩০ ভাগ কম লাগবে। ধান গাছে

কাইচথোর (Panicle Initiation) আসার আগ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া যায় তবে কাইচথোর আসা শুরু করলে ৫-৭ সেমি পানি থাকলে ভাল হয়। সার প্রয়োগের আগে জমি থেকে পানি কমিয়ে সারের উপরি প্রয়োগ করতে হয় এবং ২-৩ দিন পর আবার পানি দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ধান পাকার সময় দানা শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ এ জাতটি মাজরা পোকার প্রতি মধ্যম প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রয়োজনে মাজরা ও গল মাছি দমনের জন্য ডায়াজিনন ১০জি প্রতি হেক্টরে ১৬.৮০ কেজি ব্যবহার করতে হবে। শুধু মাজরা দমনের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০.০০ কেজি ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ০.৪ জি, অথবা থায়োমেথোজাম + ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ৪০ ডব্লিওজি প্রতি হেক্টরে ০.০৭৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। খোল পোড়া এবং ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো অথবা ট্রুপার হেক্টরপ্রতি ৩২৫ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। খোল পোড়া বা সিথ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রোপিকোনাজোল বা হেক্সাকোনাজোল বা ফ্লুসিলাজোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কর্তন ঃ জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। মধ্য এপ্রিল থেকে শেষ পর্যন্ত (বৈশাখ মাস) ফসল কর্তন করা যায়।

ফলন ঃ লবনাক্ত এলাকায় : ৫.৫০ টন/হেক্টর এবং স্বাভাবিক/অলবনাক্ত এলাকায়: ৮.৫ টন/হেক্টর।

বীজ সংরক্ষণ ঃ ধান মাড়াই করার সময় আড়াই বারি দিয়ে যে পুষ্ট বীজ পাওয়া যায় তাই বীজ হিসাবে রাখতে হবে। বীজ ভালভাবে শুকিয়ে (১২-১৪% আদ্রতার) টিন, প্লাস্টিক অথবা মাটির তৈরি মটকার উভয় পার্শ্বে এনামেল পেইন্ট দিয়ে ৬-৮ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, বীজ সংরক্ষনের পাত্রটি বায়ু নিরোধক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন এবং পাত্রটিতে বীজ রাখার পর ফাঁকা স্থান অন্য কিছু দিয়ে ভরে রাখতে হবে। ফলে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি ও পোকার ক্ষতি থেকে বীজ রক্ষা পাবে। তাছাড়া নিমপাতা শুকিয়ে অথবা নিম তৈল বীজের সাথে মিশিয়ে রাখলে পোকার আক্রমণ থেকে বীজ ভাল থাকবে।

প্রযুক্তির ঝুকির বিবরণ ঃ কাইচ থোর অবস্থায় লবণাক্ততা ১০-১২ ডিএস/মিটার মাত্রার মধ্য থাকা আবশ্যক। লবণাক্ততা উক্ত মাত্রার উপরে গেলে তা কমানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় ধান চিটা হয়ে যাবে।

শস্যবিন্যাস

প্রযুক্তি ঃ পতিত-রোপা আউশ (ব্রিধান ২৭) - রোপা আমন (ব্রিধান ৪৪) শস্যবিন্যাস

প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	এই প্রযুক্তি বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকার পতিত-স্থানীয় রোপা আউশ-স্থানীয় রোপা আমন শস্যবিন্যাসের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত। বরিশাল অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকা যেখানে জোয়ারের পানির উচ্চতা ৮৫ সেমি পর্যন্ত পৌঁছায় সেসব এলাকার শস্যবিন্যাসের জন্য ব্রি ধান৪৪ উপযুক্ত।

উৎপাদন পরিচর্যা ঃ

বিষয়	ঃ	*রোপা আউশ*	*রোপা আমন*
জমির ধরণ	ঃ	জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকা (অলবণাক্ত)।	
মাটির বর্ণনা	ঃ	বেলে কর্দম হতে কর্দম দোআঁশ।	
অনুমোদিত জাত	ঃ	ব্রি ধান২৭, স্থানীয় মালা (উন্নত ধরণ)	ব্রি ধান৪৪
বীজের হার (কেজি/হেঃ)	ঃ	৩০	৩০
বীজ বপণের সময়	ঃ	১-১৫ এপ্রিল	১-১৫ জুলাই
জমি তৈরির সময় এবং প্রস্তুত প্রণালী	ঃ	২-৪ টি চাষ দেয়ার পর মই দিতে হবে।	২-৪ টি চাষ দেয়ার পর মই দিতে হবে।
রোপণের সময়	ঃ	১-১৫ মে	১-১৫ আগস্ট
রোপণ দূরত্ব	ঃ	২০ সেমি × ১৫ সেমি	২০ সেমি × ১৫ সেমি
রাসায়নিক সার ব্যবস্থাপনা			
সারের ধরণ ও হার ইউরিয়া-টিএসপি-এমপি-জিংকসালফেট (কেজি/হেঃ)	ঃ	১৫৪-১১০-৫০	১৭৬-১১০-৭০-০
পদ্ধতি ও সময়কাল	ঃ	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০ এবং ৪০ দিন পর উপরি প্রযোগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০, ৩৫ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রযোগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা ব্যবস্থাপনা	ঃ	প্রয়োজনে আগাছা পরিস্কার রাখতে হবে।	
সেচের সংখ্যা ও সময়কাল	ঃ	বৃষ্টি নির্ভর (প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে)।	বৃষ্টি নির্ভর (প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে)।
বালাই ব্যবস্থাপনা	ঃ	সমন্বিত	সমন্বিত
কর্তনের সময়কাল	ঃ	আগষ্ট	ডিসেম্বর
ফলন (টন/হেঃ)	ঃ	৩.০	৪.০-৪.৫

প্রযুক্তি ঃ পতিত-রোপা আউশ-রোপা আমন শস্যবিন্যাস

প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	এই প্রযুক্তি বরিশাল, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর জেলার জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকার পতিত-স্থানীয় রোপা আউশ-স্থানীয় রোপা আমন শস্য বিন্যাস যেখানে রোপা আমন দেরিতে আউশ ধান রোপণের ফলে দেরি হয় তার মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত। বরিশাল অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকা যেখানে জোয়ারের পানির উচ্চতা ৮৫ সে মি পর্যন্ত পৌঁছায় সেসব এলাকায় স্থানীয় আমন জাতের পরিবর্তে আলোক সংবেদনশীল ব্রি ধান২২/ ২৩/ ৪৬ উপযুক্ত।

উৎপাদন পরিচর্যা ঃ

বিষয়	ঃ	রোপা আউশ	রোপা আমন
জমির ধরণ	ঃ	জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকা (অলবণাক্ত)	
মাটির বর্ণনা	ঃ	বেলে কর্দম হতে কর্দম দোআঁশ	
অনুমোদিত জাত	ঃ	ব্রি ধান২৭, স্থানীয় মালা (উন্নত ধরণ)	ব্রি ধান২২/ ২৩/ ৪৬
বীজের হার (কেজি/হেঃ)	ঃ	৩০	৩০
বীজ বপণের সময়	ঃ	১-১৫ এপ্রিল	১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট
জমি তৈরির সময় এবং প্রস্তুত প্রণালী	ঃ	২-৪ টি চাষ দেয়ার পর মই দিতে হবে।	২-৪ টি চাষ দেয়ার পর মই দিতে হবে।
রোপণের সময়	ঃ	১-১৫ মে	২০ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর
রোপণ দূরত্ব	ঃ	২০ সেমি × ১৫ সেমি	২০ সেমি × ১৫ সেমি
রাসায়নিক সার ব্যবস্থাপনা			
সারের ধরণ ও হার ইউরিয়া-টিএসপি-এমপি-জিংকসালফেট (কেজি/হেঃ)	ঃ	১৫৪-১১০-৫০-০	১৭৬-১১০-৭০-০
পদ্ধতি ও সময়কাল	ঃ	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০ এবং ৪০ দিন পর উপরি প্রযোগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০, ৩৫ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রযোগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা দমনের সংখ্যা	ঃ	২	২
সেচের সংখ্যা ও সময়কাল	ঃ	বৃষ্টি নির্ভর (প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে)।	বৃষ্টি নির্ভর (প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে)।
বালাই ব্যবস্থাপনা	ঃ	আইপিএম	আইপিএম
কর্তনের সময়কাল	ঃ	আগস্ট	ডিসেম্বর
ফলন (টন/হেঃ)	ঃ	৩.০	৩.৫-৪.০

প্রযুক্তি ঃ রবি-খেসারী/মিষ্টি আলু-পতিত-রোপা আমন (ব্রিধান ৪৪) শস্যবিন্যাস

প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	এই প্রযুক্তি বরিশাল, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলার জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকার রবি-পতিত-স্থানীয় রোপা আমন শস্য বিন্যাসের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

বিষয়	ঃ	রবি	রোপা আমন
জমির ধরণ	ঃ	জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকা (অলবণাক্ত)	
মাটির বর্ণনা	ঃ	বেলে কর্দম হতে কর্দম দোআঁশ	
জমি তৈরির সময় এবং প্রস্তুত প্রণালী		২-৪ টি চাষ দেয়ার পর মই দিতে হবে।	২-৪ টি চাষ দেয়ার পর মই দিতে হবে।
অনুমোদিত জাত	ঃ	খেসারী / মিষ্টি আলু	ব্রি ধান৪৪
বীজের হার (কেজি/হেঃ)	ঃ	৪০ ১৫০০	৩০
বীজ বপণের সময়	ঃ	নভেম্বর	১-১৫ জুলাই
রোপণ দূরত্ব	ঃ	ছিটিয়ে	২০ সেমি × ১৫ সেমি
রাসায়নিক সার ব্যবস্থাপনা			
সারের ধরণ ও হার ইউরিয়া-টিএসপি-এমপি-জিংকসালফেট (কেজি/হেঃ)	ঃ	৪৩-২০০-৪০-০	১৭৪-১০০-৭০-০
পদ্ধতি ও সময়কাল	ঃ	জমি তৈরির সময়	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০, ৩৫ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা ব্যবস্থাপনা	ঃ	১ বার	২ বার
সেচের সংখ্যা ও সময়কাল	ঃ	-	বৃষ্টি নির্ভর (প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে)
বালাই ব্যবস্থাপনা	ঃ	আইপিএম	আইপিএম
কর্তনের সময়কাল	ঃ	ফসলের পরিপক্কতার সময়	ডিসেম্বরের শুরু হতে মধ্য ডিসেম্বর
ফলন (টন/হেঃ)	ঃ	খেসারী- ১.৫ মিষ্টি আলু- ৪০	৪.০-৪.৫

প্রযুক্তি ঃ মুগডাল-রোপা আউশ-রোপা আমন শস্যবিন্যাস

প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	এই প্রযুক্তি পটুয়াখালী ও ভোলার বৃষ্টিনির্ভর জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকার পতিত-রোপা আউশ- রোপা আমন শস্য বিন্যাসের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত।

উৎপাদন পরিচর্যাঃ

বিষয়		রবি	আউশ	আমন
জমির ধরণ	ঃ	জোয়ার-ভাটা ও বন্যাপ্রবণ এলাকা (অলবণাক্ত)		
মাটির বর্ণনা	ঃ	বেলে দোআঁশ		
জমি তৈরির সময়	ঃ	মধ্য ফেব্রুয়ারী	১-১৫ মে	মধ্য আগস্ট
অনুমোদিত জাত	ঃ	বারি মুগ-২/৫/৬	বি আর১৪/২৬	বি আর২৩
বীজের হার (কেজি/হেঃ)	ঃ	৩০	৩০	৩০
বীজ বপণের সময়	ঃ	মধ্য ফেব্রুয়ারী	১-১৫ এপ্রিল	১০-১৫ জুলাই
রোপণের সময়	ঃ	-	১-১৫ মে	১০-১৫ আগস্ট
রোপণ দূরত্ব	ঃ	ছিটিয়ে বোনা	২০ সেমি × ১৫ সেমি	২০ সেমি × ১৫ সেমি
রাসায়নিক সার ব্যবস্থাপনা				
সারের নাম ও পরিমান *ইউরিয়া-টিএসপি-এমপি-জিংকসালফেট (কেজি/হেঃ)*	ঃ	৩২-৫০-২০-০	১৫০-১০০-৫০-১৪	১৭৪-৫০-৬০-১৪
পদ্ধতি ও সময়কাল	ঃ	সকল সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০ এবং ৪০ দিন পর উপরি প্রযোগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া চারা রোপণের ২০ এবং ৪০ দিন পর উপরি প্রযোগ করতে হবে। অন্যন্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা ব্যবস্থাপনা	ঃ	১ (বপনের ১৫-২০ দিন পর)	২ টি	২ টি
সেচের সংখ্যা ও সময়কাল	ঃ	বৃষ্টি নির্ভর	বৃষ্টি নির্ভর ।	বৃষ্টি নির্ভর।
বালাই ব্যবস্থাপনা	ঃ	আইপিএম	আইপিএম	আইপিএম
কর্তনের সময়কাল	ঃ	মধ্য এপ্রিল	আগস্টের শুরু	নভেম্বরের শেষ হতে মধ্য ডিসেম্বরের শুরু।
ফলন (টন/হেঃ)	ঃ	১.২-১.৫	৩.০-৩.৫	৩.০-৩.৫

প্রযুক্তি ঃ সমন্বিত ধান-হাঁস চাষ পদ্ধতি

যে এলাকার জন্য প্রযোজ্য ঃ বরিশাল অঞ্চলের জন্য

প্রযুক্তি প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

- প্রযুক্তির উপাদান সহজলভ্য ।
- পরিবেশ বান্ধব ।
- পরিবারের সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে ।
- এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারলে কৃষক একই সাথে তিনটি ফসল যেমন-ধান, হাঁসের মাংস ও ডিম উৎপাদন করতে পারে ।

অনুমোদিত উৎপাদন পরিচর্যা ঃ জমির চারদিকে ১২০ সেমি জায়গা রেখে পরের ১২০ সেমি চারিদিকে ৯৬ সেমি গভীর নালা করতে হবে । বৈশাখ মাসে জোয়ারের পানি এলে নালা ভর্তি করে নিয়ে মাছ চাষের ব্যবস্হা করতে হবে । বৃষ্টি শুরু হওয়ার অথবা জোয়ারের পানি আসার সাথে সাথে জমি তৈরি করে ধানের চারা রোপন করতে হবে । ধানের চারা মাটিতে লেগে যাওয়ার পর পানি আটকিয়ে হাঁসের বাচ্চা ছাড়তে হবে ।

জমির ধরণ/পানির অবস্হান ঃ যে সব জমিতে জোয়ারের পানি আসে এই রকম বেলে দোঁআঁশ জমি ।

জমি তৈরির প্রস্তুত প্রণালীঃ

০ গরু-মহিষ অথবা ট্রাক্টর দ্বারা ৩-৪ বার জমি চাষ দিতে হবে ।

০ জমি চাষের পর আগাছা, ঘাস পরিস্কার করতে হবে ।

০ ধানের চারা মাটিতে লেগে যাওয়ার পর পানির উচ্চতা জোয়ারের সময় বাড়াতে হবে এবং পানি আটকাতে হবে ।

অনুমোদিত জাতঃ

আউশঃ ব্রিধান ২৭, ৪৮

আমনঃ বিআর ১১, ব্রি ধান ৩০, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৫১, ৫২

বোরোঃ বিআর ১৪, ব্রি ধান ২৮, ব্রিধান ২৯, ব্রিধান ৩৫, ব্রিধান ৩৬

বীজের হারঃ ৩০ কেজি/হেক্টর ।

হাঁসের ঘনত্বঃ প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৩৫০-৪০০টি বাচ্চা লাগে ।

রোপণ সময় ঃ ২০-৩০ দিন বয়সের হাঁসের বাচ্চা চারা লাগানোর ৭-১৪ দিন পর ছাড়তে হবে ।

গাছের দূরত্ব ঃ ২৫ সেমি × ২০ সেমি ।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ বীজতলা ধান ক্ষেতের পাশে নির্বাচন করতে হবে । প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি জৈব সার বীজতলায় মেশাতে হবে । বীজতলার প্রস্হঃ ১.২৫ মিটার, উচ্চতাঃ ১৫ মিটার, নালার প্রস্থ ঃ ৫০ সেমি । অংকুরিত বীজ বীজতলায় সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

সার ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিচর্যা ঃ

জৈব সারের পরিমাণ (টন/হেঃ) ঃ পঁচা গোবর ৫ টন । হাঁস-মুরগীর বিষ্টা ২ টন জমি চাষের শেষ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে ।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ

সার ব্যবস্থাপনা ঃ হাঁসের বিষ্টা উত্তম জৈব সার । তাই অনুমোদিত রাসায়নিক সারের মাত্রা কম লাগে ।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ হাঁস আগাছা খেয়ে ধ্বংস করে , তাই ১বার আগাছা দমন করলেই চলবে ।

ফলন ঃ ৩ টন/হেক্টর ।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ শীষের আগা থেকে ৮০ ভাগ ধান সোনালী বর্ন ধারন করলে ধান যখন পাকতে শুরু করে এবং ধানের গাছ শুকাতে শুরু করে তখন ধান কাটতে হবে। ধান কেটে ভালভাবে কয়েকবার শুকিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করে গোলাজাত করতে হবে।

- কাইচথোড় আসার আগে হাঁস ধানের জমি থেকে সরিয়ে নিতে হবে।
- ধান ক্ষেতে হাঁস চরানো বন্ধ হলে কৃষক ইচ্ছা করলে হাঁস বাজারে বিক্রি করতে পারে।

মোট আয় ঃ টাকা ১৫০০০০/হেক্টর।

প্রযুক্তি ঃ রোপা আমনের সাথে সাথী ফসল হিসেবে সরিষার আবাদ।

প্রযুক্তির বর্ণনা ঃ এই প্রযুক্তিতে রোপা আমন ধান মাঠে থাকা অবস্থায় সরিষার আবাদ করা হয়। অত্র অঞ্চলে রোপা আমন ধান দেরিতে কাটা হয়। ধান কাটার পর মাটিতে জোঁ না থাকায় এবং রোপন সময় বিলম্বিত হওয়ায় সরিষা আবাদ করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে না। তাই, আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে সরিষার বীজ ঐ জমিতে ছিটিয়ে বোনা হয়। ফলে ঐ সময় মাটির স্বাভাবিক রসেই সরিষার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এসময় মাটির লবণাক্ততা কম থাকায় চারার কোন ক্ষতি হয় না। এইভাবে লবণের প্রভাব অতিক্রম করে জোঁ অবস্থায় উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় সরিষার আবাদ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ধানের জাত ঃ বিনা ধান-৭ (জীবনকাল ১১০-১১৮ দিন) এবং স্বল্প মেয়াদী সরিষার জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা ১৪, বারি সরিষা ১৫ নির্বাচন করতে হবে। সরিষা সংগ্রহের পর একই জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা সম্ভব।

যে এলাকার জন্য প্রযোজ্য ঃ সাতক্ষীরা, ডুমুরিয়া, বাগেরহাট ও দাকোপ।

প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমুহ ঃ রোপা আমন ও বোরো ধান এর মধ্যবর্তী সময়ে স্বল্প মেয়াদি সরিষা আবাদ করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমির ধরণ ঃ মাঝারী নিচু জমি থেকে মাঝারী উঁচু জমি।

মাটির বর্ণনা ঃ এঁটেল দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ।

জমি তৈরি ঃ বিনা চাষে সরিষার আবাদ। অনেক সময় হালকা চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা যেতে পারে।

বীজের হার ঃ ৭-৮ কেজি/হেক্টর

বপন সময় ঃ অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

গাছের দুরত্ব ঃ ১০ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)	সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	২৫০	ইউরিয়া ব্যতিত সকল সার জমিতে একবারে প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে অর্থাৎ বীজ বপনের ২০ ও ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োজ করা হয়।
টিএসপি	১৭০	
এমওপি	৮৫	
জিপসাম	১৫০	
জিংক সালফেট	১৫	
বোরাক্স	১৫	
পঁচা গোবর	৫ টন/হে.	

পরিচর্যা ঃ আগাছা পরিস্কার, সেচ প্রদান, পোকামাকড়, রোগবালাই দমন ও রোগিং ইত্যাদি।

আগাছা দমন ঃ দুই বার।

সেচ প্রদান ঃ সরিষায় দুই বার সেচ দিতে হয়। ফুল আসার আগে এবং সিলিকুয়া হওয়ার সময়।

গাছের রোগের বিবরণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ সরিষার রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ অন্যতম। এই রোগে গাছের পাতা ও সিলিকুয়ায় গোলাকার, গাঢ় বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সমগ্র পাতা ঝলসে যায়। বপনের পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ বা ব্যাভিস্টিন ২.৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। রোভরাল ৫০ ডব্লিউ পি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কর্তনের সময়কাল ঃ জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ -ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

ফলন (কেজি/হেক্টর) ঃ ৯০০-১০০০ কেজি (বারি সরিষা ৯); ১৪০০-১৫০০ কেজি (বারি সরিষা ১৪); ১৫০০-১৬০০ কেজি (বারি সরিষা) ১৫।

প্রযুক্তি ঃ রোপ আমনের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়ার চাষ

বাংলাদশের দক্ষিণাঞ্চলে রোপা আমন ধান কাটার পরে বেশিরভাগ জমি পতিত থাকে। তন্মধ্যে রোপা আমন ধান কাটতে দেরি হওয়া, লবণাক্ততা, খরা, শীতের স্থায়ীত্বতা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় পতিত জমি ব্যবহারের লক্ষ্যে রোপা আমনের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়ার চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি। রোপা আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন পূর্বে ধান দন্ডায়মান থাকা অবস্থায় মাদা করে সরাসরি বীজ বপন করে অথবা বাড়িতে এক মাস পূর্বে চারা তৈরি করে ধান কাটার পরপরই মাদায় চারা লাগাতে হবে।

এলাকার জন্য প্রযোজ্য ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ রোপা আমন ধান কর্তনের আগে এবং পরে, লবনাক্ত ও অলবনাক্ত এ দুই স্থানে সহজে চাষ করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমির ধরণ ঃ মাঝারী নীচু থকে মাঝারী উঁচু জমি। দোঁআশ থেকে বেলে দোআঁশ।

পানির অবস্থান ঃ নিকটস্থ পুকুর, অগভীর বা গভীর নলকুপ।

জমি তৈরির প্রস্তুত প্রণালী ঃ রোপা আমন ধান দন্ডায়মান অবস্থায় মাদা করে জমি তৈরি করতে হবে।

বীজের হার ঃ ৫০০-৬০০ গ্রাম।

বপনের সময় ঃ নভেম্বরের প্রথম-ডিসেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

গাছের দুরত্ব ঃ মাদা থেকে মাদার দুরত্ব ২ মিঃ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)	সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	১৬০	মাদায় সার প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৬০	
এমওপি	১৫০	
জিপসাম	৯৭	
জিংক সালফেট	১১	
বরিক এসিড	১০	
পঁচা গোবর	১০ টন	

পরিচর্যা ঃ আগাছা পরিস্কার, সেচ প্রদান, পোকামাকড়, রোগবালাই ইত্যাদি। তবে কুমড়ার মাছি পোকা দমনের জন্য প্রতি তিন শতাংশে ১টি করে সেক্স ফেরোমন ফাদ ব্যবহার ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ নিকটস্থ পুকুর বা খালের অলবণাক্ত পানি দিয়ে ২-৩ বার সেচ দিতে হবে।

ফলন (টন/হেক্টর) ঃ ২০-২৫

গম

গম চাষের চাষাবাদ কৌশল

***প্রযুক্তি ঃ* গম চাষ**

গম চাষের কয়েকটি সুবিধা হচ্ছে যে, রবি মৌসুমে সহজে চাষ করা যায়, রোগ-বালাই কম হয়। এছাড়া তুলনামুলক পানি অনেক কম লাগে অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে ১-৩টি সেচের প্রয়োজন। আবার যেখানে মাটির নিচে পানি স্তর অনেক উপরে থাকে সেখানে একটি মাত্র সেচ বা সেচ না দিয়েও লাভজনকভাবে গম চাষ করা সম্ভব। পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে ভবিষ্যতে রবি মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা অনেক কমে যাবে এবং এ বিবেচনায় গম চাষের গুরুত্ব অনেক বেশি। বপন তারিখ ও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল গমের জীবনকাল মাত্র ৯০-১১০ দিন। গম মৌসুমে সাধারণত সাইক্লোন জাতীয় ঝড় তুফান বা বৃষ্টিবাদলের সম্ভবনা অনেক কম। দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন শস্য বিন্যাসে গম অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘদিন ধরে রবি মৌসুমে পতিত থাকা জমি গম আবাদের আওতায় আনা সম্ভব।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি নির্বাচন ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে স্বল্প মাত্রার লবণাক্তযুক্ত উঁচু জমিতে গম আবাদ সম্ভব। এ অঞ্চলের লবণাক্ত জমির রস বাস্পীয়করণের ফলে শুকানোর সাথে সাথে মাটির নিচের লবণ উপরের স্তরে উঠে আসে এবং জমির উপর সাদা আস্তরণ পড়ে। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে মাটির উপরিস্তরে লবণাক্ততা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। সময় সময় জমির বড় অংশ বা সিংহভাগ জমিও ফসল শূন্য হতে পারে। লবণাক্ত নয় বা খুবই কম থেকে মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততাসম্পন্ন ও সহজে পানি নিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে আগাম জাতের আধুনিক আমন ধানের আবাদ করে গম বপন করা যাবে।

জমিন তৈরি ঃ

বপনের সময় ঃ উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু এলাকা বিশেষ করে ভোলাতে অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহের পর কোন অবস্থাতেই গম বোনা ঠিক নয় কারণ এতে কম ফলন হবে। বিগত বছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উন্নতজাতের গম উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি গমের জাতের বৈশিষ্ট্যবলী নিম্নে দেয়া হলোঃ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বারি গম- ২৬

গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ এবং পাঁচ-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট । শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৪-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ মাঝারী এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম। গমের পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল । জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯) এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। লবণাক্ত ৬ ডিএস/মিটার নীচে চাষাবাদ যোগ্য। জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী। উপকুলীয় অঞ্চলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪- ৫ টন।

চিত্রে :বারি গম ২৬

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বারি গম- ২৫

গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও হালকা সবুজ, কুশির সংখ্যা ৪-৫টি। শীষ বের হতে ৫৭-৬২ দিন সময় লাগে। জীবনকাল ১০২-১১০ দিন। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানান রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড়। হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি চারা অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটি স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। উপকুলীয় অঞ্চলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৩.৮-৫.০ টন ।

চিত্রে :বারি গম ২৫

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বারি গম- ২৪ (প্রদীপ)

গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ এবং তিন-চারটি কুশি বিশিষ্ট শীষ বের হতে ৬৪-৬৬ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫৫ গ্রাম)। গমের পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। তাপসহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনে জাতটি কাঞ্চনের চেয়ে শতকরা ১০-২০ ভাগ ফলন বেশি দেয়। চারা অবস্থায় ৬ ডিএস/মিটার মাত্রায় নীচে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। উপকুলীয় অঞ্চলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৩-৫.১ টন ।

চিত্রে :বারি গম ২৪

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি তৈরি ঃ গম বীজ বপনের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বপনের পর জমির ঢাল বুঝে সরু নালা তৈরি করে বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জলাবদ্ধতা হলে শীকড়ের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে গাছ বিশেষ করে চারা গাছ মারা যায়।

বীজের পরিমান ঃ ১২০ কেজি/হেক্টর

বীজ শোধন ঃ মাটি ও বীজ বাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য বীজ শোধন করা একান্ত প্রয়োজন। বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের জন্য তিন গ্রাম হারে প্রভেক্স (ছত্রাক নাশক) দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধনের ফলে বীজ ও মাটি বাহিত রোগ দমনের সাথে সাথে গজানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ চারা সবল ও সতেজ হয়। চারার সংখ্যা শতকরা ২০-২২ ও ফলন ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বীজ শোধনে যা খরচ হয় তার তুলনায় লাভ বেশি।

বীজ বপন পদ্ধতি ঃ গম বীজ সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে শেষ চাষ ও মইয়ের পর জমিতে আড়াআড়ি করে সমানভাবে ছিটিয়ে গম বীজ বপন করতে হবে। পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র না থাকলে হাতদ্বারা সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর পুরাতন ব্যবহার করা ছোট লাংগল দিয়ে ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাইন বা সারি করে, ৩-৪ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বপন করতে হবে।

বপনের সময় ঃ নভেম্বর ২য় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর ১ সপ্তাহ।

পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার

আমন ধান কাটার পর দেশি লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরির পর গম বপনে দেরি হয়। পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করে আমন ধান কাটা ও গম বপনের মধ্যবর্তী সময়কে কমানো সম্ভব। যন্ত্রটি দ্বারা ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে এবং ৩-৪ সেন্টিমিটার গভীরে ৬টি সারিতে বীজ বোনা যায়। বীজ বপনের সাথে সাথে যন্ত্রের পিছনের ভারি রোলারটি মইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। এ যন্ত্রের সাহায্যে সঠিক গভীরে বীজ বোনার ফলে চারা সুষ্ঠুভাবে গজায় ও পাখি কম ক্ষতি করে। পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রটি ক্রয়ে প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও এর ব্যবহারের ফলে শতকরা ২০ ভাগ বীজের সাশ্রয়, চাষ খরচ কম ও অন্যান্য সুবিধাদির কারণে পরবর্তীতে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)	সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	১৮০-২২০	সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি ও জিপসাম শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রথম সেচের সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার অর্থ্যাৎ ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ও জিপসাম শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৪০-১৮০	
এমওপি	৪০-৫০	
জিপসাম	১১০-১২০	
বরিক এসিড	৮-১০	
পঁচা গোবর	১০	

সেচ প্রদান ঃ ভাল ফলন পেতে গম চাষে লাভবান হওয়ার জন্য সেচ প্রদান অতিব গুরুত্বপূর্ণ। মাটির প্রকার/এলাকা ভেদে ১-৩ টি সেচের প্রয়োজন হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মাটির নিচে পানির স্তর উপরে থাকায় সাধারণত ফসলে পানির অভাব অতি সহজে বুঝা যায় না তা সত্বেও লাভজনকভাবে গম আবাদের ক্ষেত্রে বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে একটি মাত্র সেচ অবশ্যই প্রদান করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় সেচটি শীষ বের হবার সময় অর্থাৎ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে এবং তৃতীয় সেচ দানা বাধার সময় (বপনের ৭০-৭৫ দিন) দিতে হবে।

পাখি তাড়ানো ঃ গম বপনের পর পরই ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিন। সকালে ও বিকেলে পাখির উপদ্রব বেশি হয় তাই এ বেলা পাখি তাড়াতে বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার। বপনের দিন পর থেকেই পাখির উপদ্রব বেশি হয় এমনকি চারা গজালেও পাখি চারা খুটিয়ে খুটিয়ে উঠানোর পর দানা খেয়ে ফেলে। তাই পাখি না তাড়ালে জমিতে চারার সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে ফলন কম হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ প্রথম সেচ/বৃষ্টির পর এবং তা অবশ্যই বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে মাটির 'জো' অবস্থায় সব আগাছা নিড়ানি দিয়ে বেছে /তুলে দিতে হবে। নিড়ানি দেওয়ায় প্রথম সেচ/বৃষ্টির কারণে মাটির উপরে সৃষ্ট আস্তরণ ভেঙ্গে মাটি আলগা হবে ফলে আলো ও বাতাস (অক্সিজেন) প্রবেশ করার কারণে গাছ সবল হবে।

ইঁদুর নিধন ঃ গম গাছে শীষ বের হবার পর যখন দানা বাধতে শুরু করে তখনই জরুরীভাবে বিষ টোপ ব্যবহার করে, ফাঁদ পেতে বা স্থানীয়ভাবে অন্যান্য কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করে ইঁদুর নিধন করতে হবে। যদি ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমনে দেখতে পান তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বা তার আশে পাশে/কাছাকাছি পুরাতন গর্তগুলির মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে নতুন গর্তের ভিতর ফসটক্সিন নামক গ্যাসের বড়ি ভিতরে ঢুকিয়ে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দিন। তাছাড়া গর্তে পানি ঢেলে বা উপরের ছবিতে দেখানো ফাঁদ বা উন্নত মানের ফাঁদ পেতে ইঁদুর দমন করতে হবে। যত শীর্ঘ সম্ভব আপনি ইঁদুর দমন করবেন ততই আপনার লাভ।

রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশে গমের প্রধান দু'টি রোগ হচ্ছে পাতার দাগ ও মরিচা রোগ। কিন্তু সুখের বিষয় হচ্ছে যে, নতুন উদ্ভাবিত আধুনিক জাতগুলো রোগ প্রতিরোধক্ষম ও সহনশীল তাই বর্ণিত রোগ দু'টির রোগের প্রাদুর্ভাব নেই বললে চলে। কিন্তু উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং সে সাথে আকাশ কুয়াশায় ঢাকা হলে এ জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগ দমনের জন্য টিল্ট ২৫০ ইসি নামক ছত্রাকনাশক ঔষধ ব্যবহার

করতে হবে। শীষ বের হবার সময় একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার অর্থাৎ মোট দু'বার প্রতি লিটার পানিতে আধা (০.৫) মিলিলিটার ঔষধ স্প্রে মেশিনের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কোন কোন সময় গমে জাব ও কান্ড ছিদ্রকারী মাজরা পোকার আক্রমন লক্ষ্য করা যায়। আক্রমন বেশি হলে জাব পোকা দমনের জন্য ১২.৫ লিটার পানিতে চা চামচের চার চামচ বা বোতলের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুযায়ী ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ঔষধ মিশিয়ে নিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে। কান্ড ছিদ্রকারী মাজরা পোকা দমনের জন্য ডায়াজিনন ৫০ বা ৬০ ইসি উল্লেখিত হার ও নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। কৃমি ও তারপোকা দমনের জন্য জমিতে শেষ চাষের সময় শতাংশ প্রতি ৪০০ গ্রাম কুরাটার বা সানফুরান ৫ জি জমিতে 'জো' থাকা অবস্থায় আড়াআড়িভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

গম কাটার উপযুক্ত সময় ঃ বেশি দেরিতে গম কাটলে ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ মাটিতে পড়ে যাবে বা শীষের মধ্যে দানা গজাতে শুরু করবে ও কিছু কিছু দানার মুখ কালো হয়ে দানার মান নষ্ট হবে। তাছাড়া শিলা বৃষ্টি হলে গমের গাছ ও শীষ ভেঙ্গে বা দানা ঝরে মাটিতে পড়ে ফলনের ক্ষতি হবে। গম কাটার উপযুক্ত সময় গম ক্ষেতে ফসলের কোন অংশই সবুজ থাকবে না, ফসল ধূসর বা অন্য বর্ণের রং ধারণ না করে সোনালী বর্ণের চকচকে রং ধারণ করবে। এসময় দানায় আর্দ্রতা কম থাকে, দানা শক্ত হয় এবং শীষের ভিতর থেকে সহজে ঝরে পড়বে না। একটি শীষ হাতে নিয়ে দু'হাতে ভাল করে ঘসা দিলে সহজে চকচকে দানা শীষের ভিতর থেকে বের হবে এবং ফুঁ দিলে খোসাগুলো জোরে উড়ে যাবে। আপনি যদি দানাগুলির পিঠের উপর আপনার বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে জোরে আঁচড় কাটেন এবং যদি কোন দাগ না পড়ে তাহলে বুঝবেন যে, এখন গম কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

ফলন ঃ ৩.৬-৪.৬ টন/হেক্টর

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ মাড়াইকৃত বীজ কয়েকদিন রোদে ভালোভাবে শুকান। রোদে শুকানোর জন্য গম বীজ কোন পরিস্কার পাকা মেঝে/চাটাই/বড় পলিথিন/ত্রিপলের উপর ভালোভাবে বিছিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে পা দিয়ে টেনে টেনে ভালোভাবে উলট-পালট করে দিন। বীজ ভালোভাবে শুকিয়েছে কিনা তা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে পরীক্ষা করুন। দাঁতে চিবানোর সময় "কুট" করে শব্দ হলে বুঝা থাকে যে বীজ ভালোভাবে শুকিয়েছে। "কুট" শব্দ না করে যদি শুধুমাত্র ভেঙ্গে যায় তা হলে বীজে আর্দ্রতার পরিমান বেশি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে না। সংরক্ষণের জন্য বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার নিচে থাকা উত্তম। পুষ্ট ও সবল বীজ সংরক্ষণের জন্য রোদে শুকানোর পর ১.৭৫-২.৫ মিমি ছিদ্র বিশিষ্ট চালনি দিয়ে চেলে সরু ও কুচকানো বীজ বেছে ফেলুন। পরবর্তী মৌসুমে নিজে বপন বা বাজারে/অন্য প্রতিবেশি কৃষকের নিকট বিক্রির জন্য পুষ্ট ও ভাল বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ ঃ উত্তমরূপে বীজ সংরক্ষণের জন্য ধাতব পাত্র যথা তেলের ড্রাম, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। বীজের পরিমান অনুযায়ী ধাতব পাত্র তৈরি করে নিতে পারেন। কিন্তু ধাতব পাত্র পাওয়া না গেলে প্লাস্টিক ড্রাম, মোটা পলিথিন ব্যাগ বা মাটির মটকা/কলস ব্যবহার করতে হবে। ধাতব পাত্র/মাটির মটকা/কলসের ভিতরে ও বাইরের গায়ে আলকাতরা বা পেইন্ট জাতীয় রং এর দু'বার প্রলেপ দিয়ে ভালোভাবে শুকানোর পর বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। যে কোন রং দ্বারা প্রলেপ দিলে পাত্রটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলো বন্ধ হবে ফলে বাইরের বাতাস বা জলীয় বাস্প ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। পলিথিন ব্যাগে বীজ রাখার পর ঝাকুনি ও চাপ দিয়ে বাতাস বের করে বীজ বরাবর শক্তভাবে খোলা মুখটি বাধুন। বীজ ভর্তি পলিথিন ব্যাগটি একটি চটের বস্তা অর্থাৎ ছালার মধ্যে ঢুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রযুক্তি ঃ বিনা চাষে গম আবাদ

প্রযুক্তির বর্ণনা ঃ এই পদ্ধতিতে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় আমন ধান কাটার পরপরই গমের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়। মাটিতে বিদ্যমান আদ্রতায় গমের চারা অঙ্কুরিত হয় এবং মাটিতে লবণাক্ততা কম থাকায় চারার বৃদ্ধিতে কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। পরবর্তীতে গাছ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষেত হয় বিধায় মাটির লবণাক্ততা ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। দাকোপ এলাকায় এভাবে গমের চাষ করা যায়।

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ রোপা আমন ধান কাটার পর পরই গমের বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়, এতে মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকার কারণে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে লবণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। এছাড়া গম বীজ পানিতে একটু আদ্র করে বপন করা যেতে পারে।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি নির্বাচন ঃ মাঝারী নীচু থেকে মাঝারী উঁচু জমি। এঁটেল থেকে এঁটেল দোআঁশ।

জমি তৈরি ঃ বিনা চাষ বা হালকা চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

অনুমোদিত জাত ঃ শতাব্দী, সৌরব, প্রদীপ, বারি গম ২৫, বারি গম ২৬।

বীজের হার ঃ ১২০ কেজি/হেক্টর

বপনের সময় ঃ নভেম্বরের মাঝামাখি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

সার ব্যবস্থাপন ঃ

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)	***সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি***
ইউরিয়া	১৪০-১৮০	বীজ বপনের সময় বীজের সাথে ছিটিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৪০-১৮০	
এমওপি	৩০-৪০	
জিপসাম	৭০-৯০	
পঁচা গোবর	১০ টন	

পরিচর্যা ঃ আগাছা পরিস্কার, সেচ প্রদান, পোকামাকড়, রোগবালাই, রোগিং ইত্যাদি যথাযথভাবে করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ ১৭ ও ৫৫ দিন বপনের পর।

সেচ প্রদান ঃ নিকটস্থ পুকুর বা খালের অলবণাক্ত পানি দিয়ে বীজ বপনের ১৭-২১ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৫৫-৬০ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।

গাছের গোড়া পঁচা রোগ ঃ এই রোগের ফলে মাটির সমতলে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়। পরে তা গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থানের চারিদিকে ঘিরে ফেলে। পরবর্তীতে পাতা শুকিয়ে গাছ মারা যায়।

প্রতিকার ঃ প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

কর্তনের সময়কাল ঃ মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

ফলন ঃ ২.০-২.৫ টন/হেক্টর

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ মাড়াই করার পর রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংগ্রহ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। এইভাবে ৮-১০% আদ্রতায় সংরক্ষিত বীজ পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা যায়।

ভুট্টা

ভুট্টা ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ ভুট্টার চাষ

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ ঃ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ইনব্রেড (কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ) লাইন হতে নির্বাচিত লাইনের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে জাতটির উদ্ভব হয়। একটি সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাতটি ২০০৭ সালে অবমুক্ত হয়। এলাকাভেদে গাছে সাধারণত ৮৮-১০৭ দিনের মধ্যে স্ত্রী ফুল অর্থাৎ মোচার মাথায় চুল (সিল্ক) বের হয় এবং ১৪৫-১৫৫ দিনে মোচা পরিকপক্কতা লাভ করে। জাতটির মোচার চুলে (সিল্ক) ও পুরুষ ফুলে গুমে গাঢ় বেগুনী রং বিদ্যমান। এ জাতটির দানা কমলা হলুদ রঙের এবং মাথায় গর্ত আছে অর্থাৎ ডেন্ট প্রকৃতির। রবি মৌসুমে গাছের গড় উচ্চতা ২০৫-২৩১ সেমি এবং অগ্রভাগ পর্যন্ত খোসা দ্বারা শক্তভাবে আবৃত থাকে । ভুট্টার হাজার দানার ওজন ৩৪০-৩৬০ গ্রাম।

চিত্র : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ ঃ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ উচ্চ গুনগত মানের আমিষ সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত। এটি একটি সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড এবং ২০০৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা রবি মৌসুমে ১৯৫-২০০ সেমি এবং রবি মৌসুমে ১১০-১১৫ সেমি। মোচায় বীজের সংখ্যা ৪০০-৪২০ টি। দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম। প্রথম কান্ড বেষ্টনিতে অনেক বেশি এন্থোসায়ানিন রং থাকে।

চিত্র : বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি নির্বাচন ও তৈরি ঃ বেলে ও ভারী এটেল মাটি ছাড়া অন্য সব মাটিতে ভুট্টার আবাদ ভাল হয়। তবে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটি ভুট্রা চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। পানি দাঁড়ায় না এমন এটেল মাটিতেও ভুট্টার চাষ করা সম্ভব। বন্যা প্লাবিত জমি থেকে পানি সরে গেলে বিনা চাষে ভুট্টা আবাদ করা যায়। মাটিতে জোঁ থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে সমান করে নিতে হবে। জমি সমান করার পর চারপাশে নালা তৈরি করতে হবে যাতে সেচ প্রয়োগ ও অতিরিক্ত পানি বের করা সহজ হয়।

বপনের সময় ঃ জমির প্রকারভেদে রবি মৌসুমে কার্তিক থেকে অগ্রাহায়ণের ৩য় সপ্তাহ (নভেম্বরের শুরু হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ঃ বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার উপর এর পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৯০ শতাংশের উপরে হলে হেক্টরপ্রতি ১৮-২০ কেজি বীজ প্রয়োজন।

বীজ শোধন ঃ বীজকে রোগবালাইমুক্ত করার জন্য বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা উত্তম। ক্রয়কৃত বীজ শোধন করা হয়ে থাকলে সরাসরি বপন করা যাবে। অন্যথায় প্রতি ১০ কেজি বীজ ২৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা উত্তমরূপে মুখবন্ধ পাত্রে ঝাঁকিয়ে শোধন করতে হবে।

বপন পদ্ধতি ঃ বীজ সারিতে বুনতে হবে। এতে নিড়ানি, সার ও সেচ দেওয়া সহজ হয় এবং খরচও কম পড়ে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি (প্রায় ৩০ ইঞ্চি) গভীর করে সারি টেনে নিতে হবে। প্রতি সারিতে ২০ সেমি (প্রায় ৮ ইঞ্চি) দূরত্বে ১টি বীজ বপন করতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে বীজ আরও গভীরে (৫-১০ সেমি) বুনতে হবে। বীজ বোনার পর লাইনগুলো দু'পাশের মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে। বপনের পূর্বে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। জমিতে পরিমিত রস না থাকলে বীজ বোনার পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে।

পাখি তাড়ানো ঃ বীজ বোনার পর হতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ভুট্টা ক্ষেত নানারকম অনিষ্টকারী পাখি যেমন, কাঁক, কবুতর, শালিক ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এতে চারার সংখ্যা কমে যায় এবং ফলন কম হয়। তাই বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়াতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ হাইব্রিড ভুট্টার ফলন বেশি হওয়ায় মুক্ত পরাগায়িত ভূট্টার চেয়ে অধিক সারের প্রয়োজন হয়।

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি*
ইউরিয়া	৫৩০-৫৮০	জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু জমিতে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গোবর সার প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সারের মাত্রা কম দিতে হবে।
টিএসপি	২৬০-৩০০	
এমপি	১৮৫-২৩৫	
জিপসাম	২১০-২৩৫	
জিংক সালফেট	১২-১৫	
বরিক এসিড	৫-৮	
গোবর/আবর্জনা পচা সার	৪৪৫০-৫০০০	

উপরি সার প্রয়োগ ও গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ঃ ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ সমান দু'ভাগ করে রবি মৌসুমে বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর (৮-১০ পাতার সময়) প্রথম ভাগ ও ৬০-৬৫ দিন পর (গাছের মাথায় পুরষ ফুল বের হওয়ার আগে) দ্বিতীয় ভাগ উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস থাকা আবশ্যক। উপরি সার ছিটিয়ে না দিয়ে সারিতে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা ভাল। প্রথমবার উপরি প্রয়োগের পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

চারা পাতলাকরণ ঃ যদি প্রতি গর্তে একাধিক বীজ লাগানো হয় তবে বীজ গজানোর ১০-১৫ দিন পর প্রতি গোছায় ১টি করে সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ জমিতে আগাছার পরিমাণ বুঝে নিড়ানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভুট্টা বোনার দিন থেকে ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আগাছা পরিস্কারের জন্য নিড়ানি/ছোট কোদাল ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেচ প্রদান ঃ রবি মৌসুমে সেচ ছাড়া ভাল ফলন আশা করা যায় না। জমি ও মাটির প্রকারভেদে ২/৩টি সেচ দেয়া প্রয়োজন। বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর (৮-১০ পাতার সময়) প্রথম সেচ এবং ৬০-৬৫ দিন পর (গাছের মাথায় পুরুষ ফুল বের হওয়ার আগে) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। জমিতে রসের পরিমাণ কম হলে ৮৫-৯০ দিন পর (দানা বাধতে শুরু করলে) তৃতীয় সেচ দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ঃ বর্তমানে চাষাবাদ বৃদ্ধির সাথে সাথে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাল ফলন পেতে হলে এসব রোগবালাই দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে চারা অবস্থায় কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ভোর বেলা কাটা গাছের গোড়া খুড়ে কীড়াগুলো মেরে ফেলতে হবে। সেচ দিলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপর আসবে। ফলে সহজে পাখি এদের ধরে খাবে বা হাত দ্বারা মেরে ফেলা যাবে। এ ছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ডারসবান /পাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে চারা গাছের গোড়ায় স্প্রে করে মাটি ভিজিয়ে দিয়ে কীড়া দমন করা যায়। শক্ত কান্ডে মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ফলে গাছে মাইজ মরা লক্ষণ দেখা যায় ও মোচা হয় না। এ ক্ষেত্রে মার্শাল ২০ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি হারে মিশিয়ে পাতা ও কান্ড ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া বর্তমানে ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগের আক্রমণ দেখা দিয়েছে। এ রোগে গাছের নিচের দিকের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে বিস্তার লাভ করে। ফলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং অনেক সময় পুড়ে যাওয়ার মত মনে হয়। এক্ষেত্রে টিল্ট অথবা টেবুকুনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ সিসি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩/৪ বার গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

মোছা সংগ্রহ ঃ ভুট্টা সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে খেতে হলে অপরিপক্ক মোচা অর্থাৎ দানা অল্প নরম থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। মোচা খড়ের রং ধারণ করলে ও পাতা কিছুটা হলদে হয়ে এলে বুঝতে হবে মোচা সংগ্রহের সময় হয়েছে। মোচা থেকে ছাড়ানো দানার গোড়ায় কালো দাগ দেখা দিলে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে মোচা পেকেছে। তখন পাকা মোচাগুলো গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অতি বৃষ্টিতে গাছ থেকে মোচা সময়মত সংগ্রহ করতে না পারলে পাকা মোচার কিছুটা নিচে গাছ আলতো করে ভেঙ্গে গাছের মাথাসহ মোচা মাটির দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে যাতে মোচার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে।

মাড়াই ও সংরক্ষণ ঃ গাছ থেকে মোচা সংগ্রহের সময়ই মোছাগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নেয়া ভাল। সংগৃহীত মোচা ৩-৪ দিন খুব ভাল করে রোদে শুকিয়ে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে বা হাত দিয়ে দানা ছাড়াতে হবে। শক্তি চালিত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক সহজে ও কম সময়ে বেশি ভুট্টা মাড়াই করা সম্ভব। দানা ছাড়ানোর পর তা আবার শুকিয়ে সংরক্ষণের পূর্বে দাঁত দিয়ে চাপ দিলে যদি 'কট' শব্দ করে ভেঙ্গে যায় তাহলে বুঝতে হবে দানা সংরক্ষণের উপযোগী হয়েছে। সাধারণত এই সময় দানায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শতকরা ১০-১২ ভাগ থাকে। সংরক্ষণের পূর্বে দানা ১০-১২ ঘন্টা ঠান্ডা করে নিতে হবে। পরিস্কার ছিদ্রমুক্ত ড্রাম অথবা মোটা পলিথিন দেয়া চটের বস্তায় ভুট্টা দানা এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন ভিতরে খালি জায়গা না থাকে। ড্রাম ও বস্তার মুখ বন্ধ করে বাঁশ বা কাঁঠের পাটাতনের উপর বিক্রয়ের আগ পর্যন্ত রেখে দিতে হবে।

ফলন ঃ ৮-৯ টন/হেক্টর (রবি মৌসুমে), ৫-৬ টন/হেক্টর (খরিফ মৌসুমে)।

প্রযুক্তি ঃ খই ভুট্টার চাষ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি খই ভুট্টা-১ঃ গাছ মাঝারি উচ্চতা, মোচার উপরি পাতা অপেক্ষাকৃত সরু এবং দানা আকারে ছোট। হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম। রবি মৌসুমে ১২৫-১৩০ দিন এবং খরিপ মৌসুমে ৯০-১০০ দিনে পাকে। ভুট্টার দানা থেকে শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ খই পাওয়া যায়। লবনাক্ত এলাকায় আমন ধান কর্তনের পর খই ভুট্টা চাষ করে পতিত জমি ব্যবহার এবং অধিক লাভজনক। নোয়াখালী, ফেনী, ভোলা, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা ও খুলানার লবনাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী।

চিত্র : খই ভুট্টা

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির ধরণ ঃ মাঝারী নীচু, বেলে দোঁআশ, দোঁআশ, এটেল দোঁআশ ও পলি এটেল ।

জমি তৈরি ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে ।

বীজের হার ঃ ৫০ কেজি/হেক্টর ।

বপনের সময়কাল ঃ প্রথম থেকে মধ্য ডিসেম্বর ।

গাছের দূরত্ব ঃ সারিতে বপন (৪০ সেমি × ২০ সেমি) ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি*
ইউরিয়া	২২৫	সমুদয় সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে ইউরিয়া ৫০ ভাগ বপনের সময় এবং বাকী ইউরিয়া বপনের ৩০ ও ৬০ দিন বপনের পর ।
টিএসপি	১৫৫	
এমপি	৬৭	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ চারা গজানোর ৩৫-৪০ দিন পর একটি নিড়ানী দিতে হয় ।

সেচ প্রদান ঃ বৃষ্টি নির্ভর ।

কর্তনের সময়কাল ঃ মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ ।

ফলন ঃ ৪ টন/হেক্টর (রবি মৌসুমে) এবং ২.৫-৩.৫ টন (খরিফ মৌসুমে)

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ পরিপক্ক মোচা সংগ্রহ করে খোসা ছাড়ানোর পর রোদে শুকিয়ে দানা ছাড়াতে হয় । দানা ভাল ভাবে শুকিয়ে বাজার জাত করতে হবে ।

প্রযুক্তির নাম ঃ বিনা চাষে ভুট্টা আবাদ

প্রযুক্তির বর্ণনা ঃ বিনা চাষে ভুট্টার আবাদ এ অঞ্চলের কৃষির আরেকটি প্রযুক্তি । এই পদ্ধতিতে আমন ধান কাটার পর মাটি কর্দমাক্ত থাকা অবস্থায় মাটির ২-৩ সেমি নীচে ভুট্টার বীজ পূঁতে দেওয়া হয় । মাটিতে বিদ্যমান আর্দ্রতায় ভুট্রার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং মাটির লবণাক্ততা কম থাকায় চারার বৃদ্ধিতে কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না । রোপা আমন ধান কাটার পর কর্দমাক্ত মাটিতে ভুট্টার বীজ পুঁতে (ডিবলিং) দিতে হবে । এতে মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকায় বীজ সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে লবণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে পারে । দাকোপ এলাকার জন্য এ প্রযুক্তি প্রযোজ্য ।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির ধরণ ঃ মাঝারী নীচু থকে মাঝারী উঁচু জমি । এঁটেল থেকে এঁটেল দোআঁশ ।

অনুমোদিত জাত ঃ বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫, বারি হাইব্রিড ভুট্টা -৭, বারি ভুট্টা -৯ ।

বীজের হার ঃ ২০-২৫ কেজি/হেক্টর ।

বপনের সময় ঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি ।

গাছের দুরত্ব ঃ ৬০ সেমি × ২৫ সেমি ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৭২-৩১২	সকল সার ও তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া বীজ বপনের সময় এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুইভাগে চারা গজানোর ৩০ দিন এবং ৬০ দিন পর ভুট্টার সারির পাশে প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৬৮-২১৬	
এমওপি	৯৬-১৪৪	
জিপসাম	১৪৪-১৬৮	
জিংক সালফেট	১০-১৫	
বরিক এসিড	৫-৬	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ দুই বার, ৩০ ও ৬০ দিন বপনের পর ।

সেচ প্রদান ঃ নিকটস্থ পুকুর বা খালের অলবণাক্ত পানি দিয়ে বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ, ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ এবং ৬০-৭০ দিন পর তৃতীয় বা শেষ সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

বীজ পঁচা ও গোড়া পঁচা রোগ ঃ নানা প্রকার বীজ ও মাটি বাহিত ছত্রাক দ্বারা বীজের পচন, পাতা ঝলসানো, গোড়া ও শিকড় পঁচা রোগ হয়ে থাকে। প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

কর্তনের সময়কাল ঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত।

ফলন ঃ ৫.০-৬.০ টন/হেক্টর

সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ঃ মাড়াই করার পর রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংগ্রহ করলে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোদে শুকানো বীজ ছায়াতে ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। এইভাবে ৮-১০% আর্দ্রতায় সংরক্ষিত বীজ পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তি ঃ লবণাক্ত এলাকায় আমন ধানের পর দানা ও গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টার চাষ

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ লবণাক্ত এলাকায় আমন ধান কর্তনের পর ডিসেম্বরের মধ্যে ভুট্টা চাষ করে গোখাদ্যের অভাব পূরণ। লবণাক্ত এলাকায় এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে রূপান্তর করে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকের আয়বৃদ্ধি এবং গোখাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায়। পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলার জন্য প্রযোজ্য।

মাটির ধরণ ঃ বেলে দোআঁশ, দোআঁশ, এটেল দোআঁশ ও পলি এঁটেল।

জাত ঃ বারি হাইব্রিড ভুট্টা ৫/বারি হাইব্রিড ভুট্টা ৭/বারি হাইব্রিড ভুট্টা ৯/প্যাসিফিক ১১/৫৫

জমি তৈরি ঃ প্রচলিত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

বপন পদ্ধতি ঃ সারিতে বপন (৭৫ সেমি × ২৫ সেমি)

বীজের হার ঃ ২০ কেজি/হেক্টর

বপন সময় ঃ ডিসেম্বর

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	৫৫০	সকল সার ও তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া বীজ বপনের সময় এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুইভাগে চারা গজানোর ৩০ দিন এবং ৬০ দিন পর ভুট্টার সারির পাশে প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	২৫০	
এমপি	২২০	
জিপসাম	২৬০	
জিংক সালফেট	১৫	
গোবর	৬	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ চারা গজানোর ৩৫-৪০ দিন পর একটি নিড়ানি।

সেচ প্রদান ঃ সেচ/বৃষ্টি নির্ভর

ফসল সংগ্রহ ঃ ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ।

ফলন ঃ ৬-৭ টন হেক্টর

প্রযুক্তি ঃ লবনাক্ত এলাকায় আন্তঃফসল হিসেবে মিষ্টি আলুর সাথে হাইব্রিড ভুট্টা চাষ

প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমুহ ঃ

একক মিষ্টি আলু বা হাইব্রিড ভুট্টার চেয়ে অনেক উৎপাদনশীল, আবহাওয়া জনিত কারণে একটি ফসল নষ্ট হলেও অপরটি হতে কিছু ফসল পাওয়া যায় এবং উভয় ফসলই লবনাক্ততা সহিষ্ণু । পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও খুলনার লবনাক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমির ধরণ ঃ মাঝারী উচু জমি।

মাটির বর্ণনা ঃ বেলে দোআঁশ, দোআঁশ, এটেল দোঁআশ ও পলি এটেল।

জমি প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

অনুমোদিত জাত ঃ মিষ্টি আলুঃ বারি মিষ্টি আলু-৭ এবং হাইব্রিড ভুট্টাঃ বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭।

বীজের হার ঃ মিষ্টি আলু লতা ঃ ৫৫৫৬০-৫৬০০০/হেক্টর এবং ভুট্টাঃ ১০-১৫ কেজি/হেক্টর ।

রোপন পদ্ধতি (গাছের দুরত্ব) ঃ দু'সারি মিষ্টি আলুর (৬০ সেমি × ৩০ সেমি) পর এক সারি হাইব্রিড ভুট্টা (১২০ সেমি × ২০ সেমি) রোপন করা হয়।

বপনের সময় ঃ ডিসেম্বরের ১ম থেকে ৩য় সপ্তাহে।

চিত্র : মিষ্টি আলু + ভুট্টা

জৈব সারের পরিমান ও পদ্ধতি ঃ

গোবর ঃ ৫ টন / হেক্টর। শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	২৮০-৩০০	ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া বপনের ৩০-৩৫ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	২৬৫-২৭৫	
এমওপি	২২০-২৩০	
জিপসাম	২২০-২২৫	
জিংক সালফেট	১০-১১	
বরিক এসিড	৫-৬	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। বপনের ৩৫ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ বপনের ১৫ ও ৩৫ দিন পর সেচ দিতে হবে।

গাছের রোগের বিবরণ এবং ব্যবস্থাপনা ঃ এই প্রযুক্তিতে সাধারণতঃ তেমন কোন রোগ দেখা যায় না ।

কর্তনের সময়কাল ঃ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ।

ফলন (টন/হেক্টর) ঃ হাইব্রিড ভুট্টা ঃ ৪-৫ টন/হেক্টর, ***মিষ্টি আলু ঃ*** ২৫-২৭ টন/হেক্টর

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ পরিপক্ক মোচা সংগ্রহ করে খোসা ছাড়ানোর পর রোদে শুকিয়ে দানা ছাড়াতে হয়। দানা ভাল ভাবে শুকিয়ে বাজার জাত করতে হবে।

তেল

তেল ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ চীনাবাদাম চাষ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বিনা চীনাবাদাম-৫

চিত্র : বিনা চীনাবাদাম-৫

বিনা চীনাবাদাম-৫ এ জাতটি উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে ২৫০ গ্রে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায় যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৩। ২০১১ সালে এই মিউট্যান্ট বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার পটুয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বিনা চীনাবাদাম-৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দেয়। জাতটি ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। প্রতি ফলে দানার সংখ্যা মূলত ২টি এবং দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ। বীজে আমিষ ও তেলের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৫.৭২ ও ৪৯.০ ভাগ। জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ২.২ টন। কলার রট ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী সম্পন্ন এবং জ্যাসিড, পাতা মোড়ানো ও বিছা পোকার আক্রমণে ফলনে কোন প্রভাব পড়ে না।

বিনা চীনাবাদাম-৬

চিত্র : বিনা চীনাবাদাম-৬

জাতটি উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে ২৫০ গ্রে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায় যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৩। ২০১১ সালে এই মিউট্যান্টকে জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার পটুয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বিনা চীনাবাদাম-৬ নামে অনুমোদন দেয়। জাতটি ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। প্রতি পডে দানার সংখ্যা মূলত ২টি এবং পডে দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ। বীজে আমিষ ও তেলের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৮.৬৮ ও ৪৮.৫১ ভাগ।

বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার জন্য প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-৫	বিনাচীনাবাদাম-৬
গাছের উচ্চতা	গাছ মধ্যম আকৃতির ও খাড়া, গাছের উচ্চতা ২৬ সেমি।	গাছ খাটো ও খাড়া, গাছের উচ্চতা ১৬.১৭ সেমি।
পত্রফলক	পত্রফলক লম্বা ডিম্বাকৃতির ও সবুজ।	পত্রফলক লম্বা ডিম্বাকৃতির ও হালকা সবুজ।
ফল ও বীজ	মাতৃজাত অপেক্ষা ফল ১০% ও বীজ ১৫% বড়।	মাতৃজাত অপেক্ষা ফল ৩০% ও বীজ ৪০% বড়।
রোগবালাই	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল।	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল।
বিছাপোকার আক্রমণ	মাতৃজাত অপেক্ষা আক্রমণ কম।	মাতৃজাত অপেক্ষা আক্রমণ কম।
জীবনকাল (রবি মৌসুম)	১৪০-১৫০ দিন	১৪০-১৫০ দিন।
বীজে তেলের পরিমাণ (%)	৪৯.০	৪৮.৫১
বীজে আমিষের পরিমাণ (%)	২৫.৭২	২৮.৬৮

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র চীনাবাদামের চাষ করা যায়। মাঝারী উচু ও উচু জমিতে চীনাবাদাম চাষ ভাল হয়। বেলে, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ মাটিতে এর চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

জমি তৈরি ঃ ৩-৪ টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুড়ঝুড়ে করে নিতে হয়। আগাছা থাকলে তা তুলে ফেলে দিতে হয়।

বীজের হার (খোসাসহ) ঃ ১২৫-১৩০ কেজি/হেক্টর।

বপনের সময় ঃ রবি মৌসুম ঃ ১৫ই কার্তিক হতে ১৫ই অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)।

খরিফ-১ মৌসুম ঃ ১৫ই মাঘ হতে ১৫ই ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারির ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)।

গাছের দূরত্ব ঃ বীজ সারিতে লাগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২৫ সেমি। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১৫ সেমি। বীজগুলো মাটির ২.৫-৪.০ সেমি নিচে পুঁতে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি*
ইউরিয়া	৬০-৮০	সমুদয় সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১০০-১৫০	
এমপি	১০০-১৫০	
জিপসাম	১০০-১৫০	
জীবাণুসার বীজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	২.২	
দস্তা (জিংক)	২.৫-৫	
বোরন	১-২	
মলিবডেনাম	১-১.৫	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর একবার প্রয়োজন বোধে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চীনাবাদাম খরিফ-২ মৌসুমে সেচের প্রয়োজন হয় না। রবি মৌসুমে আবহাওয়া শুস্ক থাকার কারনে দ্রুত পানি শুকিয়ে যায়। তাই মাটির অবস্থাভেদে প্রয়োজন অনুযায়ী ১-২ টি সেচ দেওয়া প্রয়োজন হয়।

রোগ ও পোকামাকড় বিবরণ এবং ব্যবস্থাপনা ঃ জমিতে বাদাম লাগানোর পর পর পিঁপড়া আক্রমণ করে রোপণকৃত বাদামের দানা সব খেয়ে ফেলতে পারে। এ জন্য বাদাম লাগানো শেষ হলেই ক্ষেতের চারদিকে সেভিন ডাস্ট ৬০ WP ছিটিয়ে দিতে হবে। পাতা মোড়ানো পোকা, বিছা পোকা ও জ্যাসিড এর আক্রমন হলে কোরজেন একর প্রতি ৪০ মিলি অথবা ভলিয়াম ফ্লেক্সি হেক্টরপ্রতি ৩০০ মিলি অথবা বেল্ট হেক্টরপ্রতি ২০০ মিলি ২০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করতে হবে।

উইপোকা চীনাবাদাম গাছের এবং বাদামের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এরা বাদাম গাছের প্রধান শিকড় কেটে দেয় এবং শিকড়ের ভিতর গর্ত সৃষ্টি করে। ফলে গাছ মারা যায়। উইপোকা মাটির নিচের বাদামের খোসা ছিদ্র করে বীজ খায়। পানির সাথে কেরোসিন মিশিয়ে সেচ দিলে উইপোকা জমি ত্যাগ করে। পাট কাঠির ফাঁদ তৈরি করে এ পোকা কিছুটা দমন করা যায়। মাটির পাত্রে পাটের কাঠি ভর্তি করে পুঁতে রাখলে তাতে উইপোকা লাগে। তারপর ঐ কাঠি ভর্তি পাত্র তুলে উইপোকা মারতে হবে। আক্রান্ত মাঠে ক্লাসিক ২০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৬০ মিলি মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সারকোস্পোরা এরাচিডিকোলা ও ফেসারিওপসিস পারসোনাটা নামক দুটি ছত্রাক দ্বারা সৃষ্টি হয়। রোগের আক্রমণের ফলে পাতার ওপরে হলদে রেখা বেষ্টিত বাদামি রংয়ের দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ আকারে বড় হয় এবং পাতার ওপরে ছড়িয়ে থাকে। গাছ দেরিতে আক্রান্ত হলে পাতার নিচে দাগ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে দাগ গাঢ় বাদামি হতে কালচে বর্ণের হয়। পাতার বাকি অংশের সবুজ রং মলিন হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে পাতা ঝরে পড়ে। এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে গাছে ব্যাভিস্টিন ৫০ WP ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার ছিটালে রোগের প্রকোপ কমে যায়। এ ক্ষেত্রে ইন্ডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। ফলিকুর ১% হারে ১০ দিন পর পর ছিটালে এ রোগের প্রকোপ কমে যায়। ফসল কাটার পর আগাছা পুড়ে ফেলতে হবে।

মরিচা রোগ দমন : পাকসিনিয়া এরাচিডিস (Puccinea arachis) নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার নিচের পিঠে মরিচা পড়ার ন্যায় সামান্য উঁচু বিন্দুর মত দাগ দেখা যায়। দাগ ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাতার উপরি ভাগের পিঠেও এ রোগ দেখা যায়। গাছ এ রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলে চীনাবাদামের ফলন অনেক কমে যায়। এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ক্যালিক্সিন (০.১%) বা টিল্ট-২৫০ ইসি ০.০৫% প্রতি লিটার পানির সাথে আধা মিলি হারে ১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ফলিকুর ১% হারে ১০ দিন পর পর ছিটালে এ রোগের প্রকোপ কমে যায়। পূর্ববর্তী ফসল থেকে গজানো গাছ, আগাছা এবং নাড়া (খড়) পুড়ে ফেলে এ রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

কর্তনের সময়কাল ঃ ভাল বীজ বা গুণগতমানের বীজ পেতে হলে ফসল যথাসময়ে কাটতে হবে। ফসল সঠিক সময় উঠাতে হলে ফসলের পরিপক্কতা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকা আবশ্যক। চীনাবাদাম বীজ খুবই সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর। কাজেই চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বাদাম যখন পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ক হয় তখন বাদামের খোসার শিরা উপ-শিরাগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গাছের পাতাগুলি হলুদ রং ধারণ করে নিচের পাতা ঝরে পড়তে থাকবে। বাদামের খোসা ভাঙ্গার পর খোসার ভিতরে সাদা কালচে দাগ দেখা যাবে এবং বীজের উপরের পাতলা আবরণ বা খোসা বাদামি বা লালচে বা বেগুনি রং (জাত ভেদে) ধারণ করলেই বুঝতে হবে ফসল উঠানোর বা কর্তন করার উপযুক্ত সময়। পরিপক্ক হবার আগে বাদাম উঠালে তা হতে ফল এবং তেল কম হবে। আবার দেরিতে উঠালে সুপ্ত না থাকার দরুন জমিতেই অংকুরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

ফলন ঃ ২.৩০ টন/হেক্টর (বিনা চীনাবাদাম-৫), ২.৪০ টন/হেক্টর (বিনা চীনাবাদাম-৬)

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ শস্য কাটার পর গাছ থেকে খোসাসহ ছাড়ানো বাদাম উজ্জ্বল রোদে দৈনিক ৭-৮ ঘন্টা করে ৫-৬ দিন শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। সাধারণত এ অবস্থায় বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% হয়ে থাকে। রোদে শুকানোর পর খোসাসহ বাদাম ঠান্ডা করে উপযুক্ত পাত্রে গুদামজাত করতে হবে। বাদাম বীজ সংরক্ষণের জন্য পলিথিন আচ্ছাদিত বা সিনথেটিক ব্যাগ, চটের বস্তা, মাটির কলসি বা মটকা, কেরোসিন টিন বা ড্রাম, বাঁশের তৈরি ডুলি বা ঝুড়ি, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি সচরাচর এ দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাটির পাত্র ও বাঁশের ডুলিতে বীজ সংরক্ষণের পূর্বে কাদামাটি ও গোবর দিয়ে আস্তরণ দিয়ে নিতে হবে, যাতে বাতাসের আর্দ্রতা পাত্রের ভিতরে ঢুকতে না পারে। আর চটের বস্তার বীজ সংক্ষরণ করার পূর্বে প্রথমে চটের বস্তার সমপরিমাণ মাপের বা সাইজের পলিথিন ব্যাগ চটের বস্তার ভিতর ঢুকিয়ে তারপর পলিথিন ব্যাগে বীজ রেখে পলিথিন ব্যাগ ও চটের বস্তার মুখ ভালভাবে বেঁধে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বাইরের বাতাস ব্যাগের ভিতর ঢুকতে না পারে। এর পর বাদাম বীজসহ চটের বস্তা কাঠের বা বাঁশের তৈরি মাচায় রেখে দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ়-ভাদ্র) প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার রোদে শুকনো খোলায় গুদামজাত বীজ দৈনিক ৩-৪ ঘন্টা শুকিয়ে ঠান্ডা করে পুনরায় পলিথিন ব্যাগ বা টিনের ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের মান বা গুণাগুণ নষ্ট হয় না। নিম্নলিখিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়েও বীজ সংরক্ষণ করা যায়। ঠান্ডা ঘর (কোল্ড রুম) যেখানে তাপমাত্রা ১৮-২০° সে. থাকে এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৪০-৪৫% থাকে সেখানে ১ বৎসর থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত শুকানো বীজ (৮ থেকে ১০% বীজের আর্দ্রতা) সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। ডিপ ফ্রিজ বা অধিক ঠান্ডা ঘর যেখানে তাপমাত্রা ৩-৪° সে. এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৩০% এর নিচে থাকে সেখানে শুকানো বীজ (৭-৮% বীজের আর্দ্রতা) ৩-৫ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

সয়াবিন চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ সয়াবিন চাষ

২০১১ সালে বিনা সয়াবিন-১ ও বিনা সয়াবিন-২ নামে দুইটি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয় যা নোয়াখালি, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, ভোলা জেলা সমূহে চাষাবাদের জন্য প্রযোজ্য ।

জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

বিনা সয়াবিন-১ ঃ গাছের উচ্চতা : ৪৮-৫৭ সেমি; প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা : ৪৫-৬০; প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা : ২-৩ টি, ১০০ বীজের ওজন: ১১.৫-১৩.০ গ্রাম; বীজের শর্করার পরিমান ২৭%; বীজে তেলের পরিমাণ ১৮%; বীজে আমিষের পরিমাণ ৪৪.৫%; জীবনকাল: রবি-১১০-১১৫ দিন ।

চিত্র : বিনা সয়াবিন-১

বিনা সয়াবিন-২ ঃ গাছের উচ্চতা : রবি : ২৭-৩৫ সেমি; প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা : ৩০-৬০ টি; প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা: ২-৩ টি; ১০০ বীজের ওজন: ১৩.০-১৩.৮ গ্রাম; বীজে শর্করার পরিমান ২৭%; বীজে তেলের পরিমান ১৯% ; বীজে আমিষের পরিমান ৪৩%; জীবনকাল : রবি: ১০৭-১১২ দিন ।

চিত্র : বিনা সয়াবিন-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমির ও মাটির বর্ণনা ঃ খরিফ মৌসুমের জন্য উচুঁ ও পানি নিস্কাশনযোগ্য জমি এবং রবি মৌসুমের জন্য মাঝারি থেকে নিচু জমি নির্বাচন করতে হবে । বেলে-দোআঁশ, দোআঁশ ও এটেল-দোআঁশ মাটিতে এর চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে ।

জমি তৈরি ঃ ৩-৪ টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুড়ঝুড়ে করে নিতে হয় । আগাছা থাকলে তা তুলে ফেলে দিতে হয় ।

বীজের হার ঃ বিনা সয়াবিন-১ ঃ ৪৫ কেজি/হেক্টর (সারিতে), ৫৫ কেজি/হেক্টর (ছিটিয়ে)

বিনা সয়াবিন-২ ঃ ৫৫ কেজি/হেক্টর (সারিতে), ৬৫ কেজি/হেক্টর (ছিটিয়ে)

বপনের সময় ঃ পৌষের প্রথম থেকে মাঘ মাসের মাঝামাঝি (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি শেষ) বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ।

গাছের দূরত্ব ঃ বীজ সারিতে লাগাতে হবে । সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেমি । বীজগুলো মাটির ৩-৪ সেমি নিচে পুঁতে দিতে হবে ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	***সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)***	***প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি***
ইউরিয়া	৫০-৬০	সমুদয় সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
টিএসপি	১৫০-১৭৫	
এমপি	১০০-১২০	
জিপসাম	৮০-১১৫	
জীবাণুসার বীজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	১.৫-২.০	

পরিচর্যা ঃ গাছ খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে, জাত ভেদে সারিতে গাছ হতে গাছের দূরত্ব রাখতে হবে ২.৫-৪.০ ইঞ্চি। তবে প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৫৫ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি গাছ রাখা উত্তম।

আগাছা দমন ঃ চারা গজানোর ১৫-২০ দিনের মধ্য আগাছা দমন করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ ফল ধরার সময় সম্পূরক সেচের প্রয়োজন হতে পারে। বৃষ্টি না হলে প্রথম সেচ বীজ গজানোর ২০-৩০ দিন পর এবং ২য় সেচ বীজ গজানোর ৫০-৫৫ দিন পর দিতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ

বিছা ও পাতা মোড়ানো পোকা ঃ কোরাজেন একর প্রতি ৪০ মিলি অথবা ভলিয়াম ফ্লেক্সি একর প্রতি ১২০ অথবা বেল্ট একর প্রতি ৮০ মিলি ২০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করুন। বিনা সয়াবিন-১ ও বিনা সয়াবিন-২ হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী এবং কান্ড পচা রোগ নিরোধক জাত।

কর্তনের সময়কাল ঃ পরিপক্ক হলে সয়াবিন গাছ শুটিসহ হলুদ হয়ে আসলে এবং পাতা ঝরে গেলে মাটির উপর হতে কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন ঃ বিনা সয়াবিন-১ ঃ ২.৫-৩.০০ টন/হেক্টর (খরিফ-২), বিনা সয়াবিন-২ ঃ ২.৭-৩.৩০ টন/হেক্টর (খরিফ-২)।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ শুটি সহ সয়াবিন গাছ রোদে ৩-৪ দিন শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দানাগুলো আলাদা করতে হবে। মাড়াই করা বীজ রোদে ভালো করে শুকিয়ে ঠান্ডা করে গুদামজাত করতে হবে।

প্রযুক্তি ঃ সয়াবীনের সাথে কাউনের আন্তঃফসল চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ আন্তঃ ফসল উৎপাদনে জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং একই সাথে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায়। লক্ষ্মীপুর ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

ফসল ঃ সয়াবীন ও কাউন

জাত ঃ বারি সয়াবীন ৫ ও বারি কাউন ৩

বীজের হার ঃ সয়াবীন: ৪০ কেজি/হেক্টর, কাউন :৪ কেজি/হেক্টর।

বপনের দূরত্ব ঃ সয়াবীন: ৩০ সেমি × ১০ সেমি, ***কাউন :*** ৩০ সেমি× ৫ সেমি।

বপন সময় ঃ জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ।

সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি*
ইউরিয়া	১৭৪	এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি ও এমপি জমিতে শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দু'ভাগ করে বীজ বপনের ২৫ ও ৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	৩০৫	
এমপি	৩৫	

ফলন ঃ সয়াবীন: ১৯২০ কেজি/হেক্টর, কাউন :৯৪০ কেজি/হেক্টর।

সরিষার চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ সরিষার চাষ

জাতের বৈশিষ্ট্য সমূহ (বারি সরিষা-১৪) ঃ উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি। হালকা সবুজ রঙের এবং মসৃণ। কচি পাতার বোটা কান্ডকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা সাধারণত ৪-৬ টি। কিন্তু কোন সেকেন্ডারী শাখা থাকে না। প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির উপরে থাকে। ফুলের রং হলুদ। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৮০-১০০ টি। শুটি যদিও দেখতে চার প্রকোষ্ট বিশিষ্ট মনে হয় কিন্তু আসলে দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুটিতে বীজের সংখ্যা ২২-২৬ টি। বীজের রং হলুদ বর্ণের। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫-৩.৮ গ্রাম। জীবনকাল ৭৫-৮০ দিন। ফলন প্রতি হেক্টরে ১.৪০-১.৬০ টন। এ জাতটি টরি ৭ এর চেয়ে ২০-২৫% বেশি ফলন দেয়।

চিত্র : বারি সরিষা-১৪

বারি সরিষা-১৫ ঃ ২০০৬ সালে বারি সরিষা-১৫ নামে জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। উচ্চতা ৯০-১০ সেমি। হালকা সবুজ রঙের এবং মসৃণ পাতা। কচি পাতার বোটা কান্ডকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা সাধারণত ৬-৮টি। সেকেন্ডারী শাখা হয়না বললেই চলে। প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির উপরে থাকে। ফুলের রং সাদা। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৭০-৮০টি। শুটি দুই প্রকোষ্ট বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুটিতে বীজের সংখ্যা ২০-২২ টি। শুটি বারি সরিষা ১৪ তুলনায় সরু ও লম্বা। বীজের রং হলুদ বর্ণের। ১০০০ বীজের ওজন ৩.২৫-৩.৫০ গ্রাম। জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন।

চিত্র : বারি সরিষা-১৫

বপন কাল ঃ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি।

জমি তৈরি ঃ এ জাতের সরিষা দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। মাঝারী উঁচু জমি এ জাতের চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। বীজ ছোট বিধায় জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হয়। পর পর ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। জমিতে যাতে বড় ঢিলা ও আগাছা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বপনের সময় ঃ সরিষার বপন সময় শীত শুরুর সংঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণত আশ্বিন মাসের শেষ থেকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) এ জাত বপন করার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বপন করলে ফলন কমে যায়। দেশের উত্তর অঞ্চলে যেহেতু শীত আগে আসে সেখানে আগাম বপন করা সম্ভব। আমন ধান কাটার পর বেশি দেরি না করে সরিষা বপন করা উচিত।

বীজের হারঃ ৬-৭ কেজি/হেক্টর।

বপন পদ্ধতি ঃ

সারিতে এবং ছিটিয়ে উভয় প্রকারেই সরিষার বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ লাগাতার বপন করতে হয়। সারিতে বুনলে পরবর্তীতে আগাছা দমন ও অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়। সারি তৈরির জন্য লোহার তৈরি টাইন অথবা ছোট কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করা যেতে পারে। আড়াই থেকে তিন সেমি গভীরে বীজ বপন করার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে শেষ চাষের পর বীজ বপন করতে হবে এবং মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সরিষার বীজ ছোট বিধায় বপনের সুবিধার জন্য বীজের সংগে ঝুরঝুরে মাটি অথবা ছাই মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ ও সময়কাল
ইউরিয়া	২০০-২৫০	সরিষা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাড়াতাড়ি শারীরিক বৃদ্ধির জন্য বেশির ভাগ সার গ্রহণ করে থাকে সেজন্য অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসেবে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্ছনীয়। রস কম থাকলে হালকা সেচ দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৫০-১৭০	
এমপি	৭০-৮৫	
জিপসাম	১২০-১৫০	
জিংক অক্সাইড	০-৫	
বরিক এসিড	০-৫	

সেচ প্রদানঃ সরিষা ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন। সাধারণত মাটিতে যে রস থাকে তার মাধ্যমে আমাদের দেশে সরিষার চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে যেখানে সেচের সুযোগ রয়েছে সেখানে উন্নত জাতের সরিষা সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। কখনো কখনো বপনের সময় জমিতে রসের অভাব থাকে, সেক্ষেত্রে বপনের আগেই সেচ দিয়ে রসের ব্যবস্থা করতে হবে। ফুল আসার আগে অর্থাৎ বপন করার ১৮-২০ দিন পর এবং শুটি হওয়ার সময় ৫০-৫৫ দিনে জমিতে রস থাকা প্রয়োজন। কাজেই এ সময়ে জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ দেওয়া বাঞ্চনীয়। সরিষার জমিতে সাধারণত প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেচের পানি জমিতে আটকে না থাকে।

পরিচর্যা ঃ চারা গজানোর ১০-১২ দিনের মধ্যে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয় বার নিড়ানী দিয়ে অতিরিক্ত চারা এবং আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গ মিটার জমিতে ৫০-৬০ টি সরিষার গাছ থাকা বাঞ্ছনীয়। সেচ দেওয়ার পর জমিতে জোঁ আসার সাথে সাথে কোদাল অথবা নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিলে জমিতে বেশি দিন পানি ধরে রাখা যায়। বাড়ন্ত অবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোকামাকড় ও রোগ বালাই ফসলের ক্ষতি না করে।

রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ

পাতা ঝলসানো রোগ ঃ আমাদের দেশে সরিষার রোগসমূহের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এ রোগের আক্রমণে ফলন ২৫-৩০% কমে যেতে পারে বলে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়। তবে রোগের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ফসলের জাত ও সময়ের উপর নির্ভর করে। যদি গাছ বাড়ন্ত অবস্থায় অর্থাৎ ৩০ দিনের মধ্যে গাছের পাতায় আক্রমণ শুরু হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ হয় অনেক বেশি। পক্ষান্তরে পরিপক্ক অবস্থায় আক্রমণ হলে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।

রোগের কারণ ঃ অলটারনরিয়া ব্রাসিসী, অলটারনরিয়া ব্রাসিসীকোলা নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ সরিষা গাছের এক মাস বয়স থেকে শুরু করে বৃদ্ধির যে কোন পর্যায়ে এ রোগ হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় সরিষা গাছের নিচের বয়স্ক পাতায় এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তীতে গাছের পাতা এবং শুঁটিতে গোলাকার, গাঢ় বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। দাগগুলো ধূসর, গোলাকার সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ঝলসে যায়। পরবর্তীতে সরিষার শুঁটিতে আক্রমণ করে এবং শুঁটি ও বীজ হতে খাদ্য গ্রহণ করায় ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার ঃ আক্রান্ত বীজ, বিকল্প পোষাক ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়া এ রোগ বৃদ্ধির সহায়ক। ছত্রাকের বীজ কণা বাতাসের সাহায্যে সুষ্ঠু গাছে ছড়ায়। আক্রান্ত পাতার উপর

ছত্রাকের বীজ কণা সৃষ্টি হয় এবং পরে বাতাসের মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায়।

রোগের প্রতিকার ঃ

ক) সুস্থ, সবল, জীবাণুমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।

খ) রোগ সহনশীল জাত ঃ এ রোগ সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের সরিষার চাষ করতে হবে। তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলো পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল।

গ) আগাম বীজ বপনঃ আগাম সরিষা চাষ অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সরিষার বীজ বপন করলে এ রোগের আক্রমণ কম হয়।

ঘ) বীজ শোধনঃ বপনের পূর্বে বীজ ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা শতকরা ০.২৫ ভাগ হারে (২.৫ গ্রাম ছত্রাকনাশক/কেজি বীজ) বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

ঙ) ১০০ গ্রাম নিমপাতায় সামান্য পানি দিয়ে পিশিয়ে তার রস ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ফসলে ১০ দিন অন্তর ৩ বার সিঞ্চন যন্ত্রের মাধ্যমে গাছে প্রয়োগ করলে রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা রা যায়।

চ) ছত্রাকনাশক প্রয়োগ ঃ এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ WP শতকরা ০.২ ভাগ হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম ছত্রাকনাশক) পনিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ৩ বার সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত গাছে ছিটিয়ে স্প্রে করলে এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব।

ছ) ফসল কর্তনের পর আক্রান্ত গাছের পাতা জমি থেকে সরিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

জ) জমিতে শস্য পর্যায় অনুসরণ করলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

পরজীবি উদ্ভিদ ঃ উত্তর বংগে বিশেষ করে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা জেলায় অরোবাংকি নামক এক প্রকার পরগাছা সরিষার বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। সরিষার জমিতে এ পরগাছা দেখা দিলে নিড়ানী দিয়ে উঠিয়ে এগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। যে সমস্ত জমিতে অরোবাংকির আক্রমণ দেখা যায় সে সমস্ত জমিতে পর পর দুই বছর সরিষা চাষ না করা ভাল।

পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ

সরিষার জাব পোকা ঃ

জাবপোকা বাচ্চা ও পরিণত অবস্থায় দলবদ্ধভাবে সরিষার পাতা, কান্ড, পুষ্পমঞ্জুরী, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে খায়। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়, পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুল ও ফল ধারণ বাঁধাগ্রস্ত হয়। জাপপোকা মধু জাতীয় এক ধরনের মিষ্টি পদার্থ নিঃসৃত করে যা গাছের ফুলে ও কঁচি ফলে লেগে থাকে। তার উপর গুটিমোল্ড ছত্রাক জন্মে এবং ফুল ও ফল শুকিয়ে কাল বর্ণ ধারণ করে। সাধারণতঃ জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত গাছে ফুল ও ফল আসার সময় আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এদের আক্রমণে শতকরা ৩০-৫০ ভাগ ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে।

অক্টোবরের ১৫-৩০ এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদী সরিষা আবাদ করলে জাবপোকার আক্রমণ শতকরা ৫০-৭০ ভাগ কম হয়। নিমপাতার রস (১০০ গ্রাম) এবং ৫-১০ গ্রাম ডিটারজেরন্ট পাউডার ১০ লিটার মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ২ বার আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করে জাবপোকা দমন করা যায়। শতকরা ২০-৩০ ভাগ গাছে জাপপোকার আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাটাফ ৫৭ ইসি বা ডায়জিনন ৬০ ইসি ২ মিঃ গ্রাঃ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ২ বার বিকাল ৩ টার পর স্প্রে করে মৌমাছির কোন ক্ষতি ছাড়াই পোকা দমন করা যায়। লালচে রঙের ছোট লেডিবার্ড বিটল প্রতিদিন ২০-২৫ টি জারপোকা খায়। তাই এ ধরনের শিকারী পোকা সংরক্ষণ করে জাপপোকার জৈবিক দমন করা যায়।

ফসল কর্তন ও সংরক্ষণ

পরিপক্কতার সময় অনুকূল আবহাওয়ায় সরিষা-আগাম বপন করলে পরিপক্কতা দেরী হয় কিন্তু দেরীতে বপন করলে অল্প সময়ে পরিপক্কতা আসে। আগাম বপন করলে সরিষা গাছের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দেরীতে বপন করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির চেয়ে কম হয়ে থাকে। সরিষার ফলন এবং বীজের গুণগত মান বপনের সময় এবং কর্তন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যখন গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ শুটি খড়ের রং ধারণ করে তখন সরিষা কাটার উপযুক্ত সময়। সকালে শুটিসহ গাছ কেটে বা উপড়িয়ে মাড়াই করার স্থানে নিতে হবে এবং গাদা দিয়ে কয়েকদিন রাখতে হবে। পরে দুদিন রোদ্রে গাছ শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়াই করতে হবে। এ সময় বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ ২০% অধিক থাকা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, শুটি যাতে মাঠে অতিরিক্ত পেকে না যায়। বেশি পেকে গেলে, বীজ ক্ষেতে ঝরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশি পেকে গেলে, বীজ ক্ষেতে ঝরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়েও সরিষা মাড়াই করা যায়। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে রোদে ভালভাবে তিন-চার দিন শুকিয়ে নেবার পর শুস্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। সরিষার শুকনো বীজ অর্থাৎ ৮-১০% আর্দ্রতাসহ যে কোন পরিস্কার শুকনো পাত্রে ঘরের শীতল স্থানে রাখলে বেশি সময় অর্থাৎ ২-৩ বছর বীজ সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন ঃ ১৫৫০-১৬৫০ কেজি/হেক্টর (এ জাতটি টরি-৭ এর চেয়ে ২০-২৫% বেশি ফলন দেয়)।

প্রযুক্তি ঃ স্বল্প চাষে সরিষা উৎপাদন

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

টরি-৭ ঃ এ জাতটি বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে। গাছের উচ্চতা ৬০-৭৫ সেমি। গাছ খাটো। ফুলের বোঁটা লম্বা থাকে বলে প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ি সমূহের উপরে অবস্থান করে। ফল একটু বোটা এবং দুই কক্ষ বিশিষ্ট। বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্নের। হাজার দানার ওজন ২.৬-২.৭ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%। বর্তমানে জাতটি রোগবালাই ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ স্বল্প চাষে সরিষা উৎপাদন করলে মাটির আদ্রতা রক্ষিত হয়, লবনাক্ততার ক্ষতিকারক প্রভাব কমানো যায় ও কম খরচে অধিক সরিষা উৎপাদন করা যায়। নোয়াখালি অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি তৈরি ঃ লবনাক্ত এলাকায় বিনা চাষে বা স্বল্প চাষে সরিষা আবাদ করাই উত্তম। এতে জমিতে রসের ঘাটতি থাকে না এবং বীজের অঙ্কুরোদগম ভাল হয়। চারা গাছের সঠিক বৃদ্ধি হওয়াতে ফসল দ্বারা জমির মাটির উপর আবরণ সৃষ্টি হয় ফলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে লবন নীচ থেকে উপরে উঠতে পারে না এবং লবনাক্ততা গাছের কম ক্ষতি করে। বিনা চাষ প্রযুক্তিতে আমন ধান কাটার সাথে সাথে জমির 'জো' অবস্থায় দেশি লাঙ্গল দিয়ে ২টি অথবা ট্রাক্টর দিয়ে ১টি চাষ দিয়ে সার ও বীজ ছিটিয়ে দিয়ে মই দেয়া হয়।

বীজের পরিমাণ ঃ ৭-১০ কেজি/হেক্টর ।

বপনের সময় ঃ নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ ও সময়কাল
ইউরিয়া	১৭৫	ইউরিয়া সার অর্ধেক ও অন্যান্য সার সমুদয় বপনের আগে জমি তৈরির সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া গাছে ফুল আসার পূর্বে (বপনের ২০-২৫ দিন পর) উপরি প্রয়োগ করতে হয়।
টিএসপি	১২৫	
এমপি	৫০	
জিংক	৮	

রোগ ও পোকামাকড় এর বিবরণ এবং ব্যবস্থাপনা ঃ

সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ ঃ *অলটারনারিয়া ব্রাসিসি* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সরিষা গাছের নীচে বয়স্ক পাতায় এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে এ ছত্রাকের আক্রমণে গাছের পাতা, কান্ড ও ফলে চক্রাকারে কালচে দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ঝলসে যায় এবং সরিষার ফলন খুব কমে যায়।

এ রোগ প্রতিরোধ করতে রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে ভিটাভ্যাক্স-২০০ অথবা ক্যাপ্টান (২-৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক/কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে। এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি বা ডাইমেন এম-৪৫, ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

জাব পোকা ঃ জাব পোকা সরিষার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে। এর পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা পোকা উভয়ই সরিষার পাতা, কান্ড, ফুল ও ফল হতে রস শোষণ করে থাকে এবং এক ধরনের রস নিঃসরণ করে। ফলে তাতে সুটিমোল্ড ছত্রাক জন্মে এবং আক্রান্ত অংশ কালো দেখা যায়। এর সঠিক প্রতিকার না করলে ফলন কমে যায় বা সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট হয়। আগাম (কার্তিক) বীজ বপন করলে জাব পোকার আক্রমণের আশংকা কম থাকে। প্রতি গাছে ৫০ টির বেশি পোকা থাকলে ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায় (টরি-৭)। জমির ৭০-৮০% সরিষার ফল পাকলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন ঃ ৮০০-১০০০ কেজি/হেক্টর।

তিল ফসল চাষের কলাকৌশল

***প্রযুক্তি ঃ* তিল ফসলের চাষ**

জাতের বৈশিষ্ট্য (বারিতিল-৩) ঃ

এ জাতটি ২০০১ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। কান্ড, শাখা ও প্রশাখা লোমষহীন। পাতা গাঢ় সবুজ ও খসখসে। প্রতি গাছে ৩-৫ টি প্রাথমিক শাখা থাকে। শাখাগুলি প্রধান কান্ডের একটু উপরে জন্মায়। ফুলের রং হালকা সোনালি। ফলের সংখ্যা ৬০-৬৫ টি। ফল ৪ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৫০-৬৫টি। বীজের ত্বক গাঢ় লালচে রংয়ের।

চিত্র : বারিতিল-৩

বারিতিল-৪ ঃ

জাতটি ২০০৯ সালে বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড় হয়। গাছের উচ্চতা ৯০-১২০ সেমি। গাছে গুটির সংখ্যা ৮৫-৯০টি। অধিকাংশ গুটিই ৮ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট। বীজের ত্বক গাঢ় লালচে বর্ণের। জাতটি পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ সহিষ্ণু। পটুয়াখালী ও বরগুনার অলবনাক্ত এলাকায় আমন ধান কর্তনের পর তিল ফসল চাষের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা সম্ভব।

চিত্র : বারিতিল-৪

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি তৈরি ঃ বেলে দোআঁশ, দোআঁশ, এটেল দোআঁশ ও পলি এঁটেল। মাঝারি নীচু জমিতে ভাল হয়। সাধারণভাবে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে তিল বপন করা যায়।

জমি তৈরি ঃ প্রচলিত চাষ।

বপন পদ্ধতি ঃ সারিতে বপন (৩০ সেমি × ৫ সেমি) অথবা আর্দ্রতা থাকলে ছিটিয়ে বন করতে হবে।

বীজের হার ঃ ৭-৮ কেজি/হেক্টর। প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম হারে ভিটাভেক্স ২০০ দ্বারা শোধন করতে হবে।

বপন সময় ঃ মধ্য জানুয়ারী -ফেব্রুয়ারী।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ ও সময়কাল
ইউরিয়া	১০০-১২৫	সমুদয় সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	১৩০-১৫০	
এমপি	৪০-৫০	
জিপসাম	১০০-১১০	
জিংক সালফেট	৫	
বরিক এসিড	৮-১০	
গোবর	৭-৮ টন	

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ ১ বার (৩০-৩৫ দিন বয়সে নিড়ানি)।

সেচ প্রদান ঃ সম্ভব হলে চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর একটি সেচ দিতে হবে।

সময়কাল ঃ ৯০-১০০ দিন।

ফসল কর্তন ও সংরক্ষণঃ মে মাসে ফসল কর্তন করা যায়। গাছসহ কেটে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করতে হবে। ভাল করে শুকিয়ে ৮-১০% পানি থাকলে সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলন ঃ ১.০-১.২ টন/হেক্টর।

ডাল

ডাল ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ মুগ ডালের চাষ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারিমুগ-৬ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাতটি ২০০৩ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি। একই সময়ে প্রায় সব গুটি পরিপক্ক হয়। পাতা ও বীজের রং গাঢ় সবুজ এবং পাতা চওড়া। হাজার দানার ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। জীবনকাল ৫৫-৫৮ দিন। নোয়াখালী, ফেনী, পটুয়াখালী ও বরগুনা, সাতক্ষীরা।

চিত্র : বারিমুগ-৬

প্রধান বৈশিস্ট্য সমূহ ঃ লবণাক্ত এলাকার আমন ধান কর্তনের পর মধ্য-ডিসেম্বরের মধ্যে মুগ ডাল চাষ করে খরা/লবণাক্ততা এড়ানো যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

মাটি ঃ বেলে দোআঁশ, দোআঁশ, এটেল দোআঁশ ও পলি এঁটেল মাটি।

জাত ঃ বারিমুগ ৬ ও বিওএম-০১

জমি তৈরি ঃ ৩-৪ টি চাষ ও প্রয়োজনীয় মই দিয়ে ভালভাবে তৈরি করতে হবে।

বপন পদ্ধতি ঃ সারিতে বপন (৩০ সেমি × ১০ সেমি) অথবা ছিটিয়ে বোনা যায়।

বীজ শোধন ঃ প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম হারে ভিটাভেক্স ২০০ দ্বারা শোধন করতে হবে।

বীজের হার ঃ ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর (সারিতে), ৩০-৩৫ কেজি (বোনা)।

বপন সময় ঃ ডিসেম্বরের ১ম থেকে ৩য় সপ্তাহ (লবণাক্ত) ।

আগাছা দমন ঃ চারার ২০ দিন ও ৩০ দিন বয়সে ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	৪০-৫০	শেষ চাষের সময় সমুদয় সার প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	৮০-৯০	
এমপি	৫০	
বোরন	৮-১০	

সেচ প্রদান ঃ সম্ভব হলে চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর একটি সেচ দিতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ পাতায় দাগ রোগ হলে ব্যাভিষ্টিন (০.২%) নামক ছত্রাকনাশক ১২-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার সকালে-বিকালে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ।

সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ঃ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করতে হবে।

ফলন ঃ ১.২-১.৪ টন/হেক্টর

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বিনামুগ-৫ (গ্রীষ্মকালীন জাত) ঃ গামা-রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবিত ছোট আকারের বীজ বিশিষ্ট মিউট্যান্ট লাইন, MB-৫৫(৪) এবং AVRDC, তাইওয়ান থেকে আনা একটি জার্মপ্লাজম লাইন, VC-১৫৬০D এর মধ্যে সংকরায়ণ করে পরবর্তী বৎসরগুলিতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিনামুগ-৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এই জাতটি ১৯৯৮ সনে নিবন্ধন করা হয়।

চিত্র : বিনামুগ-৫

বিনামুগ-৬ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

তাইওয়ান থেকে আনা ছোট আকার বিশিষ্ট বীজে ১৯৯৬ সালে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে চাষ উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিনামুগ-৬ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এই জাতটি ২০০৫ সালে নিবন্ধন করা হয়।

চিত্র : বিনামুগ-৬

বিনামুগ-৭ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

বিনামুগ-২ এর বীজে রাসায়নিক মিউটাজেন, ইথাইল মিথেন সালফোনেট (ইএমএস) দ্রবণ প্রয়োগ করে মিউটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে মিউট্যান্ট E_4I-901 উদ্ভাবন করা হয়, যা ২০০৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামুগ-৭ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

চিত্র : বিনামুগ-৭

বিনামুগ-৮ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

এমবি-১৪৯, আলো নিরপেক্ষ উচ্চ ফলনশীল ও মধ্যম আকারের হলুদ বীজ সম্পন্ন লাইনে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছর গুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমবিএম-০৭ মিউট্যান্টটি উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টটি উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাত হিসেবে খরিফ-১ মৌসুমে দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামুগ-৮ নামে ২০১০ সালে নিবন্ধন করা হয়।

চিত্র : বিনামুগ-৮

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহে ঃ

বৈশিষ্ট্য	*বিনামুগ-৫*	*বিনামুগ-৬*	*বিনামুগ-৭*	*বিনামুগ-৮*
পরিপক্ক	সমস্ত ফল প্রায় একত্রে পাকে।	সমস্ত ফল প্রায় একত্রে পাকে।	সমস্ত ফল প্রায় একত্রে পাকে।	সমস্ত ফল প্রায় একই একত্রে পাকে।
জীবনকাল	৭০-৮০ দিন। ফলগুলো গাছের উপরিভাগে থাকে এবং লম্বা যা তুলতে সুবিধা হয়	৬৪-৬৮ দিন।	৭৪-৭৮ দিন	৬৪-৬৭ দিন
বীজের আকার ও রং	বড় এবং রং উজ্জ্বল সবুজ	বড় এবং রং উজ্জ্বল সবুজ।	বীজ গাঢ় সবুজ বর্ণের।	বীজের আকার মাঝারি ও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের।
ফলন (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	১৫০০	১৮০০	১৮০০

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ বৃষ্টি বা অন্য কারণে ক্ষেতে পানি জমে গেলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ জমিতে এই জাতগুলি বপন করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

জমি তৈরি ঃ তিন-চারটি চাষ ও মই দিয়ে সাধারণভাবে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়। ২টি চাষ দেয়ার পর নির্ধারিত পরিমাণ ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি সার ছিটিয়ে পুনরায় চাষ এবং মই দিতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে একটি হালকা সেচ দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বীজ অংকুরোদগমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

বীজের হার ঃ বিনামুগ ৫, ৬, ও ৭ ঃ ২০-২৫ কেজি/হেক্টর এবং বিনামুগ ৮ ঃ ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর

বপনের সময় ঃ ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ)। বরিশাল বিভাগের জেলাসমূহে মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ (জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয়) পযর্ন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হবে।

গাছের দূরত্ব ঃ ছিটিয়ে বপন করা হয়। বপনের পর ভালভাবে মই দিয়ে বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-১০ সেমি । সারিতে বপন করলে ফসল পরিচর্যায় সুবিধা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

জাতের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*					
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা	মলিবডেনাম
বিনা মুগ-৫ বিনা মুগ-৬ বিনা মুগ-৭	৪০-৫০	৮০-১২০	৫০-৭০	৫০-৭০	৩.০-৫.০	০.৫-২.০
বিনা মুগ-৮	১৪-১৬	৩০-৩২	১৪-১৬	২০-২৮	১.৪-২.০	০.২-০.৮
জীবাণু সার (ইউরিয়ার পরিবর্তে) হেক্টর প্রতি ১.৫ কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।						

পদ্ধতি ও সময়কাল ঃ জমির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে সারের মাত্রার তারতম্য করা যেতে পারে। জমি চাষ ছাড়া শুধু ছিটিয়ে বীজ বপন করলে বীজ নষ্ট কম হয় এবং ঝুঁকি কম থাকে। সুতরাং জমির উর্বরতা, জমিতে আবাদকৃত পূর্বের ফসল এবং বৃষ্টিপাতের অবস্থা বিবেচনা করে জমি চাষ দেয়া বা না দেয়া এবং সার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গ্রীষ্মকালীন উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো সাধারণত চাষ দিয়েই বুনতে হবে, না হলে ফলন ভাল হবে না।

আগাছা দমন ঃ চারা গজানোর পরে জমিতে আগাছা দেখা গেলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে হালকাভাবে আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ মুগকলাই চাষাবাদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে জমিতে অত্যধিক রসের অভাব হলে একবার সেচ দেয়া বাঞ্ছনীয়। এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

রোগের বিবরণ এবং ব্যবস্থাপনা ঃ সাধারণত ছত্রাকনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ছত্রাকের মারাত্মক আক্রমণ হলে ডাইথেন এম-৪৫ (প্রতি লিটারে ২ গ্রাম) বা অন্য কোন ছত্রাকনাশক ফসলি জমিতে স্প্রে আকারে প্রয়োগ করলে রোগ দমন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০/প্রোভ্যাক্স/ব্যাভিস্টিন ৫০ WP দ্বারা শোধন করে বপন করলে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়। পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে ডায়াজিনন বা ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি ইত্যাদি কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

কর্তনের সময় ঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি (চৈত্র মাসের শেষ) ফসল উত্তোলন করা হয়।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ বিনা উদ্ভাবিত মুগের জাতগুলির ফল প্রায় একসঙ্গে পাকে এবং একসাথে সংগ্রহ করা সম্ভব। এছাড়া ফসল জমি থেকে কেটে নিলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এরপর ফলগুলো ভালভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত বীজ ৪-৫ দিন টানা রোদে শুকিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে মোটা পলিথিন ব্যাগ, মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা হলে অনেকদিন পর্যন্ত বীজ ভাল থাকে। সংরক্ষিত বীজ অনার্দ্র পরিবেশে ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। সংরক্ষিত বীজ বাতাসের সংস্পর্শে এলে বীজে পোকামাকড়ের আক্রমণ ঘটে, ফলে বীজ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রযুক্তির ঝুকির বিবরণ ঃ আষাঢ় মাসের (মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই) অবিরাম বৃষ্টিতে মুগের ফল পঁচে যায়। এ মুগের জীবনকাল ৬৪-৬৮ দিন বিধায় চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে (মধ্য মার্চ) বীজ বপন সম্পন্ন করতে পারলে আষাঢ় মাসের পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং ফল পঁচনের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়াও অনুমোদিত সময়ের পূর্বে বীজ বপন করলে শীতের কারণে চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগিতা ঃ দেশের দক্ষিনাঞ্চলে মধ্য জানুয়ারী হতে মধ্য ফেব্রুয়ারি (মাঘ মাস) পর্যন্ত এই জাতগুলির বীজ বপন করা হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি (চৈত্র মাসের শেষ) উত্তোলন করা হয়। এ সময়ে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

প্রযুক্তিঃ ফেলন ও খেসারী চাষ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি ফেলন-১ (কাউপি) ঃ ফেলন সাধারনত ফুল ফোটার সময় ৮-১০ ds/m লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। কৃষকের মাঠের তুলনায় ৩ গুন বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বারি খেসারী-১ ঃ খেসারী যদি রোপা আমন এর সাথে রিলে ফসল হিসেবে চাষ এবং পরিমিত সার ব্যবস্থাপনা ও একবার আগাছা দমন করা হয় তবে ফলন কৃষকের মাঠের তুলনায় প্রায় আড়াই গুন বেশি ফলন পাওয়া যায়।

চিত্র : বারি ফেলন-১

চিত্র : বারি খেসারী-১

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

এলাকা ঃ নোয়াখালী, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, ফেনী ও খুলনার লবনাক্ত এলাকা।

জমির ও মাটির বর্ণনা ঃ মাঝারি নিচু জমি । বেলে দোঁআশ, দোআঁশ, এটেল দোআঁশ ও পলি এটেল।

জমি তৈরি ঃ ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

বপন পদ্ধতি ঃ ফেলন : ৪০ সেমি × ২৬ সেমি, ***খেসারী :*** ছিটিয়ে বপন করা হয়।

বীজের হার ঃ ফেলন : ৪০-৫০ কেজি/হেক্টর, ***খেসারী :*** ৪০-৫০ কেজি/হেক্টর।

বপন সময় ঃ ফেলন : জানুযারীর শেষ সপ্তাহ, ***খেসারী :*** নভেম্বর শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ আমন ধান কাটার এক মাস পূর্বে।

আগাছা দমন ঃ ফেলন : ১ বার চারা গজানোর ২৫-৩০ দিন পর, ***খেসারী :*** ১ বার বীজ গজানোর ৪০ দিন পর

সার ব্যবস্থাপনা ঃ ফেলন : ৩০-৪৫-৩০ কেজি/হে. যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি।

খেসারী : ৩০-৪০-৩০ কেজি/হে. যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি।

বালাইনাশক ঃ ফেলন: সাইপারনেথ্রিন ১০ইসি দুইবার স্প্রে করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ ঃ ফেলন : মে মাসের প্রথম থেকে ২য় সপ্তাহ, ***খেসারী :*** মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ।

ফলন ঃ ফেলন ঃ ১৩৫০-১৪০০ কেজি/হেক্টর এবং ***খেসারী ঃ*** ১১২০-১২০০ কেজি/হেক্টর।

আখ

আখ ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ আখের চাষ

আখ সাধারণভাবে বৈরী পরিবেশ সহনশীল একটি ফসল। বাংলাদেশের সকল পরিবেশ অঞ্চলে আখ চাষ করা যেতে পারে। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে ইশ্বরদী ৩৭, ৩৯, ৪০ ও ৪১ জাতের চাষ অধিকতর লাভজনক।

জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

ঈশ্বরদী - ৩৭

বেশি চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (মিষ্টতা ১৪.৪২%), উন্নত মানের গুড় তৈরির জন্য উপযুক্ত, উচ্চ ফলনশীল (৯৩-১১৮ টন/হেক্টর), বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, লবনাক্ত এলাকার জন্য উপযুক্ত (৪-১৮ ডিএস/মি.), চরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত, অপুষ্পক, আগাম পরিপক্ক ।

চিত্র : ঈশ্বরদী - ৩৭

ঈশ্বরদী - ৩৯

উন্নত মানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত, বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (মিষ্টতা ১৪.২৩%), উচ্চ ফলনশীল (৭২-১৪০ টন/হেক্টর), খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু ক্ষমতা খুব বেশি, লবনাক্ততা সহিষ্ণু (৪-১৮ ডিএস/মি.), চরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত, লালপচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন , আগাম পরিপক্ক ।

চিত্র : ঈশ্বরদী - ৩৯

ঈশ্বরদী - ৪০

জাতটি বেশি চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (মিষ্টতা ১৪.৮৬%), উন্নত মানের গুড় তৈরির জন্য উপযুক্ত, উচ্চ ফলনশীল (৭১-১৫০ টন/হেক্টর), খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু (৪-১৮ ডিএস/মি.), ক্ষমতা খুব বেশি, চরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত, লালপচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন , আগাম পরিপক্ক ।

চিত্র : ঈশ্বরদী - ৪০

ঈশ্বরদী - ৪১

চিবিয়ে খাওয়ার জন্য খুবই উপযুক্ত, উন্নত মানের গুড় তৈরির উপযুক্ত, রসের জন্যও উপযুক্ত, মধ্যম চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (মিষ্টতা ১২.১০%), উচ্চ ফলনশীল (১০৮-১৫৯ টন/হেক্টর), খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু (৪-১৮ ডিএস/মি.), ক্ষমতা খুব বেশি, লাল পঁচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন, মধ্যম পরিপক্ক ।

চিত্র : ঈশ্বরদী - ৪১

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উঁচু, মাঝারী উঁচু ও মাঝারী নীচু জমি। পলি দো-আঁশ এবং এঁটেল দো-আঁশ (পিএইচ ৬-৮) এবং লবণাক্ততার মাত্রা ৪-১৮ ডিএস/মি. ।

জমি তৈরির প্রস্তুত প্রণালী ঃ আড়াআড়িভাবে ৪/৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ৮-৯ ইঞ্চি গভীর করে জমি তৈরি করতে হবে।

বীজের হার ঃ ৭.৫০-৮.০০ টন/হেক্টর

রোপণ সময় ঃ নভেম্বর মাস

গাছের দূরত্ব ঃ সারি থেকে সারির দুরত্ব ১ মিঃ । প্রচলিত পদ্ধতি (দুই চোখ বিশিষ্ট বীজখন্ড মাথায় মাথায় স্থাপন ।

সার ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিচর্যা

সারের নাম	***সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)***	***প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি***
ইউরিয়া	৩০৪	জিপসাম ও জিংক সালফেট জমি তৈরির সময়, সম্পূর্ণ টিএসপি, ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং ১/৩ অংশ এমওপি বীজ খন্ড লাগানোর সময় নালায় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং এমওপি সার সমানভাবে ভাগ করে দুই কিস্তিতে কুশি বের হওয়ার শুরুতে এবং শেষে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৮২	
এমপি	১৩০	
জিপসাম	১৯৪	
দস্তা (জিংক সালফেট)	১০	

আগাছা/মালচিং এর সংখ্যা ঃ ভারী বৃষ্টি পাত হলে জো আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাটি আলগা করে ক্ষেতের আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। কুশি উৎপাদন সময়ে এ বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

সেচের সংখ্যা এবং সময়কাল ঃ ৩ টি (অঙ্কুরোদগম পর্যায়ে, কুশি উৎপাদন পর্যায়ে এবং কুশির বৃদ্ধি পর্যায়ে)।

রোগের বিবরণ এবং ব্যবস্থাপনা ঃ কোন রোগ দেখা যায় না।

কর্তনের সময়কাল ঃ ডিসেম্বর- জানুয়ারী

ফলন ঃ ৯৭-১০৮ টন/হেক্টর (আখ), ৪.০ টন/হেক্টর (গুড়)

প্রযুক্তি ঃ বসতবাড়ির আঙ্গিনায় চিবিয়ে খাওয়ার ইক্ষু চাষ

প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমুহ ঃ

ক. বসতবাড়িতে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ।

খ. বসতবাড়িতে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধি।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ বসত বাড়িতে উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি, পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত জমি বসত বাড়িতে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জন্য মাটি দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ হতে হবে।

জমি তৈরি ঃ ইক্ষু একটি দীর্ঘমেয়াদী, লম্বা ও ঘন শিকড় বিশিষ্ট ফসল। সেজন্য ইক্ষুর মাদা গভীর করে তৈরি করতে হবে যেন শিকড়গুচ্ছ সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে অবাধে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদন সংগ্রহ করতে পারে।

অনুমোদিত জাত ঃ

(১) অনুমোদিত জাত ঃ অমৃত (ঈশ্বরদী-৪১)

(২) স্থানীয় জাত ঃ বনপাড়া গ্যান্ডারী ও রংবিলাশ।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ জমিতে কোন নালা না করে ১ মিটার দুরে দুরে ৩০ সে ব্যাসের ৩০ সেমি গভীর মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রোপণ করতে হবে।

বীজের হার ঃ চারা/ডগা পরিমান মত ।

রোপন ঃ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর ।

গাছের দূরত ঃ সারি থেকে সারির দুরত্ব ১.০ মিটার ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (গ্রাম) প্রতি মাদার জন্য	প্রয়োগ সময় ও পদ্ধতি
ইউরিয়া	২০	টিএসপি, জিপসাম, দস্তা এবং অর্ধেক এমপি ও এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার একত্রে মিশিয়ে মাদায় বা গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার চারা রোপণের ৬০-৭৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং ১/২ অংশ ইউরিয়া এবং ১/২ অংশ এমপি সার রোপণের ১২০ দিন পরে মাদায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১৫	
এমপি	১৫	
জিপসাম	১০	
দস্তা	৬	
গোবর	১০০	
খৈল	৮০	

আগাছা দমন ঃ আখ লাগানোর ৯০ দিন পর্যন্ত ।

সেচ প্রদান ঃ প্রয়োজনমত ।

আখের রোগের বিবরণ এবং ব্যবস্থাপনা ঃ বসতবাড়িতে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে আখে লাল পচা, উইল্ট, কালো শীষ, বীজ পচা, ডগা পচা ইত্যাদি রোগ দেখা যায় সেক্ষেত্রে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

কর্তনের সময়কাল ঃ অক্টোবর থেকে নভেম্বর ।

ফলন (চিবিয়ে খাওয়া আখের সংখ্যা) ঃ ৯-১২ টি (প্রতি ঝাড়ে) । ২০-২৫ কেজি (প্রতি ঝাড়ে) ।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ চিবিয়ে ও রস খাওয়ার জন্য উৎপাদন ।

মোট খরচ ঃ টাকা ৫০.০০ (মাদা / ঝাড়প্রতি) ।

মোট আয় ঃ টাকা ২০০ .০০ (মাদা / ঝাড়প্রতি) ।

আয় ও খরচের অনুপাতঃ ৪.১ঃ১.০০

প্রযুক্তি ঃ গোলপাতা গাছের রস দিয়ে গুড় উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ হাইড্রোজ মুক্ত, তাই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গুড় উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ। উৎপাদন খরচ কম, তাই লাভ বেশি ।

পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, ভোলা, খুলনা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জেলার যে সব অঞ্চলে গঙ্গা জোয়ার প্লাবন ভূমি (এইজেড-১৩) গোলপাতা গাছ জন্মে। এছাড়াও এ প্রযুক্তিটি বাগেরহাটের মোংলা উপজেলায় (মিঠাখালী ইউনিয়ন) বিস্তার ঘটানো হয়েছে। সেখানে গোলপাতা ভালভাবে চাষাবাদ হচ্ছে এবং এ প্রকল্পের আওতায় গুড় উৎপাদন করা হচ্ছে যেখানে আগে শুধু পাতার ব্যবহার হত ।

চিত্র : গোলপাতা গাছের রস

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

গাছ নির্বাচন ঃ

একটি গোলপাতা বাগানের প্রতিটি ঝাড়ে প্রতি বছর ফুল আসে না। সাধারণতঃ এক বছর যে ঝাড়ে ফুল আসে পরের বছর সে ঝাড়ে ফুল আসে না। প্রতিটি ঝাড়ে সাধারণতঃ ১টি বা ২টি ফুল আসে। অগ্রহায়ন মাসের শেষ অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যে সব ঝাড়ে ফুল আসে সে ঝাড়গুলো গুড় তৈরির জন্য নির্বাচন করা হয়।

ফলের বোঁটা ম্যাসেসকরণ ঃ

ফুল আসার এক-দেড় মাস পরে অর্থাৎ ফলটি অর্ধ-পরিপুষ্ট হলে মঞ্জুরীদন্ড বা ফলের বোঁটাটি নিচের দিকে কিছুটা হেলে পড়ে। এ অবস্থায় ফলের উপর ভারী কোন দ্রব্য যেমন কাদা মাটি দিয়ে ফলটিকে আরও নোয়ানো হয়। পরবর্তীতে মঞ্জরীদন্ডটিকে আরও নরম করার জন্য প্রতিদিন ৫-৭ মিনিট পায়ের তালু দিয়ে এদিক-ওদিক নাড়ানো হয়। এ কৌশলটিকে স্থানীয় ভাষায় ল্যাথ্যান্ন্যা বলে। এভাবে ৪-৬ দিন ম্যাসেজ করা হয়।

ফলের বোঁটা কাটা ঃ

ফলবৃন্তে রস নেমেছে কিনা দেখার জন্য ফলবৃন্তের গোড়ায় ধারাল দা দিয়ে সামান্য ক্ষত করে দেখা হয় রস পড়ছে কিনা। যদি রস পড়তে দেখা যায় তাহলে ফল বোঁটার যেখানে ধরে ঠিক সেখানে তেরছা ভাবে কাটা হয়। কাটার আগে দন্ডটিকে দড়ি অথবা শুকনো পত্র বৃন্তের ছাল গোড়ায় দিয়ে এমন ভাবে বাঁধা হয় যেন দন্ডটি ফলগুচ্ছ কেটে নেবার পরও একই ভাবে নিচের দিকে নুয়ে থাকে। এই কাটা অংশ শুকানোর জন্য ২-৩ দিন অপেক্ষা করতে হয়। এরপর রস পড়া আরম্ভ হয়।

হাঁড়ি লাগানো ঃ

গোলপাতার রস প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দু'বার সংগ্রহ করা হয়। সকালের রস গুনে ও মানে সন্ধ্যার রসের চেয়ে ভাল হয়। একটি দন্ডে একটি হাঁড়ি দিয়ে রস সংগ্রহ করা হয়।

রস সংগ্রহ ঃ

রস সংগ্রহ করে মাটির বা সিলভারের কলসিতে বাগান থেকে রস গুড় বানানোর জায়গায় আনা হয়। প্রতি গাছ থেকে একবার ২৫০-৬৫০ মিলি লিটার রস পাওয়া যায়।

রস ছাঁকা ও জ্বাল দেয়া ঃ

বাগান থেকে সংগৃহীত রস যথাসম্ভব দ্রুত চুলার নিকট এনে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে কড়াইতে ঢালতে হয়। ৪ ও ২´ × ৬´ মাপের কড়াইতে ১০০-১২৫ লিটার রস জ্বাল দেয়া। কড়াইয়ের আকার অনুযায়ী চুলা বানাতে হয়। গোলপাতার শুকনা পাতা/ডাল সাধারণতঃ জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। গোলপাতার রস প্রথমে বর্ণহীন বা সাদা থাকে যা জ্বাল দেবার পর বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে।

ঘন রস ঘুঁটা ঃ

গোলপাতার রস জ্বাল দেবার পর যখন ঘন হয়ে যায় তখন মিষ্টি গন্ধ ছাড়াতে থাকে। এ অবস্থায় রস নামিয়ে বড় চুলা থেকে নামিয়ে মাটির পাত্রে নিয়ে শক্ত লাঠি দিয়ে অনবরত নাড়া হয়। নাড়তে নাড়তে যখন ঘন রসের মধ্যে দানার মত দেখা যায় তখন নাড়া বন্ধ করা হয় এবং পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।

গুড় পাত্রে ঢালা ঃ

দানাযুক্ত ঘন রস প্লাস্টিকের কৌটা, বালতি বা মাটির হাঁড়িতে ঢালা হয়। বেশি দিন সংরক্ষণের জন্য পাত্রের মুখ বায়ুরোধী করে আটকানো হয়।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ গুড় উৎপাদন।

পাট

পাট ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ পাট চাষ

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ সিভিএল - ১

এ জাতটির পাতা আকর্ষনীয় সবুজ, চওড়া ও ডিম্ব-বর্শা ফলকাকৃতি ।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ নীচু থেকে মাঝারী উচু জমি । দো-আশঁ ও বেলে দো-আশঁ । নীচু থেকে মাঝারী উচু জমি এবং দক্ষিণাঞ্চল সহ উপকুলীয় লোনা পানির জন্য এ জাত উপযোগী ।

জমি তৈরি ঃ আড়াআড়ি ৩-৫ বার চাষ এবং ২-৩ বার মই দিয়ে জমির মাটি মিহি করা প্রয়োজন ।

বীজের হার ঃ ৭-৮ কেজি/হেক্টর ।

বপনের সময় ঃ ৩০শে মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিল ।

গাছের দুরত্ব ঃ সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সেমি । গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৫-৭ সেমি ।

চিত্র : সিভিএল - ১

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

জৈব সারের পরিমাণ ঃ ৫ টন /হেক্টর ।

গোবর সার বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে । প্রয়োগকৃত সার চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে । ইউরিয়া ১৬৬ কেজি, টিএসপি-২৫ কেজি, এমওপি- ৩০ কেজি এবং জিপসাম- ৪৫ কেজি/হেক্টর । বীজ বপনের দিন অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার পূর্ণ মাত্রার বাকী সার প্রয়োগ করতে হবে । গাছের বয়স ৪৫ দিন হলে বাকী অর্ধেক ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে । জমিতে গোবর সার ব্যবহার করলে, প্রতি টন গোবর সারের জন্য ১১ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি এবং ১০ কেজি এমওপি হেক্টর প্রতি কম দিতে হবে ।

পরিচর্যা ঃ চারা গজানোর পর প্রয়োজন অনুসারে নিড়ানী ও গাছ পাতালা করে দিতে হবে ।

রোগ বালাই ও ব্যবস্থপনা ঃ পাতার মোজাইক রোগ । প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত । জমিতে আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তা তুলে ফেলা উচিত । পাটের জমিতে ডায়জিনন বা সুৎমিথ্রিন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৫ মিলি পরিমান ঔষধ মিশ্রন তৈরি করে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার ছিটানো উচিত ।

কর্তনের সময়কাল ঃ বপনের ১২০ দিন পর কর্তন করা যায় ।

ফলন ঃ ৫.১৬ টন/হেক্টর ।

প্রযুক্তি ঃ কেনাফ চাষ

দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকুলীয় লোনা ও চর অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা সম্ভব।

জাতের বৈশিষ্ট্য (এইচ সি ৯৫) ঃ এ জাতের কান্ড ও পাতা গাঢ় সবুজ। পাতা করতলাকৃতি (৫-৭ টি চওড়া খন্ডে খন্ডিত)। কান্ডের গায়ে খুব কম কাটা বা কন্টক রয়েছে। পুষ্প হালকা ঘিয়ে রঙের পাঁপড়ি নিয়ে গঠিত।

চিত্র : এইচ সি ৯৫

জমির ধরন ও জমি তৈরি ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোনা ও চরাঞ্চলের জন্য এ জাত উপযোগী। যে সকল অনাবাদী অনুর্বর জমি পাট বপনের উপযোগী নয় সেখানে এ জাত বপন করে ভাল ফলন পাওয়া যায়। পাটের চেয়ে এ জাতের বীজ বেশ বড় হওয়ায় জমি চাষ করনের সময় তত মিহি না করলেও চলে, তবে এর শিকড় মাটির বেশ গভীর থেকেও রস সংগ্রহ করে বলে জমি গভীর করে চাষ দেয়া ভাল।

বীজের হার ঃ ১০-১১ কেজি/হেক্টর।

বপনের সময় ঃ ১৫ই মার্চ-১৫ই এপ্রিল।

গাছের দূরত্ব ঃ সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৫-৭ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

জৈব সারের পরিমান ঃ গোবর ৫ টন/হেক্টর।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ গোবর সার বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগকৃত সার চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

রাসায়নিক সারের পরিমান ও পদ্ধতি ঃ ইউরিয়া প্রতি হেক্টর ৭৭ কেজি। শেষ চাষের সময় ১১ কেজি ইউরিয়া এবং বীজ বপনের ৪৫ দিন পর ৬৬ কেজি ইউরিয়া হেক্টরপ্রতি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে জৈব সার ব্যবহার না করলে ইউরিয়া ১৩২ কেজি, টিএসপি ২৫ কেজি এবং এমওপি ৪০ কেজি দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ চারা গজানোর পর প্রয়োজন অনুসারে নিড়ানী ও গাছ পাতলা করে দিতে হবে।

রোগের বিবরন এবং ব্যবস্থপনা ঃ পাতার হলদে সবুজ ছিট পরা বা পাতার মোজাইক রোগ। জমিতে আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তা তুলে ফেলা উচিত। হেয়জিনন বা হেমিথ্রিন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৫ মিলি পরিমান ঔষধ মিশ্রন তৈরি করে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার ছিটানো উচিত। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

কর্তনের সময় ঃ বপনের ১২০ দিন পর কর্তন করা যায়।

ফলন ঃ ৫.৪৫ টন/হেক্টর।

তুলা

তুলা ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ তুলা চাষ

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ লবণাক্ত এলাকায় তুলার চাষ করা যায় খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে তুলার চাষ করা যায় এবং লবণাক্ততার মাত্রার (EC 11 ds/m) জমিতেও চাষ করা যায়। তুলার লবনাক্ততা সহনশীলতা বেশি হওয়ায় লবনাক্ত এলাকায় সম্প্রসারণের সুযোগ বেশি।

অনুমোদিত জাত ঃ

হাইব্রিড তুলা রুপালী-১, ডিএম-২ এবং স্থানীয় সিবি-১২।

চিত্র : হাইব্রিড তুলা রূপালী-১

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ মাঝারি উঁচু জমি। এটেল দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি।

জমি তৈরি ঃ জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি আলগা ও ঝুরঝুরে করে সমতল করতে হবে।

বীজের হার ঃ হাইব্রিড - ৫.৫ কেজি/হেক্টর এবং স্থানীয় জাত-১২ কেজি/হেক্টর।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ পলি ব্যাগে চারা তৈরি ও ১৫ সেমি উচু বেডে বীজ বপন এবং জমিতে সরাসরি বীজ সারিতে বপন।

বপনের সময় ঃ খরিফ-১ঃ ডিসেম্বর/জানুয়ারি, খরিফ-২ঃ জুলাই।

সারি থেকে সারির দূরত্ব ঃ ৯০ সেমি × ৪৫ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ইউরিয়া	২০০	***সারের পদ্ধতিঃ*** পঁচা গোবর, খৈল, জিপসাম জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ***টিএসপিঃ*** বীজ বপনের ২১ ও ৪২ দিন পর ২ কিস্তিতে গাছের সারির পার্শে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ***ইউরিয়া ও এমওপি ঃ*** বীজ বপনের ২১, ৪২ ও ৬১ দিন পর ৩ কিস্তিতে গাছের সারির পার্শে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ***বোরণ ও দস্তা ঃ*** বীজ বপনের ৪২ দিন পর গাছের সারির পার্শে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	২০০	
এমপি	২০০	
জিপসাম	১০০	
জিংক সালফেট	১০০	
বোরন	১০	
পঁচা গোবর	১৫০০	
খৈল	১২৫	

পরিচর্যা ঃ গ্যাপ ফিলিং, গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া, বোল ওয়ার্ম ও আঁচা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দমনের জন্য ২ বার নিড়ানি এবং ১ বার মালচিং করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

কর্তনের সময় ঃ

খরিফ-১ ঃ মে-জুন মাস (৩ কিস্তিতে তুলা উঠানো হয়)।

খরিফ–২ ঃ ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস (৩ কিস্তিতে তুলা উঠানো হয়)।

ফলন ঃ ২.০-২.৫ টন / হেক্টর।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ শুকানো, ঝাড়াই বাছাই ও ১০-১২% আর্দ্রতায় ছালা বা কাপড়ের ব্যাগে সংরক্ষণ।

ফল

ফল ফসলের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ আম চাষ

প্রযুক্তি ঃ বাংলাদেশে আমের অসংখ্য জাত রয়েছে। এগুলোতে উচ্চ মাত্রার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পাকার সময় অনুসারে আমের জাতসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা ১. আশু/আগাম (মধ্য মে হতে মধ্য জুন বা জ্যৈষ্ঠ মাস), ২. মধ্য/মাঝ মৌসুমী (মধ্য জুন হতে জুন মাসের শেষ বা আষাঢ় মাসের প্রথমার্ধ) এবং ৩. নাবী জাতসমূহ (জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট বা আষাঢ় মাসের শেষার্ধ হতে শ্রাবণ মাস)। বাংলাদেশে অনেক জাতের আম গাছ থাকলেও গুনগত মান সম্পন্ন এবং বাণিজ্যিক জাতসমূহের সংখ্যা সীমিত। বাণিজ্যিক জাতগুলোর মধ্যে ল্যাংড়া, ফজলী, গোপালভোগ, খিরসাপাত, আশ্বিনা, হিমসাগর, সূর্যপুরী, হাড়িভাঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত জাতের আম গাছে প্রতি বছর আম ধরে না। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আমের দশটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বারি আম-৩, বারি আম-৪, বারি আম-৫ ও বারি আম-৮ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলে চাষের ব্যাপক সম্ভাবণা রয়েছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ উদ্ভাবিত জাতগুলোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ।

বারি আম-৩ ঃ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং মধ্য আষাঢ়ে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে, গড় ওজন ১৮০ গ্রাম। পাকা ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন, রসালো, খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭১%। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড) ঃ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং আষাঢ় মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও লাল আভাসহ সবুজ বর্ণের। পাকা ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন, রসালো, খেতে খুব মিষ্টি (২৪% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন।

বারি আম-৫ঃ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (১৯% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি আম-৮ (বহুভ্রূণী) ঃ প্রতি বছর ফলদানকারী রঙিন উচ্চ ফলনশীল নাবীজাত জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং মধ্য আষাঢ়ে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে, উজ্জল হলুদ বর্ণের, ফলের গড় ওজন ২৭০ গ্রাম। পাকা ফলের শাঁস উজ্জ্বল হলদে, রসালো, আঁশহীন, খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। ফলের সংরক্ষণকাল তুলনামূলকভাবে বেশি। দেশের সব এলাকায় এমনকি ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও চাষোপযোগী। এ জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

চিত্র : বারি আম-৩

চিত্র : বারি আম-৪ (হাইব্রিড)

চিত্র : বারি আম-৫

চিত্র : বারি আম-৬ (বহুভ্রুণী)

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ আম প্রধানত গ্রীষ্ম মন্ডলের ফল। তবে এর বাণিজ্যিক চাষ অবগ্রীষ্ম মন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৪০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে আম গাছ জন্মে। আমের জন্য বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২০-৩০°সে. সবচেয়ে উপযোগী। যে কোন ধরনের মাটিতেই আমের চাষ করা গেলেও গভীর, সুনিস্কাশিত, উর্বর দোঁ-আশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। আমের জন্য মাটির অম্লতা ৫.৫-৭.৫ সর্বোত্তম।

জমি প্রস্তুত প্রণালী ঃ বর্ষার পানি দাঁড়ায় না এবং সারাদিন সূর্যের আলো পড়ে এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। পাহাড়ী এলাকায় জমির ঢাল ৪৫ ডিগ্রীর কম হতে হবে। সমতল ভূমিতে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে টেরেস তৈরি করে চারা/কলম রোপণ করা হলে ভূমি ক্ষয় কম হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ১০০-১৫০ টি।

রোপন ও পরিচর্যা ঃ জ্যৈষ্ঠ -আষাঢ মাস গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো যায় তবে অতিরিক্ত বর্ষায় গাছ না লাগানোই ভাল। ৮ মি. × ৮ মি. থেকে ১০ মি. × ১০ মি.। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উল্লেখিত দুরত্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের মাটির সাথে ২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ৩০০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বরিক এসিড ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে পানি দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	*গাছের বয়স (বছর)*						*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
	১-৪	*৫-৭*	*৮-১০*	*১১-১৫*	*১৬-২০*	*২০ এর উর্দ্ধে*	
গোবর (কেজি)	১৫	২০	২৫	৩০	৪০	৫০	সার ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেই চলবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০	
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০	
এমওপি(গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৪০০	৫০০	৮০০	
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০	
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫	
বরিক এসিড (গ্রাম)	২০	২০	৩০	৩০	৪০	৫০	

পরিচর্যা ঃ আম গাছে বিভিন্ন ধরনের পরগাছা হতে দেখা যায়। এসব পরগাছা খাদ্য-রস শোষণ করে আম গাছের মারাত্বক ক্ষতি করে থাকে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়। এগুলো দেখামাত্র দমন এর ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের গোড়া সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছে

মুকুল বের হবার ৩ মাস আগে থেকে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে ১ বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আর এক বার পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

পোকা মাকড় ও দমন ব্যবস্থা ঃ

আমের হপার ঃ ফুল আসার সময় এই পোকাটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এটি গাছের বাকলের কোটরে লুকিয়ে থাকে এবং এর পর সক্রিয় হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ক্ষতিকর হলেও হপার নিম্ফ বেশি মারাত্বক। এরা কচি ডগা ও মুকুল থেকে রস চুষে খায়। এর ফলে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়। এছাড়া নিম্ফগুলো রস চোষার সাথে সাথে আঠালো মধুরস নিঃসরণ করে যা মুকুল ও গাছের পাতায় আটকে গিয়ে মুকুলের পরাগায়ন প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে। এই মধুরসে শুটি মোল্ড জন্মে যা পরে কাল হয়ে যায়। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় এদের প্রকোপ বেশি হয়।

প্রতিকার ঃ আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আরো একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/ সিমবুশ/ ফেনম/বাসাথ্রিন/অন্য নামের) ১০ ইসি অথবা ০.৫ মিলি হারে ডেল্টামেথ্রিন (ডেসিস) ২.৫ ইসি অথবা ফেনভ্যালিরেট (সুমিসাইডিন/মিলফেন/অন্য নামের) ২০ ইসি নামক কীটনাশক মিশিয়ে আম গাছের কান্ড, ডাল, পাতা এবং মুকুল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করে হপার দমন করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুম শেষে বছরে একবার পূর্ণ বয়স্ক আম গাছের অপ্রয়োজনীয় মৃত, অর্ধমৃত ডালপালা ছাঁটাই করে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করলে হপারের প্রাদুর্ভাব প্রায় ৩০-৮০ শতাংশ কমে যায়।

কান্ডের মাজরা পোকা ঃ পোকার লার্ভা কান্ড ছিদ্র করে কান্ড বা শাখা-প্রশাখায় সুরঙ্গ সৃষ্টি করে মজ্জা অংশ খেতে থাকে। এতে আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ মারা যায়, আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং প্রকোপ বেশি হলে সম্পূর্ণ গাছটিই মারা যায়। সুরঙ্গ পথের মুখে পোকার মল দ্বারা সৃষ্ট শক্ত ছোট বল দ্বারা এই পোকার উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়।

প্রতিকার ঃ ছিদ্র দিয়ে সূঁচালো লোহার শিক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে পোকা মারা সম্ভব। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে আক্রমণের সুরঙ্গমুখ পরিস্কার করে তার মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল ভেজানো তুলা ঢুকিয়ে সুরঙ্গ মুখ কাদা বা পুডিং দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী উইভিল পোকা ঃ সাধারণত যমুনার পূর্বাঞ্চলের জেলা গুলোতে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। স্ত্রী পোকা মার্চ-এপ্রিল মাসে কঁচি আমের গায়ে মুখের শুঁড়ের সাহায্যে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি মিলিয়ে যায়। ডিম পাড়ার ৭ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া বের হয় এবং কীড়াগুলো ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকাবাঁকা সুরঙ্গ তৈরি করে খেতে থাকে। বাইরে থেকে ভাল মনে হলেও আক্রান্ত আমের ভিতরেই কীড়াগুলো পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ পোকায় রূপান্তরিত হয় এবং উইভিল ভিতর থেকে আমের খোসা ছিদ্র করে বের হয়ে যায়। একবার কোন গাছে এ পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছটি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্রতিকার ঃ মুকুল আসার পূর্বে পৌষ-মাঘ মাসে সম্পূর্ণ বাগান বা প্রতিটি আম গাছের চারদিকে ৪ মিটারের মধ্যে সকল আগাছা পরিস্কার করে ভালভাবে মাটি কুপিয়ে উল্টে দিলে মাটিতে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়। আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম/ বাসাথ্রিন) ১০ ইসি জাতীয় কীটনাশক মিশিয়ে কাছের কান্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আমের পাতা কাটা উইভিলঃ এ পোকা গাছের নতুন পাতা কেটে মাটিতে ফেলে দেয়। সদ্য রোপণকৃত বা নার্সারীতে সংরক্ষিত চারা গাছ এ পোকার আক্রমণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিকার ঃ মাটি থেকে পোকার ডিমযুক্ত নতুন কাটা পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে এ পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। নার্সারীতে নতুন বের হওয়া পাতাসহ ডগাকে মশারীর নেট দিয়ে ঢেকে দিলে পোকার আক্রমণ কম হয়। গাছে কচি পাতা বের হওয়ার সাথে সাথে কচি পাতায় প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/

সিমবুস/ ফেনম/ বাসাথ্রিন) ১০ ইসি অথবা ১ মিলি হারে ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন/ ফলিথিয়ন/ এগ্রোথিয়ন) ৫০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা ঃ আম পাকার সময় স্ত্রী মাছি পোকা ডিম পাড়ার অঙ্গের সাহায্যে ফলত্বক ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ২-৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া বা ম্যাগট বের হয় এবং ফলের শাঁস খেতে থাকে। আক্রান্ত আম বাইরে থেকে বোঝা যায়না কিন্তু কাটলে আমের ভিতরে অসংখ্য কীড়া দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ পরিপক্ক কিন্তু সবুজ আম গাছ থেকে সংগ্রহ করলে এ পোকার আক্রমণ এড়ানো সম্ভব। পোকাক্রান্ত আমগুলো সংগ্রহপূর্বক মাটিতে গভীর গর্ত করে পূঁতে ফেলতে হবে। বাদামী কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ফল ব্যাগিং করতে হবে। ফল সংগ্রহের অন্তত এক মাস পূর্বে বিষটোপ ফাঁদ হিসেবে ১০০ গ্রাম পাকা আম থেঁতলে এর সাথে ১ গ্রাম সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি বা সেকুফোন ৮০ এসপি বিষ ব্যবহার করতে হবে (বিষটোপ ২-৩ দিন পর পর পরিবর্তন করতে হবে) অথবা ফল সংগ্রহের এক-দেড় মাস পূর্বে মিথাইল ইউজেনলযুক্ত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ এ পোকার কীড়া আমের সরু প্রান্তে বিন্দুর মত ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং প্রথমে শাঁস ও পরে আটি খাওয়া শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় ছিদ্র পথ হতে সাদা ফেনা বের হয় এবং পরবর্তী কালে আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় ও পচন ধরে। আক্রান্ত আম অচিরেই ঝরে পড়ে।

প্রতিকার ঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে ঝরে যাওয়া আক্রান্ত কচি ফল মাটি থেকে সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি হারে ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন/অন্য নামের) ৫০ ইসি মিশিয়ে আমে স্প্রে করলে এ পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব হবে।

মিলিবাগ ঃ মে মাসের দিকে স্ত্রী পোকা গাছের গোড়ায় মাটির ৫-১৫ সেমি গভীরে ডিম পাড়ে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং দলবদ্ধভাবে গাছের উপরের দিকে বেয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করে। এরা কচি ডগা ও মুকূল থেকে রস চুষে খায় ফলে এগুলো শুকিয়ে যায় এবং ফলন মারাত্বকভাবে ব্যহত হয়। এছাড়া রস চোষার সাথে সাথে এরা আঠালো মধুরস নিঃসরণ করে যা ফুল, ফল ও গাছের পাতায় আটকে যায় এবং সেখানে শুটি মোল্ড জন্মে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত পাতা ও ডগা সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডাইমেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (পারফেকথিয়ন/টাফগর/অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার আক্রান্ত গাছে ছিটাতে হবে। মিলিবাগের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলে গাছের গোড়ার চারদিকে গরমের সময় খুঁড়ে দিতে হবে। এরপর ডিসেম্বর মাসে মাটি থেকে ৩০-৪৫ সেমি উপরে গাছের কান্ডে গ্রীজ ও আলকাতরা ১ঃ২ অনুপাতে অথবা রেজিন ও কেস্টর অয়েল ৪ঃ৫ অনুপাতে মিশিয়ে আঠালো বন্ধনী আকারে প্রয়োগ করতে হবে।

আম পাতার গল মাছি ঃ এ পোকার বিভিন্ন প্রজাতির উপর ভিত্তি করে আক্রান্ত পাতায় ধুসর, সবুজ বা বাদামী বর্ণের গোলাকার ও উচুঁ বসন্তের মত গুটি হয়। মার্চ, জুলাই ও অক্টোবর মাসে স্ত্রী পোকা পাতার নীচের দিকে ডিম পাড়ে। এর পর লার্ভা বের হয়ে পাতার ভেতরে টিস্যুতে ঢুকে যায়, এর ফলে পাতা উপরের দিকে ফুলে উঠে। লার্ভাগুলো গল এর ভেতরে থেকে পাতার রস চুষে খায় এবং পাতার কার্যক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে।

প্রতিকার ঃ বর্ষার শেষে আক্রান্ত পাতা বা পাতাসহ আক্রান্ত ছোট ডাল ছাঁটাই করতে হবে। রগর/রক্সিয়ন/এজোড্রিন ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে আমের নতুন পাতায় ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

পাতাখেকো শুঁয়ো পোকা ঃ এ পোকার আক্রমণে গাছ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। শুঁয়ো পোকা পত্রফলক সম্পূর্ণ খেয়ে শুধু মধ্যশিরাটি বা পার্শ্বশিরাগুলো রাখে। আক্রান্ত গাছে অসময়ে নতুন বিটপ বের হয় ফলে গাছে ফুল আসে না।

প্রতিকার ঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত শুঁয়ো পোকা কীটনাশক প্রয়োগে মারা খুব কঠিন বিধায় আম গাছে শুঁয়ো পোকার ছোট ছোট কীড়া দেখা দেয়া মাত্র সেগুলো পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ২মিলি হারে

ডাইমেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (রগর/রক্সিয়ন/টাফগার ৪০ ইসি বা অন্য নামের) মিশিয়ে স্প্রে করলে এ পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব।

রোগবালাই ও প্রতিকার

এ্যানথ্রাকনোজ ঃ ছত্রাকজনিত এই রোগের বিস্তৃতি প্রধানত আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল এলাকাতে পরিলক্ষিত হয়। পাতা, কচি কান্ড, মুকুল ও ফল সব ক্ষেত্রেই এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত অংশ প্রথমে ধূসর বাদামী এবং পরে কালচে রং ধারণ করে। আক্রান্ত কচি ডাল আগা থেকে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে মরে যায়। মুকুল ঝরে পড়ে, কচি ফল ঝরে পড়ে এবং পরিপক্ক ফল পচে যায়।

প্রতিকার ঃ যেহেতু এই ছত্রাকটি গাছের মরা ডালপালায় বেঁচে থাকে, তাই যত দ্রুত সম্ভব আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে বর্দোপেস্ট (প্রতি লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন) লাগাতে হবে। গাছের নীচে পড়া মরা পাতা কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম-৪৫ মিশিয়ে সমস্ত মুকুল ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এক মাস পর আমের আকার মটর দানার মত হলে আরেকবার গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ৫৫° সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে কার্যকরভাবে এই রোগ কম হয়।

পাউডারী মিলডিউ ঃ এ রোগের আক্রমণে আমের পাতা, পুষ্প মঞ্জুরী ও শাখা-প্রশাখার উপর সাদা গুঁড়ার মত ছত্রাকের স্পোর বা বীজকনা দেখা যায়। এর ফলে ফুল ও গুটি শুকিয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্প মঞ্জুরীর বৃদ্ধি ও গুটি বাঁধার সময় মেঘলা দিন ও উচ্চ আর্দ্রতার সাথে যদি রাতে নিম্ন তাপমাত্রা থাকে তবে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

প্রতিকার ঃ প্রতি লিটার পানিতে থিওভিট ২ গ্রাম অথবা ব্যাভিস্টিন ১ গ্রাম বা বেনলেট ১ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছে মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বে ১ম বার স্প্রে করতে হবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে আরো ২টি স্প্রে ১৫ দিন অন্তর ফুল সম্পূর্ণ ফোটার পর এবং গুটি বাধার পর দিতে হবে।

গুটি মোল্ড (Sooty mould) ঃ নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। আমের শোষক পোকা যেমন- হপার ও মিলিবাগ গাছের পাতা, মুকুল, কচি ডালে যেখানে মধুরস নিঃসরণ করে সেখানে এই ছত্রাক কাল আবরণ তৈরির মাধ্যমে বিস্তার ঘটায়। আক্রান্ত পাতায় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রতিকারঃ আমের শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে (বর্ণিত নিয়মে)। ০.২% ভেজানোপযোগী সালফার বা ০.২% থিওভিট স্প্রে করতে হবে। আগাছা, রোগাক্রান্ত অংশ ধ্বংস করতে হবে।

আগা-মরা /ডাইব্যাক ঃ এ রোগের আক্রমণে গাছের কচি ডাল আগা থেকে শুকিয়ে মরে যেতে থাকে, গাছের আম ঝরে পড়ে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ডগা কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে বর্দোপেষ্ট (১০%) এর প্রলেপ দিতে হবে। বর্দো মিশ্রন (১%) অথবা ইন্ডোফিল-এম ৪৫ ২ গ্রাম/লিঃ হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

আমের বোঁটা পচা রোগ ঃ সাধারণত পরিপক্ক আমের ক্ষেত্রে এই রোগ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বোঁটার দিক থেকে পচন শুরু হয়। *Lasiodiplodia natalensis* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

প্রতিকার ঃ পরিস্কার শুষ্ক দিনে বোঁটা সহ ফল সংগ্রহ করতে হবে। খবরের কাগজ বা খড় বিছিয়ে বোঁটা নীচের দিকে করে আম রাখতে হবে যাতে কষ আমের গায়ে না লাগে। আম সংগ্রহ, পরিবহন ও সংরক্ষণের সময় যেন কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ৪৩° সে. তাপমাত্রায় ৬% বোরাক্স মিশ্রনে ৩ মিনিট আম ডুবিয়ে রাখতে হবে।

শারীরবৃত্তীয় সমস্যা

ব্লাক টিপ ঃ এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে আমের নীচের দিকে ছোট একটা জায়গা বিবর্ণ হয়ে যায়, আস্তে আস্তে তা সম্পূর্ণ আগায় ছড়াতে থাকে এবং কালচে হয়ে যায়। আম বাগানের নিকটবর্তী (১ কি.মি. এর মধ্যে) স্থানে ইটের ভাটা থাকলে চিমনীর নির্গত (কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, এসিটাইল) ধোঁয়ায় এ লক্ষণ সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার ঃ আম বাগান ইটের ভাটা থেকে পূর্ব-পশ্চিমে কমপক্ষে ১.৬ কি.মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ০.৮ কি.মি. দূরে স্থাপন করতে হবে। চিমনীর উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-১৮ মি. হতে হবে। বোরাক্স ০.৬% এবং কস্টিক সোডা ০.৪% ফুল আসার আগে, পরে এবং গুটি বাঁধা পর্যায়ে তিনবার স্প্রে করলে এসিড গ্যাসকে প্রশমিত করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাতা পোড়া ঃ সাধারণত পটাশিয়ামের অভাবে পাতা পোড়া লক্ষণ দেখা য়ায়। এক্ষেত্রে বয়স্ক পাতার আগা এবং কিনারা পুড়ে যায়। লবনাক্ত মাটিতে বা যে মাটিতে সামান্য লোনা পানি বা পটাশিয়ামের উৎস হিসাবে মিউরিয়েট অব পটাশ ব্যবহার করা হয় সে মাটিতে সাধারণত পটাশিয়ামের অভাব দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ পটাশিয়ামের উৎস হিসেবে পটাশিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করতে হবে। তীব্র অবস্থায় নতুন গজানো পাতায় ৪-৫ বার পটাশিয়াম সালফেট (৫%) ১৫ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

স্পঞ্জি টিস্যু ঃ এ ক্ষেত্রে আম পাকার সময় আমের শাঁসের মধ্যে হলদে, অম্লস্বাদযুক্ত স্পঞ্জ এর মত (বায়ুকুঠুরীসহ অথবা ছাড়া) টিস্যু তৈরি হয় যা খাওয়ার অযোগ্য। ফলের বৃদ্ধি বা পাকার সময় বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও পাকা ফল কাটলে দেখা যায়। পুষ্টিগত অসামঞ্জস্যতা, অতিরিক্ত পাকিয়ে ফল সংগ্রহ করা, আম পাড়ার পর রোদে রাখা বা মাটির উর্ধ্বমূখী তাপমাত্রার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও এ সমস্যা হয়।

প্রতিকার ঃ মাটির তাপমাত্রা কমাতে হবে। পরিষ্কার চাষাবাদের তুলনায় মালচিং এর মাধ্যমে মাটির তাপমাত্রা ২০°সে. পর্যন্ত কমিয়ে রাখা যায়। আমের যে সমস্ত জাতে এগুলো বেশি হয় সে সমস্ত জাত চাষ পরিহার করা।

বিকৃতি* (Malformation) *ঃ বিকৃতি সাধারণত ২ প্রকার। যথাঃ অঙ্গজ এবং মঞ্জুরী বিকৃতি। অঙ্গজ বিকৃতি ছোট চারাগাছে এবং মঞ্জুরী বিকৃতি দেখা যায় ফলন্ত পর্যায়ে। ছত্রাকজনিত (*ফিউজেরিয়াম মনিলিফরমি*) রোগের কারণে এ সমস্যা হয়।

প্রতিকার ঃ গাছের আক্রান্ত অংগ ছাঁটাই করতে হবে। বেনলেট ১ মিলি প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অক্টোবর মাসে ২০০ পিপিএম NAA স্প্রে করতে হবে। রোগমুক্ত গাছ থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে।

ফল ফেটে যাওয়া ঃ ফলের বৃদ্ধিকালে দীর্ঘ শুষ্কতা বা পানির কমতি হলে ফলের ত্বক শক্ত হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ অধিক বৃষ্টি বা পানি পেলে ফলের ভিতরের অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এতে ভেতরের চাপ সহ্য করতে না পেরে খোসা ফেটে যায়।

প্রতিকারঃ ফলের বৃদ্ধি পর্যায়ে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। মালচিং করতে হবে। বর্ষার শেষে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম হারে বরিক এসিড অথবা ১০০ গ্রাম হারে বোরাক্স সার প্রয়োগ করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ কিছু কিছু লক্ষণ দেখে আমের পূর্ণতা প্রাপ্তি শনাক্ত করা যায়। যেমন- ক) আমের উপরের অংশের অর্থাৎ বোঁটার নীচের ত্বক সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে; খ) পরিপক্ক আম পানিতে ডুবালে তা সম্পূর্ণরুপে ডুবে যায়; গ) প্রাকৃতিকভাবে দুএকটা আধপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ হয়; ঘ) আমের বোঁটা থেকে যে আঠা বের হয় তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং একটা স্বচ্ছ বিন্দুর আকারে জমা হয়।

ফলন (টন/হেঃ) ঃ আমের ফলন বয়স ও জাতভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া পরিচর্যা, জলবায়ু, পোকামাকড় প্রভৃতি বিষয়ও এর জন্য দায়ী। সাধারণত গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে ফলন বৃদ্ধি পেলেও ৫০ বছরের পর ফলন কমতে থাকে। কলমের গাছে ৪ বছর বয়সে প্রায় ২০-২৫ টা, ১০ বছর বয়সের গাছে ৪০০-৬০০ টা এবং ২০-৪০ বছর বয়স্ক গাছে ১০০০-৩০০০ টি আম ধরে থাকে।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ ৫০° সেঃ তাপমাত্রায় ৫ মিনিট শোধণ করলে আমের সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি পায়।

পেয়ারা

প্রযুক্তি ঃ পেয়ারা চাষ

প্রযুক্তি ঃ বাংলাদেশে চাষকৃত পেয়ারার জাতের মধ্যে স্বরূপকাঠি, কাঞ্চননগর, মুকুন্দপুরী, এলাহাবাদ ও কাজী পেয়ারা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে ১৯৮৪ সালে "কাজী পেয়ারা", ১৯৯৬ সালে "বারি পেয়ারা-২" ও ২০০৪ সালে "বারি পেয়ারা-৩" নামে তিনটি উন্নত জাত মুক্তায়িত করেছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

কাজী পেয়ারা ঃ উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খর্বাকৃতির, মোটামুটি খাড়া ও মধ্যম ঝোপালো। বছরে দু'বার ফল দেয়। প্রধান মৌসুমে মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল উপবৃত্তাকার, বোটার দিকে সামান্য সরু, গড় ওজন ৪৪৫ গ্রাম। পরিপক্ক ফলের রং হালকা সবুজ। শাঁস সাদা, খেতে কচকচে সামান্য টক ভাবাপন্ন (ব্রিক্সমান ৮%) ও অল্প বীজ সমৃদ্ধ। গাছ প্রতি বছরে ৬০ কেজি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৮ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

বারি পেয়ারা-২ঃ উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খর্বাকৃতির, মধ্যম ছড়ানো ও মধ্যম ঝোপালো। কমবেশী সারা বছর ফল দেয়। প্রধান মৌসুমে মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, গড় ওজন ৪০০ গ্রাম। পরিপক্ক ফলের রং হলুদাভ সবুজ। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১০%) ও কচকচে। বীজ অল্প ও নরম। গাছ প্রতি বছরে ৬৫ কেজি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

বারি পেয়ারা-৩ ঃ উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো ও মধ্যম ঝোপালো। মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল উপবৃত্তাকার, বোটার দিকে সামান্য সরু, মাঝারী (ওজন ১৭৫ গ্রাম)। পরিপক্ক ফলের রং সবুজ। ফলের শাঁস গোলাপী, নরম, অল্প মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৯%)। শাঁসে পেক্টিনের পরিমাণ বেশি থাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উত্তম জাত। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা গেলেও পাহাড়ী এলাকায় বেশি জনপ্রিয়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

চিত্র : বারি পেয়ারা-২

চিত্র : বারি পেয়ারা-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমির ধরণ ঃ পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। তবে বিষুবরেখা থেকে শুরু করে উপ-নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই এর চাষ করা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চতার ভূমিতেও পেয়ারা জন্মে। ২৩° - ২৮°সে. তাপমাত্রা পেয়ারা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তবে পরিণত গাছ ৪৫ ° সে. তাপমাত্রায়ও বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু হিমাঙ্কে গাছ মারা যায়। অনুর্ধ্ব ১৫০ সেমি. বৃষ্টিপাত পেয়ারার জন্য ভাল।

মাটির বর্ণনা ঃ প্রায় সব রকমের মাটিতেই পেয়ারার চাষ করা যায়, তবে জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে পেয়ারা ভাল জন্মে। ৪.৫-৮.২ অম্লক্ষারত্বের মাটিতে এটা সহজে জন্মে।

জমি প্রস্তুত প্রণালী ঃ বর্ষার পানি দাড়ায় না এবং সারাদিন সূর্যের আলো পড়ে এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। পাহাড়ী এলাকায় জমির ঢাল ৪৫ ডিগ্রীর কম হতে হবে। সমতল ভূমিতে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে টেরেস তৈরি করে চারা/কলম রোপণ করা হলে ভূমি ক্ষয় কম হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ৩০০ থেকে ৬২৫ টি।

রোপনের সময় ঃ মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পেয়ারার চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই পেয়ারার চারা/কলম রোপণ করা চলে।

গাছের দূরত্ব ঃ এক বছর বয়সের চারা বা কলম সাধারণত ৪-৬ মিটার দুরে দুরে লাগানো হয়।

পরিচর্যা ঃ চারা লাগাবার জন্য ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত করে সার প্রয়োগ করে মাটির সংগে ভাল করে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। চারা/কলম রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি পুনরায় উলটপালট করে এর ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারাটি লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	***গাছের বয়স***			***সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি***
	১-২ বছর	***৩-৫ বছর***	***৬ বছর বা তদুর্ধ্ব***	সার প্রয়োগের পর ও খরার সময় বিশেষ করে গাছে গুটি আসার সময় পানি সেচ অত্যাবশ্যক। গাছের গোড়া থেকে মাঝে মাঝে আগাছা পরিস্কার করা ও গোড়ার মাটি ভেঙ্গে দেয়া দরকার।
গোবর (কেজি)	১০-১৫	২০-৩০	৪০	
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০	
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০	
এম পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০	

পরিচর্যা ঃ পেয়ারার কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে নিম্নে উল্লেখিত পরিচর্যা করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই ঃ অঙ্গ ছাঁটাই বলতে মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করা বুঝায়। রোপণকৃত চারা বা কলমের সুন্দর কাঠামো দেওয়ার নিমিত্তে মাটি থেকে ১.০-১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫ টি ডাল রেখে গোড়ার দিকের সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল ধরে।

ডাল নুয়ে দেয়া ঃ পেয়ারার খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এজন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল ছাঁটাইকরণ ঃ কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। ফল আকারে বেশ বড় হওয়ায় গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলের ভারে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এমতাবস্থায়, গাছকে দীর্ঘদিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ফল

ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ৫০-৬০% ফল ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ফুল বা ফল ছাঁটাই করে প্রায় সারাবছর কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ জাতের গাছে ফল পাওয়া সম্ভব।

ফল ঢেকে দেওয়া (Fruit bagging) ***ঃ*** পেয়ারা ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করলে রোগ, পোকা, পাখি, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাগিং করা ফল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং আকর্ষণীয় রংয়ের হয়। ব্যাগিং বাদামী কাগজ বা ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে করা যেতে পারে। ব্যাগিং করলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগেনা বিধায় ফলে কোষ বিভাজন বেশি হয় এবং ফল আকারে বড় হয়। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি হারে টিল্ট ২৫০ ইসি মিশিয়ে সমস্ত ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আগাছা দমন ঃ পেয়ারা বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শুরুতে এবং শেষে বাগানে চাষ দিয়ে বা কুদলিয়ে আগাছা দমন করা যায়।

সেচ প্রদান ঃ পেয়ারার চারা রোপণের সময় যদি গর্তের মাটি শুকনো থাকে তাহলে চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে কিছু পানি দিতে হবে। বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় পেয়ারা গাছে বছরে ৮-১০ বার পানি সেচের প্রয়োজন। ফলন্ত গাছে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে বড় আকারের ফল ও বেশি ফলন পাওয়া যাবে। গোড়ায় পানি জমে গেলে ও ঠিকমত নিস্কাশন না হলে গাছ মরে যেতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ এ পোকা পেয়ারা ছোট থাকা অবস্থায় ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ও ফলের ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত ফল অল্পদিনের মধ্যেই ঝরে যায়। পাহাড়ী এলাকায় এ পোকার আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ফল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম প্রোক্লেম ৫এসজি বা ১ মিলি লেবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ফল ছোট অবস্থায় স্প্রে করতে হবে। ফলের মার্বেল অবস্থায় ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগ বা বাদামী কাগজের ঠুঙ্গাদ্বারা ফল ঢেকে দিতে হবে।

সাদা মাছি ঃ সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায়। এরা পাতার রস শুষে গাছকে দুর্বল করে। রস শোষণের সময় পাতায় মধু সদৃশ বিষ্ঠা ত্যাগ করে যার উপর শুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান বা ২ মিলি রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা ঃ ফল পরিপক্ক হতে শুরু করলে স্ত্রী মাছি পোকা ফলের খোসার নীচে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বা ম্যাগট বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে নষ্ট করে ফেলে এবং ফল পঁচে যায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। ফল ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করে ফলের মাছি পোকা দমন করা যায়। এছাড়া মিথাইল ইউজেনলযুক্ত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে এ পাকার আক্রমণ রোধ করা যায়।

চেফার বিটল ঃ এটি বিট্‌ল জাতীয় পোকা। বর্ষা মৌসুমে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। এ পোকা পেয়ারার পাতা ছিদ্র করে খেয়ে ঝাঝরা করে দেয়।

প্রতিকার ঃ সুমিআলফা/সুমিথিয়ন প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে গাছের পাতায় প্রতি ১০ দিন অন্তর দু'বার স্প্রে করতে হবে। এছাড়া গাছের আশে পাশের আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

মিলিবাগ ঃ সাদা সাদা মিলিবাগ কচি বিটপ ও ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত পাতায় ও ডালে তুলার মতো সাদা পদার্থ দেখা যায়। পোকা কর্তৃক নিঃসৃত মধু রসে শুটিমোল্ড জন্মে ও পাতা কাল বর্ণ ধারণ করে।

প্রতিকার ঃ ব্রাশ দ্বারা সাদা বস্তু সরিয়ে রগর/রক্রিয়ন প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। গুড়া সাবান (হুইল/জেট পাউডার) পানিতে (৫ গ্রাম/লি.) মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।

রোগবালাই ও প্রতিকার

এ্যানথ্রাকনোজ ঃ এ্যানথ্রাকনোজ একটি ছত্রাক জনিত রোগ। গাছের পাতা, কান্ড, শাখা ও ফল এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ হলে ফলের গায়ে ছোট ছোট বাদামী দাগ পড়ে। তাছাড়া ফল শক্ত, ছোট ও বিকৃত আকারের হতে পারে। ফল পাকা শুরু হলে দাগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ফলটি ফেটে বা পঁচে যায়। আক্রান্ত পাতায় মরিচা পড়ার মত দাগ দেখা যায়। কচি ডাল আক্রান্ত হলে তাতে বাদামী দাগ পড়ে এবং ডালটি মারা যায়। বর্ষাকালেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। গাছের পরিত্যক্ত শাখা প্রশাখা, ফল ও পাতায় এ রোগের জীবানু বেঁচে থাকে। বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার ঃ গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে ফল মার্বেল সাইজ হওয়ার পর থেকে নোইন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম নোইন ৫০ ডব্লিওপি অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফিউজারিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ ঃ ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়। প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর প্রশাখা-শাখা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছই ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

প্রতিকার ঃ এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাই একে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। মাঠে/বাগানে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় যেমন পলিপেয়ারার সাথে কলম করে এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। বাগানের মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ কমানোর জন্য চুন প্রয়োগ করতে হবে।

শুটিমোল্ড ঃ শীতের সময় সাদামাছি পোকা ও মিলিবাগ এর আক্রমণের ফলে পেয়ারা গাছের পাতা ছাই সদৃশ পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। এটি শুটিমোল্ড নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে। আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে ও গাছ দুর্বল হয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ সাদা মাছি পোকা ও মিলিবাগ দমন করতে হবে। প্রতিলিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ৮-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে গাছে ফুল আসে। ফুল আসার ৪-৫ মাসের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করা যায়। পেয়ারা পাকার সময় হলে সবুজ হতে রং বদলিয়ে আস্তে আস্তে হলদে সবুজে পরিনত হয়। এটাই পেয়ারা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। পেয়ারা কোন সময়েই বেশি পাকতে দেওয়া উচিত নয়, এতে স্বাদ কমে যায়। গাছের বয়স, মৌসুম, জাত, মাটি ও পরিচর্যা অনুযায়ী ফলন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পরিপক্ক পেয়ারা বোঁটা বা দু-একটা পাতাসহ কেটে বাজারে আনা হলে একে সজীব মনে হয় ফলে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যায়। প্রখর রোদ বা বৃষ্টির সময় পেয়ারা আহরণ করা ঠিক নয়।

ফলন ঃ ২০-৩৫ টন/হেক্টর।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ পেয়ারা ফল ৮-১৪° সেঃ তাপমাত্রায় ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

কুল

প্রযুক্তি ঃ কুল চাষ

প্রযুক্তি ঃ টক-মিষ্টি উভয় স্বাদযুক্ত কুল বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি বিদ্যমান। শীতকালে দেশীয় ফলের অপ্রতুলতার সময় এদেশে ফলের চাহিদা পূরণে কুল বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে কুলের চাষভুক্ত জমির পরিমাণ খুবই কম। বসত-বাড়ি, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়েই এর চাষ সীমাবদ্ধ। বাগান আকারে কুলের বাণিজ্যিক চাষ খুবই সীমিত। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুলের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে এবং বেশ কিছু এলাকায় এটি একটি লাভজনক ফসল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি কুল-১ঃ উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো। ভাদ্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং মাঘের শেষার্ধে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল মাঝারী (২৩ গ্রাম), হলুদাভ সবুজ বর্ণের ও দু'প্রান্ত সরু। খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (মিষ্টতা ১৩%) ও কষ্টিভাব বিহীন। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১৫ টন। রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় চাষ উপযোগী।

বারি কুল-৩ঃ উচ্চ ফলনশীল মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ খাটো, মোটামুটি খাড়া। ভাদ্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং মাঘের শুরুতে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল আকারে বড় (৭৫ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% ও খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (মিষ্টতা ১৪%) ও কষ্টিভাব বিহীন। হেক্টর প্রতি ফলন ২২-২৫ টন। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

বারি কুল-৪ঃ উচ্চ ফলনশীল মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ খাটো, মোটামুটি খাড়া। ভাদ্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং মাঘের শুরুতে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল আকারে বেশ বড় (৯০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% ও খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ২১%) ও কষ্টিভাব বিহীন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন (২ বৎসর বয়সি গাছ)। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

চিত্র : বারি কুল-১

চিত্র : বারি কুল-৩

চিত্র : বারি কুল-৪

উৎপাদন প্রযুক্তিঃ

জমির ধরণ ঃ উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু কুল চাষের জন্য সর্বোত্তম। এতে কুলের ফলন ও গুনগতমান দুই-ই ভাল হয়। তবে কুলের পরিবেশিক উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আর্দ্র ও ঠান্ডা আবহাওয়ায়ও সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব।

মাটির বর্ণনা ঃ উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁ-আঁশ অথবা দোঁ-আঁশ মাটি কুল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে সব ধরণের মাটিতেই কুলের চাষ করা যায়। অন্যান্য প্রধান ফল ও ফসলের জন্য উপযোগী নয় এ ধরনের অনুর্বর জমিতে এমনকি উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও সন্তোষজনকভাবে কুলের চাষ করা সম্ভব।

জমি প্রস্তুত প্রণালী ঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে।

চারা /কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ৩০০-৬২৫ টি ।

রোপন ও পরিচর্যা ঃ মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময় । তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা/কলম রোপণ করা চলে । বাগানে কুলের চারা/কলম সাধারনত ৪-৬ মিটার দুরে দুরে লাগানো হয় । বাগান আকারে গাছ লাগাতে হ'লে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিৎ । এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে । বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায় । চারা লাগানোর জন্য জমিতে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে । চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পঁচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে ।

সার ব্যবস্থাপনাঃ সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য । সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর । বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রাঃ

গাছের বয়স	*গাছপ্রতি সারের পরিমাণ*			
	গোবর (কেজি)	*ইউরিয়া (গ্রাম)*	*টিএসপি (গ্রাম)*	*এমওপি (গ্রাম)*
১-২ *বছর*	১০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৪ *বছর*	১৫	৫০০	৪০০	৪০০
৫-৬ *বছর*	২০	৭৫০	৭০০	৭০০
৭-৮ *বছর*	২৫	১০০০	৮৫০	৮৫০
৯ বা তদুর্ধ্ব	৩০	১২৫০	১০০০	১০০০

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব সারও প্রয়োগ করতে হবে । উল্লেখিত সার সমান দুই কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে । সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে । বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে তাতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে । গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর । সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয় ।

আন্ত:পরিচর্যা ঃ নতুন রোপণকৃত বা কলমকৃত গাছে আদিজোড় হ'তে উৎপাদিত কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে । গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না । এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫ টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয় । কুল গাছে সাধারণত চলতি বছরের নতুন গজানো প্রশাখায় ভাল ফল ধরে । এজন্য প্রতিবছর ফল আহরণের পরপরই ডাল ছাঁটাই আবশ্যক । চারা রোপণের বা কুঁড়ি সংযোজনের পর ৩/৪ বছর মধ্যম ছাঁটাই অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রশাখা এবং শাখার মাথার দিক থেকে ৫০-৬০ সেমি পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে । গাছ কাংখিত আকারে আসার পর এক বছর বয়সী ডাল গোড়ার দিকে ২০-৩০ সেমি পরিমাণ রেখে সম্পূর্ণ ডালটাই ছেঁটে দিতে হবে । এছাড়া মরা, দূর্বল, রোগাক্রান্ত এবং এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ডালও ছেঁটে দিতে হবে । কুলের বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে । বর্ষার শুরুতে এবং শেষে বাগানে চাষ দিয়ে বা কুদলিয়ে আগাছা দমন করা যায় । শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে সেচ দিলে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় । চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুল বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রন করতে হবে ।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

ফলের মাছি পোকাঃ স্ত্রী পোকা ছিদ্র করে পরিপক্ক হতে থাকা ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে । ডিম পাড়ার ২-৫ দিনের মধ্যে কীড়া বের হয় এবং ভিতরের শাঁস খেতে থাকে । আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায় এবং ঝরে পরে ।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটির অনেক গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। গ্রীষ্মকালে জমিতে চাষ দিয়ে লুকানো পুত্তলী উন্মুক্ত করে দিতে হবে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি রিপকর্ড বা সিম্বুশ অথবা ০.৫ মিলি ডেসিস মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লিফ চেফারঃ এটি বিট্‌ল জাতীয় পোকা। বর্ষা মৌসুমে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। বয়স্ক পোকা রাতে কচিপাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।

প্রতিকার ঃ সুমিআলফা/সুমিথিয়ন প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের পাতায় প্রতি ১০ দিন অন্তর দু'বার স্প্রে করতে হবে। এছাড়া গাছের আশে পাশের আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

রোগবালাই ও প্রতিকার

পাউডারি মিল্ডিউঃ সাধারণত কার্তিক মাসে এ রোগের উপদ্রব লক্ষ্য করা যায়। এ রোগের আক্রমণ হ'লে প্রথমে পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত আবরণ দেখা যায় যা পরবর্তী সময়ে কাল বা বাদামী রং ধারণ করে। আস্তে আস্তে এ রোগ ফুল ও ফলে বিস্তার লাভ করে। এতে ফুল এবং ফল বাদামী রং ধারণ করে এবং ঝরে পরে। ফলের পরিপক্ক অবস্থায় এ রোগের আক্রমণ হ'লে ফল ফেটে যায়।

প্রতিকার ঃ বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছে ফুল আসার সময় প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম সালফোলাক বা কুমুলাক্স মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার পাতার নিচের দিক ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল পঁচাঃ ফলের নিম্ন প্রান্তে হালকা ধুসর-বাদামি দাগ দেখা দেয়। অনেক সময় ফলের গায়ে গাঢ়-বাদামি বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণে ফলে ভিটামিন সি এর পরিমাণ কমে যায় এবং ক্ষতিকারক আফলা টক্সিন উৎপন্ন হয়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটির অনেক গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫ মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহত্তোর ঃ সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ। অপরিপক্ক ফল আহরণ করা হ'লে তা কখনই কাঙ্খিত মানসম্পন্ন হবে না। অতিরিক্ত পাকা ফল নরম এবং মলিন বর্ণের হয়ে যায়। এতে ফলের সংরক্ষণ গুণ কমে যায় এবং ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণ ধারণ করবে এবং এর গন্ধ ও স্বাদ কাঙ্খিত অবস্থায় পৌঁছবে তখনি কুল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফল ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকাল বা বিকেলের ঠান্ডা আবহাওয়া ফল আহরণের জন্য অধিক উপযোগী।

ফলন ঃ ১০-২০ টন/হেক্টর।

নারিকেল

প্রযুক্তি ঃ নারিকেল চাষ

নারিকেল (*Cocos nucifera* Linn.) পামেসি (Palmaceae) পরিবারভূক্ত একটি বৃহৎ ও বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী উদ্ভিদ। একে বিশ্বের সুন্দরতম ও সর্বাধিক ব্যবহার উপযোগী বৃক্ষ হিসেবে গন্য করা হয়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। নারিকেল গাছ এমনই একটি উদ্ভিদ যার মুল থেকে শীর্ষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি অংশ কোন না কোন কাজে লাগে। এমনকি ফল খাওয়ার পরেও এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। সম্ভবত এ গাছ থেকেই মানুষের ব্যবহার উপযোগী সর্বাধিক সংখ্যক দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। নারিকেল সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, যশোর, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায়।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি নারিকেল-১ঃ একটি উচ্চ ফলনশীল লম্বা জাতের নারিকেল। স্থানীয় জাত থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ৭৫-৯৫ টি নারিকেল পাওয়া যায়। ফল মাঝারী আকারের ও ডিম্বাকৃতির। প্রতিটি পরিপক্ক নারিকেলের গড় ওজন ১২০০-১৩০০ গ্রাম। খোসার ওজন ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম। পানির ওজন ২৫০-২৬০ গ্রাম। শাঁসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম। শাঁসের পুরুত্ব ০.৯-১.১ সেমি। তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০% এবং রোগ ও পোকা-মাকড় সহনসীল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩-১৫ টন। বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতটি চাষ করা যায়।

বারি নারিকেল-২ঃ একটি উচ্চ ফলনশীল লম্বা জাতের নারিকেল। বিদেশ থেকে প্রবর্তিত জার্মপ্লাজ্ম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পূর্ন বয়স্ক প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ৬৫-৭৫ টি নারিকেল পাওয়া যায়। ফল আকারে বড় ও প্রায় ডিম্বাকার। প্রতিটি পরিপক্ক নারিকেলের ওজন ১৫০০-১৭০০ গ্রাম। খোসার ওজন ৬০০-৭০০ গ্রাম। পানির ওজন ৩৪০-৩৬০ গ্রাম। শাঁসের ওজন ৪৩০-৫৫০ গ্রাম। শাঁসের পুরুত্ব ১.১-১.২ সেমি। তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫% এবং রোগ ও পোকা-মাকড় সহনসীল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬ টন। এ জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

চিত্র : বারি নারিকেল-১

চিত্র : বারি নারিকেল-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ নারিকেল চাষের জন্য বর্ষার পানি জমে থাকে না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। এর শিকড় মাটির খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করে না তাই জমিতে পানির তল খুব বেশি নীচে থাকা ক্ষতিকর। উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁ-আঁশ অথবা দোঁ-আঁশ মাটি নারিকেল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও সন্তোষজনকভাবে নারিকেল চাষ করা সম্ভব।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে নারিকেল আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও গাছের গুটি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তম রূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। বাগানে নারিকেলের চারা সাধারনত ৫-৬ মিটার দুরে দুরে লাগানো হয়।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২৫০-৩০০ টি ।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) মাস নারিকেল চারা রোপণের উপযুক্ত সময় । তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা রোপণ করা চলে । বাগান আকারে গাছ লাগাতে হ'লে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিৎ । এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে । বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে নারিকেলের চারা লাগানো যায় ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ × ৬ মিটার দূরত্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে ২০-৩০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি, ১০০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ৫০ গ্রাম বরিক এসিড প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে । নারিকেল গাছে প্রচুর সারের প্রয়োজন হয় । গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয় । অন্যান্য সারের তুলনায় নারিকেল গাছে পটাশ জাতীয় সারের মাত্রা বেশি লাগে । এ সারের অভাবে ফল দেরিতে আসে, ফুল ঝরে যায় ও রোগের প্রকোপ বাড়ে । প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে ।

সারের নাম	*গাছের বয়স (বছর)*					
	১-৪	*৫-৭*	*৮-১০*	*১১-১৫*	*১৬-২০*	*২০ এর উর্দ্ধে*
গোবর (কেজি)	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৮০০	১০০০	১২০০	১৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১০০	২০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭৫০
এমওপি (গ্রাম)	৪০০	৮০০	১৫০০	২০০০	২৫০০	৩০০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	৪০	৬০	৮০	১০০	১৫০	২০০
বরিক এসিড (গ্রাম)	১০	১৫	২০	৩০	৪০	৫০

এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব সারও প্রয়োগ করতে হবে । উল্লেখিত সার সমান দুই কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে । সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে । বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে তাতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে । গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর । সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয় ।

পরিচর্যা ঃ গর্তের মাঝখানে নারিকেল চারা এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে নারিকেলের খোসা সংলগ্ন চারার গোড়ার অংশ মাটির উপরে থাকে । চারা রোপণের সময় মাটি নীচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে । রোপণের পর চারায় খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পানি দিতে হবে ।

নারিকেল গাছের তাজা পাতা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়বে । তবে গাছের মাথায় অতিরিক্ত ময়লা-আবর্জনা জমলে বা গন্ডার পোকায় আক্রান্ত হলে তা অবশ্যই পরিস্কার করতে হবে । আমাদের দেশে নারিকেল উৎপাদিত এলাকায় বছরে একবার নারিকেল গাছ ঝুরানোর প্রচলন রয়েছে এবং অনেকেই তা আবশ্যক মনে করেন । প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা গাছ ঝুরানোর কাজ করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ নারিকেল বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে । বর্ষার শুরুতে এবং শেষে জমিতে চাষ দিয়ে, কোদাল দ্বারা কুপিয়ে অথবা আগাছা নাশক ঔষধের সাহায্যে আগাছা দমন করা যায় ।

সেচের সময়কাল ঃ নারিকেল ফসলের উপর সেচ ও নিস্কাশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে সঠিকভাবে সেচ দিলে ফলন ৭৫% পর্যন্ত বেড়ে যায় । শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর এবং গাছে সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হবে । বেসিন এবং প্লাবন এ দুই পদ্ধতির সাহায্যে সেচ প্রদান করা যায় । তবে প্লাবন

পদ্ধতিতে ফলন ভাল হয়। বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যেন পানি দাড়াতে না পারে তার জন্য পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা দরকার।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

গন্ডার পোকা ঃ পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের মাথার পাতার কচি অগ্রভাগ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং কচি নরম শাস খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত গাছের নতুন পাতা যখন বড় হয় তখন পাতার আগা কাচি দিয়ে কাটার মত দেখায়। কোন কোন সময় পাতার মধ্য শিরাটিও কাটা পড়ে যায়। ফলে পাতাটি ভেঙ্গে পড়ে। আক্রমণ তীব্র হলে নতুন পাতা বের হতে পারে না। এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে গাছ মারা যায়। গাছের নীচে বা আশে পাশে গোবরের ঢিবি থাকলে এ পোকা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে কীটনাশক প্রবেশ করালে পোকা মারা যাবে। এরপর ছিদ্রটি পুডিং বা কাদা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এ পোকাগুলো পঁচা আবর্জনা, গোবর, মরা কাঠের গুড়িতে প্রজনন ঘটায় ও ডিম পাড়ে। তাই এ সকল প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে।

নারিকেলের লাল পোকা/রেড পাম উইভিলঃ পোকা গাছের অগ্রভাগে নরম অংশ ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং মধ্যবর্তী নরম কোষগুলো খেয়ে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে। সুড়ঙ্গ বা গর্তের মুখে গাছের চিবানো অংশ, ছোবড়া, বাদামী তরল পদার্থ দেখা গেলে পোকার অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রতিকার ঃ একতারা ৫ এসজি প্রতি এক লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুলে সিরিঞ্জ দিয়ে ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে এ পোকা দমন সম্ভব। নারিকেল বাগান আগাছমুক্ত রাখতে হবে। বছরে দুইবার নারিকেল গাছের মাথা ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে।

সাদা মাকড় ঃ সাদা মাকড় কচি ফলে আক্রমণ করে ফলের রং ও ত্বকের মসৃনতা নষ্ট করে দেয়। এতে কচি ডাব দেখতে পাকা নারিকেলের মত মনে হয়।

প্রতিকার ঃ মাঘ মাসে ৬-৭ মাস বয়স্ক সমস্ত ফুল ও ফল কেটে ফেলে আগুনে ঝলসাতে হবে। এরপর ওমাইট বা ভার্টিমেক নামক মাকড়নাশক প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রথমবার স্প্রে করার পর গাছে ফল আসলে এবং পরবর্তিতে একই ভাবে আরও ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। আশেপাশে আক্রান্ত গাছ থাকলে পরবর্তী বছর আবার আক্রমণ হতে পারে। তাই এলাকা ভিত্তিক মাকড় দমন কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

উঁই পোকাঃ বীজ নারিকেল বীজ তলায় অথবা নারিকেল চারা বাগানে লাগানোর পর উঁই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এরা নারিকেলের খোসা, ভিতরের অংশ এবং গাছের শিকড় খেয়ে ফেলে, ফলে গাছটি বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে মারা যায়। কখনও কখনও উঁই পোকা বয়স্ক গাছের কান্ডে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এবং পাতা ও মঞ্জুরী পর্যন্ত চলে যায়। আবার কখনও এরা গাছের গোড়ায় ঢিবি তৈরি করে। দুর্বল ও রোগা গাছগুলোতেই উঁই পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার ঃ বাগান পরিস্কার রাখতে হবে। দুর্বল, মরাগাছ, গাছের গুড়ি ও অবশিষ্টাংশে ঢিবি ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেলতে হবে। পাইরিফস/রিজেন্ট ৫০ এসজি কীটনাশক প্রয়োগ করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

ইঁদুরঃ ইঁদুরের উপদ্রবের জন্য অনেক এলাকায় নারিকেল গাছে কোন ফুলই পাওয়া যায় না। ইঁদুর যে কোন বয়সের নারিকেলের ক্ষতি করে। নারিকেল গাছের কচি পাতাসহ মুকুটের ক্ষতি সাধন করে। ফলে অনেক সময় গাছটি মারা যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ ফাঁদ পেতে ইঁদুর মারতে হবে। ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে, বিষাক্ত ধোয়া দিয়ে ইঁদুর দমন করা যায়। ইঁদুর নিয়ন্ত্রনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ইঁদুর যাতে গাছে উঠতে না পারে এ জন্য গাছের গোড়া থেকে ১.৫-২.০ মিটার উঁচুতে ৫০ সেমি চওড়া টিনের/এলুমিনিয়ামের পাত গাছের চারদিকে গোল করে লাগিয়েও ইঁদুরের আক্রমণ থেকে নারিকেল রক্ষা করা যায়।

রোগবালাই ও প্রতিকার

বাড রট/কুড়ি পঁচাঃ *ফাইটোফথোরা* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এরোগের আক্রমণে কচি পাতা প্রথমে বিবর্ণ হয়ে যায় ও পরে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। এ ভাবে ক্রমান্বয়ে ভিতর থেকে বাইরের দিকে বয়স্ক পাতা একের পর এক আক্রান্ত হতে থাকে। আক্রান্ত পাতা আস্তে আস্তে মারা যায় ও এক সময় কেন্দ্রস্থলের সকল পাতার বোটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে। এ অবস্থা গাছটিকে কেন্দ্রস্থলে পাতা শুন্য মনে হয়।

প্রতিকার ঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ৪-৫ গ্রাম সিকিউর মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। এ রোগে আক্রান্ত মৃত প্রায় গাছকে কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফল পঁচা রোগ ঃ এ রোগের কারণে অপরিপক্ক বা কচি ফল পঁচে যায়। রোগের আক্রমণের ফলে গোড়ার দিক বিবর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাদামী রং ধারণ করে এবং ফলের গায়ে সংক্রমিত স্থানে ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকার ঃ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। রোগের আক্রমণ রোধ করতে হলে গাছ পরিস্কার রাখতে হবে।

পাতার ব্লাইট/দাগ পড়া রোগ ঃ এ রোগের আক্রমণে পাতায় ধুসর বাদামী বর্ণের কিনারাসহ হলুদ বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ডিম্বাকার ও এক সেমি লম্বা। পরবর্তীতে দাগগুলো ধুসর বর্ণের হয় ও পাতার শিরার সমান্তরাল প্রসারিত হতে থাকে এবং সবশেষে সব দাগগুলো একত্রিত হয়ে পুরো পাতাটাই ছেয়ে ফেলে। চারা এবং ছোট গাছ এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

প্রতিকার ঃ পরিমিত সার প্রয়োগ করলে ও যথা সময়ে সেচ এবং নিস্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। আক্রান্ত গাছে ব্যাভিস্টিন/কারবেন্ডাজিম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

রস ঝরা/স্টেম ব্লিডিংঃ গাছের আক্রান্ত অংশ দিয়ে লালচে বাদামী বর্ণের রস নির্গত হয়। যে স্থান দিয়ে রস গড়িয়ে নামে সে স্থানে রস ঝরার দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। সংক্রমণ স্থানের বাকলও শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং ভিতরে গভীর গর্তের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত অংশ ভালভাবে ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। গাছে গর্ত হয়ে গেলে পীচ বা সিমেন্ট দ্বারা গর্ত পূরণ করে দিতে হবে।

অন্যান্য সমস্যা সমুহ

বন্ধ্যা বা চিটা নারিকেল সৃষ্টি হওয়াঃ অনেক সময় নারিকেল গাছে বন্ধ্যা বা শাঁসবিহীন ফল উৎপাদিত হয়। বন্ধ্যা ফলের বাইরের খোসা ও খোল স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে উঠে কিন্তু ভিতরের পানি বা শাঁস থাকে না এবং কোন ভ্রুণ থাকে না। কখনও শুধু পানি থাকে কিন্তু শাঁস থাকে না। আবার কখনও আংশিক শাঁস থাকে কিন্তু পানি থাকে না। একে চিটা নারিকেল বলা হয়।

প্রতিকার ঃ বরিক এসিড (৫০ গ্রাম/গাছ) ও এমোনিয়াম মলিবডেট গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। সুষম সার ব্যবহার। এ সমস্যার জন্য ভাল প্রতিকার।

অপরিপক্কফল/কচি ডাব ঝরে পড়া ঃ অনেক নারিকেল গাছে ছোট অবস্থায় ফল ঝরে পড়তে দেখা যায়। সাধারণত কোন কারণে স্ত্রী ফুল নিষিকে ব্যর্থ হলে ঝরে পড়ে। চারা রোপণের পর প্রাথমিক বছরগুলোতে স্বাভাবিক কারণে কচি ফল ঝরে পড়ে। কারণ তখনও গাছ সর্বাধিক সংখ্যক ফল ধারণ করার সক্ষমতা রাখে না। গাছে পুষ্টির ঘাটতি হলে বিশেষ করে পটাশ এর অভাব হলে ও দীর্ঘ মেয়াদী খরা হলে বা খরার পর হঠাৎ বৃষ্টি হলে এবং বিভিন্ন পোকা মাকড় ও রোগে আক্রান্ত হলে ফল ঝরে পড়ে।

প্রতিকার ঃ ফল ঝরে পড়ার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ দিতে হবে। রোগ বালাই ও পোকা মাকড় দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নারিকেল গাছ আগার দিকে সরু হয় ঃ এটা শারীরবৃত্তীয় রোগ (Tapering)। জলাবদ্ধতা, রোগের আক্রমণ বা অন্য কোন কারণে শিকড়ের কার্যকারিতা বিনষ্ট হলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় গাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সুষম সার প্রয়োগ ও সঠিক পরিচর্যা করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ঃ ফুল ফোটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ৫-৭ মাস বয়সী ফল সংগ্রহ করা হয়। সারা বছরই কম বেশি নারিকেল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরে দু'বার (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) এবং (ভাদ্র-কার্তিক) মাসে বেশির ভাগ গাছ থেকে নারিকেল সংগ্রহ করা হয়। নারিকেল পরিপক্ক হলে বাদামী রং ধারণ করে এবং ঝাঁকি দিলে পানি নড়ে।

ফলন ঃ গাছপ্রতি ৬০-৯০ টি নারিকেল পাওয়া যায়। নারিকেল গাছের বয়স ৭-৮ বছর হলে ফল দিতে শুরু করে এবং ৭০-৮০ বৎসর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। নারিকেল ধরার প্রাথমিক বছরগুলোতে নারিকেল কম থাকে তারপর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং ৪/৫ বৎসরের মধ্যে স্থিতিশীল হয়।

সফেদা

প্রযুক্তি ঃ সফেদা চাষ

সফেদা (*Manilkara zapota* syn. *Achras sapota*) Sapotaceae পরিবারের একটি মিষ্টি ও সুস্বাদু ফল। শীতকালে যখন অন্যান্য দেশী ফলের প্রাপ্যতা কম থাকে, সাধারণত তখন সফেদা পাওয়া যায়। সফেদা চিনি সমৃদ্ধ ফল। শিশুদের শরীরে বাড়তি শক্তির যোগান দিতে পারে সফেদা। সফেদাতে রয়েছে গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি'। সফেদা গাছ কষ্টসহিষ্ণু এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে দেশের সর্বত্রই এমনকি লবণাক্ততা প্রবণ উপকুলীয় অঞ্চলেও সফেদার আবাদ করা সম্ভব। সফেদা একটি অমৌসুমী ফল। ইহা বাণিজ্যিক চাষের আওতায় আনা হলে ফলের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং ফলের মৌসুম দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে পুষ্টির অভাব দূরীকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যথাক্রমে ১৯৯৬, ২০০৩ ও ২০০৯ সালে সফেদার তিনটি উচচ ফলনশীল জাত কৃষক পর্যায়ে চাষের জন্য মুক্তায়িত করেছে। জাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

বারি সফেদা-১ঃ নিয়মিত বছরে দু'বার ফল ধারণকারী (নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি) উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মঝারী, মধ্যম ছড়ানো। ফল মাঝারী, গোলাকার, গড় ওজন ৮৫ গ্রাম, মিষ্টি (টিএসএস ১৫%), খাদ্যেপযোগী অংশ ৯৫%। চট্টগ্রাম এলাকায় ভাল হয় তবে দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি সফেদা-২ ঃ নিয়মিত বছরে দু'বার ফল ধারণকারী (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল-জুন) উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মঝারী, মধ্যম ছড়ানো। ফল গোলাকার, ওজন ৭৫ গ্রাম, ফল খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১%। দেশের মধ্যাঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের জন্য সুপারিশকৃত। তবে দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বারি সফেদা-৩ ঃ নিয়মিত বছরে দু'বার ফল ধারণকারী (অক্টোবর-নভেম্বর এবং জানুয়ারি-এপ্রিল) উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মঝারী, মধ্যম ছড়ানো। ফল অপেক্ষাকৃত বড়, গোলাকার (১১৭ গ্রাম), খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১%। সারাদেশে চাষ করা যায় তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চল বেশি উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন।

চিত্র : বারি সফেদা-১

চিত্র : বারি সফেদা-২

চিত্র : বারি সফেদা-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ পানি জমে না এমন উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমি উত্তম। যে কোন ধরনের মাটিতে সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব।

জমি তৈরি ঃ জমি ২/৩ বার ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে এবং শিকরসহ দীর্ঘজীবি আগাছা অপসারণ করে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২০০-২৫০ টি ।

রোপন ও পরিচর্যা ঃ জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাস সফেদার কলম রোপণের উপযুক্ত সময় । তবে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই সফেদার কলম রোপণ করা চলে । চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মি. × ৭ মি. দূরত্বে (জাত ও মাটিভেদে দূরত্ব ভিন্ন হতে পারে) ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয় । গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংখিত ফলনের জন্য প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে ।

সারের নাম	*গাছের বয়স*				
	১-৩ বছর	*৪-৭ বছর*	*৮-১০ বছর*	*১১-১৫ বছর*	*১৫ বছর এর উর্ধ্বে*
গোবর/কম্পোট (কেজি)	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১০০-২০০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৫০০	৭০০	৮০০
এমপি (গ্রাম)	১৫০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০	১০০	২০০	৩০০	৪০০

এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব সারও প্রয়োগ করতে হবে । উল্লেখিত সার সমান দুই কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে । সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে । বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে তাতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে । গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর । সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয় ।

পরিচর্যা ঃ গর্তের মধ্যস্থানে সোজা করে কলম লাগাতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে কলমের জোড়াস্থান মাটি থেকে যেন কমপক্ষে ১৫ সেমি উপরে থাকে । কলম রোপণের পর পানি দিতে হবে । গাছটি যাতে খাড়া থাকে এবং বাতাসে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য খুটি দিতে হবে ।

কলমের জোড়াস্থানের নীচ থেকে গজানো পার্শ্বীয় ডালপালা গোড়া থেকে কেটে ফেলতে হবে । গাছটিকে সুন্দর একটি কাঠামো দেয়ার জন্য রোপণের দুই থেকে তিন বছর পর গোড়ার দিকে তিন থেকে চার ফুট কান্ড রেখে সমস্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে । এর উপরে চতুর্দিকে ছড়ানো চার পাঁচটি সুস্থ সবল ডাল রেখে অন্যগুলো কেটে ফেলতে হবে । গাছ যাতে বেশি ঝোপালো হয়ে না যায় সেজন্য প্রতি বছর শীতের শেষে মরা, রোগাক্রান্ত, দুর্বল এবং অতিরিক্ত ডালপালা কেটে দিতে হবে । এতে সুষ্ঠুভাবে আলো-বাতাস পাওয়ার ফলে ফলন ও ফলের গুণগতমান উভয়ই ভাল হবে ।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ সফেদার বাগান সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে । গাছের তলায় বা চারিদিকে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেজন্য বর্ষার শুরুতে এবং শেষে জমিতে চাষ দিতে হবে অথবা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে দিতে হবে ।

সেচ প্রদান ঃ সফেদা গাছ মোটামুটি খরা সহ্য করতে পারে । তবে বেশি খরার সময় ১৫ দিন পর পর সেচ দেয়া ভাল । বিশেষত কার্তিক মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিলে ফলন বেশি হয় । গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে এজন্য নিকাশনালা তৈরি করে দিতে হবে ।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

কান্ড ছিদ্রকারী পোকাঃ পোকার কীড়া গাছের বাকল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং বাকলের নীচের নরম অংশ খেয়ে গাছের সতেজতা নষ্ট করে । আক্রান্ত গাছের কান্ডে গর্ত থাকে এবং গর্তের মুখে কীড়ায় নষ্ট করা বাকলের গুঁড়া বা বিষ্ঠা ঝুলে থাকতে দেখা যায় ।

প্রতিকার ঃ লোহার শিক দিয়ে গর্তের ভেতর থেকে কীড়া বের করে মেরে ফেলতে হবে। গর্ত যদি গভীর হয় তবে সিরিঞ্জ দিয়ে গর্তের ভেতর কেরোসিন বা কীটনাশক ঢুকিয়ে গর্তের মুখ তুলা/কাদা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিলে পোকা মরে যাবে।

লীফ মাইনার ঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীড়া কচি পাতা চেঁছে খায় এবং আক্রান্ত পাতায় এলোমেলো, সর্পিল দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে।

প্রতিকার ঃ সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর দুইবার গাছের পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই ও প্রতিকার

সফেদায় মারাত্মক কোন রোগবালাই তেমন দেখা যায় না। তবে কখনো কখনো পাতায় দাগ পড়া রোগ হতে পারে।

পাতায় দাগ পড়া রোগ ঃ পাতায় অসংখ্য হালকা গোলাপী বা ছোট ছোট গোলাপী বা লালচে-বাদামী রং এর দাগ পড়ে। দাগ গুলোর কেন্দ্রস্থলে সাদাটে হয়।

প্রতিকার ঃ ইন্ডোফিল এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর দুই বার সমস্ত গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শুটিমোল্ড ঃ মিলিবাগ সফেদা গাছের পাতা ও ফল থেকে রস চুষে খায় এবং মধুর মত আঠালো রস নিঃসরণ করে। এদের উপর ছত্রাক জন্মে এবং শুটিমোল্ড নামক রোগের সৃষ্টি করে। এর আক্রমণের ফলে সফেদা গাছের পাতায় ছাই এর মত পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং পাতা ও ফল ঝরে পড়ে।

প্রতিকার ঃ মিলিবাগ দমন করতে হবে। প্রতিলিটার পানির সাথে ০.২৫ মিলি হারে এডমায়ার ২০০ এসএল অথবা ডাইমেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (টাফগর/রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি) ২ মিলি হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহত্তোর ঃ

সফেদা গাছে পাকিয়ে সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক। কেননা ফলের বাহ্যিক রঙের এমন কোন বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না যা দ্বারা পাকা ফল সহজে শনাক্ত করা যায়। এজন্য ফল পুরোপুরি পরিপুষ্ট হলে গাছ থেকে পেড়ে রেখে দিতে হয়। পুরোপুরি পরিণত ফল সংগ্রহ করে খড় বা বস্তা দ্বারা ঢেকে রাখলে ৬-১০ দিনের মধ্যে ফল পেকে যায়। অপরিণত সফেদা ভালভাবে পাকে না, মিষ্টি লাগে না এবং খেতেও ভাল লাগে না। সফেদা ভালভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে কি-না তা নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা চিনে নিতে হয়।

- পরিপুষ্ট ফলের ত্বকের রং ফ্যাকাশে-বাদামী বা আলুর মত হয়।
- ফলের গায়ের বাদামী রংয়ের পাউডারী (Scaly) পদার্থ কমে যায় বা থাকে না বললেই চলে।
- পরিপুষ্ট ফলের কষ কমে যায় এবং তা দুধের মত সাদা না হয়ে হালকা বর্ণের হয়।
- ফলের মাথায় অবস্থিত কাঁটাসদৃশ গর্ভমুন্ড পড়ে যায় বা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সহজেই ঝরে পড়ে।

সামান্য আঘাতেই সফেদা ফল ফেঁটে যায়। ফাঁটা ফল পাকার পূর্বেই পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য পাড়ার সময় ফল যাতে আঘাত না পায় সে জন্য হাত দিয়ে বা থলেযুক্ত কোঁটার সাহায্যে ফল পাড়তে হবে।

ফলন ঃ ২০-৩৫ টন/হেক্টর।

আমড়া

প্রযুক্তি ঃ আমড়া চাষ

বাংলাদেশে গৌন ফলের মধ্যে আমড়ার নাম উল্লেখযোগ্য। আমড়া খেতে খুব সুস্বাদু এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। কাঁচা আমড়া টক-মিষ্টি স্বাদের। আমড়া রান্না করে, আচার বা চাটনি হিসেবেও খাওয়া যায়। ভাল জাতের আমড়া আমাদের দেশে বরিশালী আমড়া বা বিলাতী আমড়া নামে সমধিক পরিচিত।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০০৩ সালে বারি আমড়া-১ নামে বারমাসী এবং ২০০৬ সালে বারি আমড়া-২ নামে নিয়মিত ফলদানকারী আমড়ার দুটি জাত মুক্তায়িত করা হয়।

বারি আমড়া-১ঃ সারা বছর ফল ধারণকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বামনাকৃতির, মধ্যম ঝোপালো। টবে, ছাদে ও বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ করা যায়। ফল ছোট, গড় ওজন ৬০ গ্রাম, টক মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ৭.০%)। বীজ ছোট ও নরম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-১৭ টন।

বারি আমড়া-২ঃ উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ বৃহৎ আকৃতির, অল্প ঝোপালো। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত গাছে ফুল আসে এবং আগস্ট-অক্টোবর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। ফল সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৯%) ও বড় (৯৮ গ্রাম)। বীজ বড় ও বেশ শক্ত, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। রপ্তানিযোগ্য জাতটি উপকূলীয় অঞ্চলে চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭ টন।

চিত্র : বারি আমড়া-১

চিত্র : বারি আমড়া-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে আমড়ার চাষ ভাল হয়। এ জন্য নিরক্ষীয় এলাকা ও উপনিরক্ষীয় এলাকার নিম্নাঞ্চলে এর চাষ হয়। শুষ্ক পরিবেশ আমড়া চাষের উপযোগী নয়। আংশিক ছায়াতেও আমড়া জন্মানো যায়। নিকাশ ব্যবস্থা ভাল হলে প্রচুর বৃষ্টিপাতেও কোন অসুবিধা হয় না। বিলাতী আমড়া দেশী আমড়ার চেয়ে বেশি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। সুনিস্কাশিত হলে যেকোন মাটি আমড়া চাষের উপযোগী। তবে উর্বর বেলে দোঁ-আশ মাটি আমড়া চাষের জন্য উত্তম। স্যাঁতস্যাঁতে জমি আমড়া চাষের অনুপযোগী। তবে পানি জমে না এমন উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমি উত্তম।

জমি তৈরি ঃ আমড়া চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে যেখানে বর্ষাকালে পানি দাঁড়ায় না। চারা লাগানোর জন্য জমি ২/৩ বার ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে এবং শিকড়সহ দীর্ঘজীবি আগাছা অপসারণ করে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২০০ থেকে ৬৫০ টি।

রোপন ও পরিচর্যা ঃ বর্গাকার ও কুইনকান্স পদ্ধতি আমড়া চাষের জন্য উপযোগী। আমড়া বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতেও রোপণ করা যেতে পারে। জুন-আগস্ট মাস চারা রোপণের সবচেয়ে উপর্যুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষেও চারা রোপণ করা যেতে পারে। বারি আমড়া -১ এর ক্ষেত্রে ৪ মি. × ৪ মি. এবং বারি আমড়া - ২ এর ক্ষেত্রে ৭ মি. × ৭ মি.। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংখিত ফলনের জন্য প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের বয়স	*জৈব সার (কেজি)*	*ইউরিয়া (গ্রাম)*	*টিএসপি (গ্রাম)*	*এমওপি (গ্রাম)*	*জিপসাম (গ্রাম)*	*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
১-২ বছর	৫-১০	১০০	১৫০	১০০	৫০	দুই-তিন মাস অন্তর চার কিস্তিতে (বৈশাখ, আষাঢ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ন) উপরোক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে। বারি আমড়া-২ এর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দ্বিগুন করতে হবে।
৩-৪ বছর	১০-১৫	১৫০	২০০	১৫০	৬০	
৫-৬ বছর	১৫-২০	২০০	২৫০	২০০	৭৫	
৭-১০ বছর	২০-২৫	২৫০	৩০০	২৫০	৯০	
১১ বছর বা তদুর্ধ	২৫-৩০	৩০০	৩৫০	৩০০	১০০	

পরিচর্যা ঃ গর্তের মধ্যস্থানে সোজা করে চারা/কলম লাগাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কলমের জোড়াস্থান মাটি থেকে যেন কমপক্ষে ১৫ সেমি উপরে থাকে। কলম রোপণের পর পানি দিতে হবে। গাছটি যাতে খাড়া থাকে এবং বাতাসে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য খুটি দিতে হবে।

গোড়ার দিকে ৭৫-১৫০ সেমি কান্ড রেখে ডাল-পালা নেয়াই ভাল। বড় গাছের বেলায় শুধুমাত্র মরা ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাইকরণের পর কাটা অংশে বর্দোপেষ্ট লাগাতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের নীচের অংশসহ চাষাধীন পুরো জমি সর্বদা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শুরুতে ও শেষে জমিতে চাষ দিয়ে বা কুদলিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখা যায়।

সেচ প্রদান ঃ শুকনা মৌসুমে দুই সপ্তাহ অন্তর পানি সেচ দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর গাছে হালকা সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। জমিতে জো অবস্থা না থাকলে ফুল আসার সময় ও ফল মটর দানার সময় অবশ্যই গাছের গোড়ায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। প্লাবন বা বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করা যায়।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

বিটল পোকা ঃ এ পোকা কচি পাতা খেয়ে গাছকে পত্র শূন্য করে ফেলে। ফলে গাছ দূর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়। এ পোকার গায়ে লালচে ফোটারমত দাগ দেখা যায়। এপ্রিল-আগস্ট পর্যন্ত এ পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে।

প্রতিকার ঃ পোকার সংখ্যা কম হলে হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা যায়। লার্ভা অবস্থায় গুচ্ছাকারে থাকার সময় পাতা সহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। পোকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা রগর ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।

ডগা ছিদ্রকারী পোকা ঃ এই পোকা গাছের ডগায় ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে কোষরস খায়, ফলে গাছ দূর্বল হয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ পোকা ও ডিমসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করতে হবে। গাছ/বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সুমিথিয়ন/লিথিয়ন ৫০ ইসি ২ মিলি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই ও প্রতিকার ঃ

এনথ্রাকনোজঃ কখনো কখনো পাতায় ও ফলে বাদামী থেকে কালো দাগ পড়ে। এ রোগের কারণে পাতা আস্তে আস্তে মরে যায় এবং কচি ফল ঝরে যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। এ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম-৪৫/ ম্যানকোজেব বা ০.৫ মিলি স্কোর ২৫০ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ডাইব্যাক ঃ এই প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে গাছের ডগা/ডাল উপরের দিক থেকে শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেষ্ট লাগাতে হবে। আক্রান্ত গাছে ইন্ডোফিল এম-৪৫ (০.২%) অথবা বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ ফল পরিপূর্ণ হলেই সবুজ অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। গাছ পাকা আমড়া বীজের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফল খুব সাবধানে সংগ্রহ করতে হবে যাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফেটে না যায়।

ফলন ঃ ১২-২০ টন/হেক্টর।

বিলাতিগাব

প্রযুক্তি ঃ বিলাতি গাবের চাষ

বিলাতি গাব বা Velvet apple (*Diospyros discolor*) Ebenaceae পরিবারভূক্ত একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের সুন্দর ও সু-সাদু ফলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। বিলাতি গাবের গাছ মাঝারী থেকে উঁচু বৃক্ষ, ফল গোলাকার। প্রধাণত তাজা ফল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিলাতি গাবের ত্বক রেশমী লোমে আবৃত, রং বাদামী থেকে উজ্জ্বল লাল। ফলের শাঁস সাদাটে, আঠালো ও সুস্বাদু। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি বিলাতিগাব-১ ঃ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাড়া, চির সবুজ ও অত্যধিক ঝোপালো। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। গাছ প্রতি ৩৭২ টি ফল ধরে যার ওজন ১২০.৯ কেজি। ফল বড় (৩২৫ গ্রাম), গোলাকার ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল বর্ণের। ফলের শাঁস ধুসর বর্ণের, আঠালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৫%)। ফলপ্রতি ৩-৪ টি বীজ থাকে, বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যেপযোগী অংশ ৭২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

চিত্র : বারি বিলাতিগাব-১ (গাছ)

চিত্র : বারি বিলাতিগাব-১ (ফল ও বীজ)

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমি বিলাতি গাব চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পরিস্কার করে নিলেই চলবে। বেলে থেকে এটেল প্রায় সকল প্রকার জমিই বিলাতিগাব চাষের জন্য উপযোগি।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে দিতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২০০ থেকে ২৫০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ সমতল ভূমিতে বিলাতি গাবের চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিলাতি গাবের চারা রোপণ করা যায়। গাছের দূরত্ব ৭ মি. x ৭ মি.। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৬.০ মিটার দুরত্বে ১ মি. x ১ মি. x ১ মি. মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট বা পঁচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থানা ঃ গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংখিত ফলনের জন্য প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	*গাছের বয়স*				*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
	১-৩ বছর	*৪-৭ বছর*	*৮-১০ বছর*	*১০ বছর এর উর্দ্ধে*	দুই-তিন মাস অন্তর চার কিস্তিতে (বৈশাখ, আষাঢ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ন) উপরোক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে।
গোবর/কম্পোস্ট সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০	
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০-৮০০	১০০০	
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০	
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০	

পরিচর্যা ঃ এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের গোড়ার আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানো গাছের গোড়ার আগাছা কেটে পরিস্কার রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

গাছে তেমন কোন মারাত্বক পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দেখা যায় না। তবে এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে ফলের উজ্জলতা হ্রাস পায় ও গুণগত মান খারাপ হয়। আক্রান্ত ফল থেকে হলুদ আঠা বের হয় এবং ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা ঃ ছত্রাকনাশক টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যেতে পারে। অনেক সময় পাতা খেকো পোকা গাছের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে। সুমিথিয়ন স্প্রে করে এ পোকা দমন করা সম্ভব।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং বর্ষার শেষভাগে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে। ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে হালকা লাল থেকে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে কিংবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন ঃ ৩০-৩৫ টন/হেক্টর।

দেশি গাব

প্রযুক্তি ঃ গাবের চাষ

দেশিগাব বা Riverebony (*Diospyros peregrina*) Ebenaceae পরিবারভূক্ত একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে স্বল্প প্রচলিত ফল এর চাষ হয়। আমাদের এ অঞ্চলেই এর উৎপত্তি। দেশী গাব বনে জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে থাকে। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পিরোজপুর এলাকায় গাব গাছ দেখা যায়। গাবের গাছ মাঝারী থেকে উচু বৃক্ষ, ফল গোলাকার। দেশী গাবের ফলের ত্বকে পাউডারের মত বাদামী আবরণ থাকে। প্রতিফলে সাধারণত ৮ টি করে অর্ধচন্দ্রকার বীজ থাকে। বিভিন্ন পুষ্টি বিশেষ করে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও ফল হিসাবে দেশী গাবের ব্যবহার খুবই কম। কাঁচাবস্থায় এ ফলের কষ দিয়ে মাছধরার জাল ও নৌকা রাঙ্গানো হয়। পাকা গাবের ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী শাঁসে ৬৯.৬ গ্রাম পানি, ০.৮ গ্রাম খনিজ, ১.৫ গ্রাম আঁশ, ১.৪ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ২৬.৬ গ্রাম শর্করা, ৫৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ১১৩ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। ফলের খোসার গুড়ো আমাশয় নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। একজিমা ও চর্মপীড়ন মলম তৈরিতে ইহা প্রয়োগ করা হয়। খোসা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে পাতলা পায়খানা ও ডায়রিয়া নিরাময় হয়। পাতা ও বাকল গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে কৃমি, পাতলা পায়খানা, আমাশয় ও মূত্র সংক্রান্ত রোগ উপশম হয়।

চিত্র : দেশি গাব গাছ

চিত্র : দেশি গাব গাছসহ ফুল ও ফল

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মন্ডলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া গাব চাষের জন্য উপযোগি। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই গাব গাছ হতে পারে। তবে মাটির গভীরতা থাকা চাই। ইহা উর্বর ও আদ্র ভূমিতে ভালভাবে জন্মে থাকে। গাব গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং অনেকটা বিনা যত্নেই ভালভাবে জন্মে থাকে। দেশী গাব অনেকটা অযত্নেই বাড়ীর আঙ্গিনায় কিংবা জলাধার বা ডোবানালার তীরে অযত্নে জন্মে থাকে। গোড়ায় দীর্ঘদিন পানি জমে থাকলেও এর গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রায় সবধরনের মাটিতেই দেশী গাবের চাষ করা যায়। তবে উর্বর দো-আঁশ মাটি ইহা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগি। এই গাছের নির্দিষ্ট পরিমানে জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলে সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলে এর চাষের ব্যপক সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ বেশ শক্ত এবং সাইক্লোনেও ভেঙ্গে পড়েনা বিধায় সবুজ বেষ্টনীর জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পরিস্কার করে নিলেই চলবে।

অনুমোদিত জাত ঃ কোন অনুমোদিত জাত নেই।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ সমতল ভূমিতে গাবের চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত গাবের চারা

রোপণ করা যায়। বাগান আকারে গাছের চাষ করতে চাইলে ৮ মি. × ৮ মি. দুরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৮ মিটার দুরত্বে ১ মি. × ১মি.× ১ মি. মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট বা পঁচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাব গাছে সার প্রয়োগের প্রচলন না থাকলেও চারা রোপণের পর প্রতি বছরই বর্ষার আগে ও পরে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি বছর সারের মাত্রা ১০% হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। পূর্ণবয়স্ক গাছে প্রতি বছর ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লিখিত সার গাছের গোড়া থেকে ১ মিটার দূরে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের ক্ষেত্রে ডিব্লিং পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পাড়ে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাটাইকরণ ঃ চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাটাই করে রাখতে হবে। ছাটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিস্কার করতে হবে। গাছের গোড়ার আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানো গাছের গোড়ার আগাছা কেটে পরিস্কার রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। গাবের গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু হওয়ায় পানি সেচ বা নিষ্কাশনের প্রয়োজন পড়ে না।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

গাছে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ খুব একটা দেখা যায় না।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং বর্ষার শেষভাগে ফল পাকে। গাব ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে হালকা হলুদ থেকে গাঢ় হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে কিংবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। জাল বা নৌকা রং করার ক্ষেত্রে অপরিপক্ক ফল ব্যবহার করা হয়।

ফলন ঃ ১৫-২০ টন/হেক্টর (পাঁকা) এবং ৫-১০ টন/হেক্টর (কাঁচা)।

তেঁতুল

প্রযুক্তি ঃ তেঁতুল চাষ

বাংলাদেশের অপ্রধান ফলের মধ্যে তেঁতুল বেশ জনপ্রিয়। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Tamarindus indica.* আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে এর উৎপত্তি। তবে অনেকের মতে দক্ষিন এশিয়ায় এর আদি নিবাস। বিশেষকরে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই তেঁতুল বেশ পরিচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ছোট বড় সকলের কাছে তেঁতুল বেশ জনপ্রিয় বিশেষ করে মহিলাদের কাছে তেঁতুলের কদর বেশি। টক এবং মিষ্টি দুই ধরনের স্বাদের তেঁতুল রয়েছে তবে বাংলাদেশে উৎপাদিত তেঁতুলের অধিতাংশই টক শ্রেণীর। কাচা অবস্থায় ফলের সবুজ ত্বক শ্বাসের সাথে মিশে থাকে, পাকার পর ত্বক ও শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তেঁতুল বীজ থেকে শিল্পে ব্যবহারের জন্য গাম ও রং তৈরি হয়।

চিত্র : বারি তেতুঁল-১

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশে তেঁতুলের জাত উন্নয়নে খুব একটা গবেষণা না হলেও সম্প্রতি বিদেশ থেকে সংগৃহীত তেতুলের জার্মপ্লাজম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে ২০১০ সালে বারি তেঁতুল-১ নামে তেঁতুলের একটি উন্নত জাত জাতীয় বীজ বোর্ড এর মাধ্যমে মুক্তায়ন করা হয়েছে। জাতটি মিষ্টি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট নিম্নের ছকে দেয়া হল।

চিত্র : বারি তেতুঁল-১ (পাঁকা ফল)

বারি তেতুঁল-১ ঃ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ঝোপালো ও ছড়ানো। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং মার্চ মাসে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (৩২ গ্রাম)। শাঁস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭৫%)। খাদ্যেপযোগী অংশ ৫৩%। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় চাষযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমি তেঁতুল চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পরিস্কার করে নিলেই চলবে। সুনিষ্কাশিত যে কোন ধরনের জমিতেই (অম্ল মাটি থেকে শুরু করে লোনা মাটি) তেঁতুল চাষ করা যায় কারণ ইহা অত্যান্ত কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ।

জমি তৈরি ঃ বাণিজ্যিক ভাবে চাষ করতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিস্কার করে জমি তৈরি করতে হয়।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ সমতল ভূমিতে তেঁতুলের চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তেতুলের চারা রোপণ করা যায়। বারি তেঁতুল-১ এর ক্ষেত্রে ৮ মি. × ৮ মি.। চারা রোপণ করার জন্য ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. গর্ত করে প্রতি গর্তে ২০ কেজি পঁচা গোবর, ৩০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে ১০/১৫ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংখিত ফলনের জন্য প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি
১-৩	১০-১৫	১৫০-৩০০	১৫০-৩০০	৩০০-৫০০	বর্ষার আগে (ফল আহরণের পর পর) ও শেষে এবং শীতের পরে তিন কিস্তিতে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় গাছের গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা খালি রেখে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।
৪-৬	১৫-২০	৩০০-৫০০	৩০০-৫০০	৫০০-৭৫০	
৭-১০	২০-২৫	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৮০০-১০০০	
১১-১৫	২৫-৩০	৮০০-১০০০	৮০০-১০০০	১০০০-১২০০	
১৬ বা তদুর্ধ	৩০-৪০	১০০০-১২০০	১০০০-১২০০	১২০০-১৫০০	

পরিচর্যা ঃ মাদা তৈরি করার পর তাতে ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা ঠিক গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে এবং লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার গোড়ায় লাগানো মাটির বলটি কোনভাবেই ভেঙ্গে না যায়। লাগানোর পর হাত দিয়ে আলতো করে চারার গোড়ায় মাটি সুন্দরভাবে চারপাশে সমান করে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। তারপর সম্ভব হলে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গবাদিপশু চারাকে আক্রমণ করতে না পারে।

সুন্দর কাঠামোর জন্য গাছের গোড়া থেকে ১.৫ থেকে ২.০ মি. পর্যন্ত কোন ডালাপালা রাখা চলবে না। যেহেতু নতুন শাখায় বেশি ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তাই প্রতি বছর নিয়মিত কিছু শাখা প্রশাখা কেটে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। শীতকালই ডাল ছাটাইকরণের উপযুক্ত সময়। মাঝে মাঝে পুরাতন ও মরা ডাল কেটে দিতে হয়। গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিস্কার ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ এ পোকাটির কীড়া কচি ফলের ভিতরে ছিদ্র করে ফলের শাঁস খেয়ে থাকে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ফল কীড়াসহ ছিড়ে পুড়ে ফেলতে হবে অথবা মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে এবং ফল ধারণের পর পারফেকথিয়ন অথবা অন্য যেকোন কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হিসেবে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়া ও আশে পাশে সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে এবং মরা ডালপালা অপসারণ করতে হবে।

গুদামজাত অবস্থায় ও তেঁতুলে বিভিন্ন ধরনের পোকা (বিটল, উইভিল, সিড বোরার ইত্যাদি) আক্রমণ করে। গুদামজাত অবস্থায় এই ধরনের পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে গুদামে তেঁতুল রাখার পূর্বে অবশ্যই ভাল করে গুদাম/সংরক্ষণের স্থান পরিস্কার করে নিতে হবে এবং মাঝে মাঝে মিথাইল ব্রোমাইড দ্বারা ধুমায়িত করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ সাধারণত ঝাকি দিয়ে বা কোটার সাহায্যে ফল আহরণ করা হয়। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে সর্টিং এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিযুক্ত ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে অথবা ছোট বড় একসাথে মিশিয়ে প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয়।

ফলন ঃ ১৫-২০ টন/হেক্টর।

কদবেল

প্রযুক্তি ঃ কদবেল চাষ

কদবেল বা Elephant's foot apple (*Feronia limonia*) রুটাসি (Rutaceae) পরিবারভূক্ত একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশে একটি অতি পরিচিত ফল। কাঁচা ও পাকা কদবেল খাওয়া হয়। এ ছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পত্রমোচক বৃক্ষ কিন্তু পাতার গঠন বেল থেকে ভিন্ন। পাতার বোটায় পাখা থাকে। বাংলাদেশে বাগান আকারে কদবেলের চাষ না হলেও গ্রামের আনাচে কানাচে কদবেলের গাছ চোখে পড়ে। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে থাকে। ফল গোলাকার, আকারে টেনিস বলের ন্যায়, ত্বক খসখসে। শাঁস টক, সুগন্ধী এবং পাকার পরও শক্ত থাকে। কদবেল আহরণের সময় অন্যান্য ফল তেমন পাওয়া যায়না বিধায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং অমৌসুমে (Lean period) দেশী ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ সাধারণত বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয় বলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষকৃত জাতের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা চোখে পড়ে। স্বাদ, গন্ধ, আকার, আকৃতি ও ফলন ক্ষমতার দিক থেকে এদেশে কদবেলের বিভিন্ন বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। এসব জাত থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাউ কদবেল-১ নামে কদবেলের একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

চিত্র : কদবেল (পাঁকা ফল)

চিত্র : কদবেল গাছ

চিত্র : বাউ কদবেল-১

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমিতেও সফল ভাবে কদবেল চাষ করা যেতে পারে। পাহাড়ী এলাকা সহ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমালে বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড় কদবেল আবাদ করা যেতে পাড়ে। গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পরিস্কার করে নিলেই চলবে। পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে কদবেলের চাষ করা উচিত। কদবেল চাষের জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। এর শিকড় মাটির খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করে না তাই জমিতে পানির তল খুব বেশি নীচে থাকা ক্ষতিকর।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে কদবেল আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তম রূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২০০ থেকে ২৫০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ কদবেল গাছ বাগান আকারে করতে চাইলে বর্গাকার পদ্ধতি অনুসরণ করা ভাল। উঁচু নীচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বণ করা যেতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ (মে- জুলাই) মাস কদবেলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো চলে। বাগান আকারে কদবেলের চাষ করতে চাইলে ৬ মি. × ৬ মি. দুরত্বে এক

বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত। চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উঁইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নীচের ছকে দেয়া হলঃ

সারের নাম	***গাছের বয়স (বছর)***			
	১-৪	***৫-১০***	***১১-১৫***	***১৫ এর উর্দ্ধে***
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৪৫০-৬০০	৬০০-৭৫০	১০০০
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (ফল আহরণের পর) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে হবে । চারা রোপণের সময় মাটি নীচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় আচ্ছাদন বা মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়।

সাধারণভাবে কদবেলের চারা/কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোপণের পর গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের ছোট ছোট ডালপালা ছেটে দেয়া দরকার। গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিস্কার ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ এ পোকাটির কীড়া কচি ফলের ভিতরে ছিদ্র করে ফলের শাঁস খেয়ে থাকে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ফল কীড়াসহ ছিড়ে পুড়ে ফেলতে হবে অথবা মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে এবং ফল ছোট অবস্থায় প্রোক্লেম ৫ এসজি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করে এ কীটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। গাছের গোড়া ও আশে পাশে সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে এবং মরা ডালপালা অপসারণ করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকতে শুরু করে। আমাদের দেশে সাধারণত অপরিপক্ক ফল আহরণ করে কয়েকদিন রোদে রেখে পাকানো হয়। এতে ফলের কাঙ্খিত সাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না এবং অনেক ফল নষ্ট হয়। ফল পরিপক্ক হলে এর ত্বক ধুসর মলিন বর্ণ ধারণ করে এবং ফলের বোটা আলগা হয়ে যায়। সামান্য ঝাকুনিতেই ফল ঝরে পড়ে। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা উচিৎ নয়। এতে অনেক ফল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ফেটে নষ্ট হয়।

ফলন ঃ ১০-১২ টন/হেক্টর।

আঁশফল

প্রযুক্তি ঃ আঁশফল চাষ

আঁশফল বিদেশ প্রবর্তিত বাংলাদেশের একটি স্বল্প পরিচিত ফল । এ ফল দেখতে লিচুর মত হয়। কিন্তু লিচুর চেয়ে অনেক ছোট। ছোট আকারের হলেও এ ফল খেতে প্রায় লিচুর মত বা লিচুর চেয়ে বেশি মিষ্টি লাগে। আঁশফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও ভিটামিন 'সি' থাকে। এই ফলের শাঁস সাদা, কচকচে যা চকচকে কালো বীজকে আবৃত করে রাখে এবং এর শাঁস সহজেই বীজ থেকে আলাদা করা যায়। সাধারণত আগস্ট মাসের শেষার্ধ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আঁশফল আহরণ করা হয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে লিচুর স্বাদ গ্রহণ ও ফলের মৌসুম দীর্ঘায়িত করতে আঁশফল বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আঁশফলের বৈজ্ঞানিক নাম *Euphoria longana*। আঁশফল স্যাপিন্ডেসি (Sapindaceae) পরিবারভুক্ত একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। লিচু এ পরিবারের একটি ফল। এ পরিবারের আরোও একটি ফল আছে, তার নাম রাম্বুতান। সম্প্রতি আঁশফল, রাম্বুতান ফল দুটি বাংলাদেশে সাফল্যজনকভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি আঁশফল-১ এবং ভিয়েতনাম থেকে প্রবর্তিত জার্মপ্লাজম থেকে বারি আঁশফল-২ নামে আঁশফলের দু'টি উন্নত জাত বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের জন্য মুক্তায়ন করেছে। এ জাত দুটি প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয় এবং এদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

বারি আঁশফল-১ ঃ উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল ছোট (৩.৫ গ্রাম), গোলাকার, বাদামী রংয়ের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২০-২৫%)। খাদ্যেপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩-৪ টন।

বারি আঁশফল-২ ঃ উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ খাটো, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ মাসের শেষার্ধে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল তুলনামূলকভাবে বড় (৯.০ গ্রাম), বাদামী রংয়ের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৫%)। বীজ খুব ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যেপযোগী অংশ ৭৩%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ৮-১০ টন।

চিত্র : বারি আঁশফল-১

চিত্র : বারি আঁশফল-২

উৎপাদন প্রযুক্তিঃ

আবহাওয়া ঃ আঁশফল প্রধানত অবগ্রীষ্ম মন্ডলের ফল। তবে এর বাণিজ্যিক চাষ গ্রীষ্ম মন্ডল পর্যন্ত বিসতৃত। আঁশফল উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল পছন্দ করে। হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রায় গাছ মারা যায়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৫৫০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে আঁশফল জন্মে। আঁশফলের জন্য বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২০-২৫°সে. সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ২৫°সে. এর উপরে হ'লে ফলের বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর।

জমির ও মাটির বর্ণনা ঃ প্রায় সবধরনের মাটিতেই আঁশফল চাষ করা যায়। তবে উর্বর সুনিষ্কাশিত গভীর দোঁ-আশ মাটি আঁশফল চাষের জন্য উত্তম। ফল ধারণ থেকে ফলের পরিপক্কতা পর্যন্ত মাটিতে প্রচুর আদ্রতা প্রয়োজন।

জমি তৈরি ঃ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করে চাষ ও মই দিয়ে এবং দীর্ঘজীবি আগাছা সমূলে অপসারণ করে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২৫০ থেকে ৩০০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার বা ষড়ভূজি পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নীচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই আঁশফলের চারা/কলম রোপণ করা চলে। বাগান আকারে আঁশ ফলের চাষ করতে চাইলে ৫ মি. × ৫ মি. দুরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে নির্ধারিত দূরত্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলন পেতে হ'লে আঁশফলে নিয়মিত সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হল।

গাছের বয়স	*জৈব সার (কেজি)*	*ইউরিয়া (গ্রাম)*	*টিএসপি (গ্রাম)*	*এমওপি (গ্রাম)*	*জিপসাম (গ্রাম)*
১-২ বছর	৫-১০	১৫০-২৫০	১৫০	১৫০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	১০০
৫-৬ বছর	১৫-২০	৫০০-৬০০	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০	২০০
৭-১০ বছর	২০-২৫	৭৫০-১০০০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৩০০
১১ বছর বা তদুর্ধ	২৫-৩০	১০০০-১২০০	৭৫০-৯০০	৭৫০-৯০০	৪০০

উল্লিখিত সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল সংগ্রহের পর ১ম বার, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুকুল আসার সময় ২য় বার এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজের রং ধারণ পর্যায়ে ৩য় বার সার প্রয়োগ করতে হয়।

পরিচর্যা ঃ গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটি খাড়াভাবে রোপণ করে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিস্কার ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

আঁশফলে তেমন কোন পোকা-মাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ হতে দেখা যায় না। তবে ফলের পরিপক্ক পর্যায়ে পাখি (ফিঙ্গে, দোয়েল) ও বাদুর ফল খেয়ে প্রচুর ফল নষ্ট করে ফেলে। তাই প্রত্যেক গাছ আলাদাভাবে বা সম্পূর্ণ বাগানে নাইলন নেট দিয়ে আবৃত করে ফল রক্ষা করা যায়।

কাল পিঁপড়া ঃ এ ফল বেশি মিষ্টি বিধায় গাছে থাকা অবস্থায় কাল পিপড়া বীজ ও খোসা বাদ দিয়ে ফলের সমস্ত শাঁস খেয়ে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা ঃ বাগানের আশে পাশে পিপড়ার বাসা থাকলে তা ধবংস করে ফেলতে হবে। সেজন্য মাটিতে ডারসবান ২০ ইসি @ ২ মিলি লিটার বা লরসবান ১৫ জি ৫ গ্রাম/লিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে গাছে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি বা ডারসবান ২০ ইসি ১.৫ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে অবশ্যই কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ) মাসে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র (আগস্ট) মাসে ফল পাকে। সম্পূর্ণ পাকার পর ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আবার ফল বেশি পেকে গেলে গাছ থেকে ঝরে পড়ে ও ফেটে যায় যা গাছের ফলনকে মারাত্বকভাবে ব্যাহত করে। তাই সময়মতো ফল সংগ্রহ আঁশফলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফলন ঃ ৫-১০ টন/হেক্টর।

করমচা

প্রযুক্তি ঃ করমচা চাষ

করমচা ছোট অথচ আকর্ষণীয় একটি দেশী ফল। Apocynaceae পরিবারভুক্ত ফলটির ইংরেজি নাম Karanda এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Carissa carandas* । এটি Apocynaceae পরিবারভূক্ত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। খুব একটা সুস্বাদু না হলেও ফলটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এ ফলটি কমবেশি দেখা যায়। টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী এলাকায় করমচার গাছ বেশি দেখা যায়। ফল খাওয়ার জন্য সাধারণত বাড়ীর আনাচে কানাচে অথবা ফল বাগানে দু একটি গাছ লাগানো হয়। তা ছাড়া বাগান অথবা বাড়ীর চারদিকে বেড়া হিসাবে ব্যবহারের জন্যও এ গাছ লাগানো হয়। এর গাছে কাঁটা থাকার দরুণ এ গাছ বাগানের বেড়া হিসাবে খুব কাজে আসে। যত্ন করলে বেড়ার গাছ হতেও ফল পাওয়া যায়। ফলটি খাদ্যগুণে ভরপুর। করমচা থেকে পাওয়া যায় প্রচুর ভিটামিন সি, পটাশ, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। কাঁচা করমচা গায়ের ত্বক ও রক্তনালী শক্ত ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। পাতা গরম পানিতে সেদ্ধ করে পান করলে পালাজ্বর নিরাময়ে উপকার পাওয়া যায়। শিকড়ের রস গায়ের চুলকানি ও কৃমি দমনে সাহায্য করে। পাকা ফল জেলী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : করমচা গাছ

চিত্র : কালো করমচা

চিত্র : লাল করমচা

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াতে করমচা ভাল হয়। এর গাছ বেশ অনাবৃষ্টি সহ্য করতে পারে। কারও কারও মতে ইহা সমতল ভূমিতে ভাল হয়। উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে ইহা ভাল হয় না। সুনিষ্কাশিত যে কোন ধরনের জমিতেই (অম্ল মাটি থেকে শুরু করে লোনা মাটি) করমচা চাষ করা যায় কারণ ইহা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত গভীর দো-আঁশ মাটিতে ইহা সবচেয়ে ভাল হয়।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পরিস্কার করে নিলেই চলবে।

অনুমোদিত জাত ঃ বাংলাদেশে করমচার কোন অনুমোদিত জাত নেই। ফলের রঙ্গের বিভিন্নতা হিসাবে করমচাকে সাধারণত: তিনজাতে ভাগ করা হয়। যেমন (১) সবুজ, (২) বেগুনি ও (৩) সাদা। একমাত্র ফলের রং ছাড়া একজাত হতে অন্য জাতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বেশিরভাগ করমচাই টক তবে মিষ্টি স্বাদের করমচাও আছে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ৬২৫-৬৫০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ বাণিজ্যিক ভাবে করমচা সারি করে বা বর্গাকার পদ্ধতিতে লাগাতে হয়। সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দুরত্ব ৪ মিটার দেয়া যেতে পারে। চারা রোপণ করার জন্য ৫০ সেমি × ৫০ সেমি × ৫০ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০ কেজি পঁচা গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করে ১০/১৫ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিত ভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩	১০	৩০০	৩০০	১৫০
৪-৬	১৫	৪৫০	৪০০	৩০০
৭ বা তদুর্ধ	২০	৬০০	৫০০	৪৫০

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় গাছের গোড়া থেকে ০.৫ মিটার জায়গা খালি রেখে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ গর্ত তৈরি করার পর তাতে ১০-১৫ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা ঠিক গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে এবং লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার গোড়ায় লাগানো মাটির বলটি কোনভাবেই ভেঙ্গে না যায়। লাগানোর পর হাত দিয়ে আলতো করে চারার গোড়ায় মাটি সুন্দরভাবে চারপাশে সমান করে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেধে দিতে হবে যাতে চারাটি বা কলমটি হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। তারপর সম্ভব হলে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

করমচা গাছ ঝোপালো প্রকৃতির এবং প্রচুর ফল দেয় বিধায় গাছের যে সমস্ত শাখা প্রশাখা নিচের দিকে মাটির সাথে হেলে পড়ে সেগুলো খুঁটির সাহায্যে উপরে উঠিয়ে বেধে দিতে হবে। ঝড় বাতাস যাতে গাছের উপড়িয়ে ফেলতে না পারে সেজন্য শক্ত খুঁটি দিয়ে গাছ ভালভাবে বেধে দিতে হবে।

ডাল ছাটাইকরণ ঃ বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই করমচার চারা বা কলম ঝোপালো হয়। কাটা সমৃদ্ধ গাছ বিধায় এর গোড়ায় পরিচর্যা করা কঠিন। সুন্দর কাঠামোর জন্য গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৫০ সেমি পর্যন্ত সমস্ত ডালা পালা সব সময় কেটে রাখতে হয়। শীতকালই ডাল ছাটাইকরণের উপযুক্ত সময়। মাঝে মাঝে পুরাতন ও মরা ডাল কেটে দিতে হয়।

আগাছা/মালচিং এর সংখ্যা ঃ গাছের গোড়ার আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানো গাছের গোড়ার আগাছা কেটে পরিস্কার রাখতে হবে।

সেচের সংখ্যা এবং সময়কাল ঃ চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে সেচ দেয়া প্রয়োজন।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

করমচায় খুব একটা মারাত্বক রোগবালাই সাধারণত দেখা যায়না। তবে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। কীটনাশক যেমন ফেনফেন ২০ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি) স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ সাধারণত শীতের শেষে ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে। ডাল ও তরকারীতে দিয়ে খাবার জন্য এবং চাটনী তৈরি করে ব্যবহার করার জন্য সাধারণত গাছ হতে কাঁচা ফল পাড়া হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস হতে ফল পাড়ার উপযুক্ত হয়। সব ফল একসাথে পাকেনা তাই পাকা ফল দেখে সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার পর ভাল এবং খারাপ (বাজার জাতকরণের অনুপযোগী) ফল পৃথক করে ভাল ফলগুলো কাগজের বাক্সে অথবা বাঁশ বা কাঠের তৈরি বাক্সে করে বাজারজাত করতে হবে।

ফলন ঃ একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে প্রতি মৌসুমে ২০-৩০ কেজি ফল আহরণ করা যায়।

চালতা

প্রযুক্তি ঃ চালতা চাষ

বাংলাদেশে ও তার আশে পাশের এলাকায় যে কয়েকটি ফলের উৎপত্তি হয়েছে চালতা তার অন্যতম। গাছ মাঝারী আকারের চির সবুজ। দেশের সর্বত্রই বুনো গাছ হিসাবে এটি জন্মে থাকে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট এলাকায় চালতা বেশি হয়। চালতা বেশ টক হওয়ায় ফল হিসেবে এটি খাওয়া হয় না, তবে আচার, চাটনী ও অন্যান্য সংরক্ষিত খাদ্য হিসাবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ফল। কচি অবস্থায় সবজি হিসেবেও চালতা ব্যবহৃত হয়। চালতা Dilleniaceae পরিবারভূক্ত একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dillenia indica.* ফলটি খাদ্যগুণে ভরপুর। খাবার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম চালতায় ০.৮ গ্রাম আমিষ, ১৩.৪ গ্রাম শ্বেতসার, ০.২ গ্রাম চর্বি, ০.৮ গ্রাম খনিজ লবণ, ১৬ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম ও ৫৯ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। পুষ্টিমানের পাশাপাশি চালতা ঔষধি গুনেও অনন্য। কচি ফল পেটের গ্যাস, কফ, বাত ও পিত্তনাশক হিসাবে কাজ করে। পাকা ফলের রস চিনিসহ পান করলে সর্দিজ্বর উপশম হয়।

চিত্র : চালতা ফুল

চিত্র : গাছে ধরন্ত চালতা

চিত্র : চালতা ফল ও বীজ

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ প্রায় সবধরনের মাটিতেই চালতার চাষ করা যায়। ইহা উর্বর ও আদ্র ভূমিতে ভালভাবে জন্মে থাকে। তবে সামান্য অম্ল মাটিতে চালতা ভাল হয়। চালতার গাছ বিনা যত্নেই ভাল ভাবে বেচে থাকে। সাময়িক জলাবদ্ধতা এর তেমন ক্ষতি করেনা।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে চালতা চাষ করতে হলে সুনিস্কাশিত উচু ও মাঝারী উচু জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি পর্যায়ক্রমিকভাবে চাষ ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। উঁচু টিলা ও পাহাড়ী এলাকায় চাষ করার জন্য টিলা/পাহাড়ের ডালে স্ট্রিপ বা বেড আকারে জমি তৈরি করে নিতে হবে।

জাত ঃ বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে চালতার চাষ হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে চালতার কোন অনুমোদিত জাত নেই। চাষকৃত জাতগুলোর মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যেগুলো থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবন সম্ভব।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২০০-২৫০ টি। সমতল ভূমিতে চালতার চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে নির্বাচিত জমিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দুরত্ব ৭ মিটার দেয়া যেতে পারে। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মি. × ৭ মি. দূরত্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। মাদা ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর প্রয়োজনমত পানি, বাঁশের খুটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিত ভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
১-৩	২০	২৫০	২০০	২৫০
৪-৬	২৫	৩৫০	৩০০	৩৫০
৭ বা তদুর্ধ	৩০	৫০০	৪০০	৫০০

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় গাছের গোড়া থেকে ০.৭৫ মিটার জায়গা খালি রেখে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

ডাল ছাটাইকরণ ঃ বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই চালতার চারা বা কলম ডালপালা কম হয়। তবে গাছের গোড়া হতে যদি ডাল পালা বের হলে তা কেটে দেয়া উচিৎ। সুন্দর কাঠামোর জন্য গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৫০ সেমি পর্যন্ত সমস্ত ডালা পালা সব সময় কেটে রাখতে হয়। ফল সংগ্রহের পর পর রোগ বালাই ও পোকামাকড় আক্রান্ত এবং মরা ডালপালা ছেটে পরিস্কার করতে হবে। চারা গাছের উচ্চতা ৫ ফুটের অধিক হলে তার আগা ভেঙ্গে দিলে গাছের বিস্তার সুন্দর হয়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ নিয়মিত গাছের গোড়ার আগাছা পরিস্কার করতে হবে, খরা মৌসুমে গাছের কান্ডে ১ মিটার দুর থেকে শুরু করে ক্যানোপীর ছায়া পর্যন্ত হালকা কুপিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঘনঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা মৌসুমে ২/৩ বার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ফল ধরার পর প্রয়োজনমত সেচ দেয়া ভাল। বর্ষা মৌসুমে প্রয়োজনীয় নালা তৈরি করে গাছের গোড়ার অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

চালতাতে রোগবালাই খুব একটা দেখা যায়না। কচি পাতা খেকো পোকা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। এদের দমন করার জন্য আক্রান্ত গাছে সুমিথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির পর যখন হালকা হলুদ কিংবা ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণের হতে থাকে তখন ফল সংগ্রহ করতে হবে। আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসে পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত নষ্ট হওয়া ও পোকামাকড় আক্রান্ত ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভালমানের ফলগুলো মুছে পরিস্কার করে হালকা রোদে অল্পক্ষণ ছড়িয়ে রেখে পরবর্তীতে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলন ঃ ৮-১০ বছরের চালতা গাছ থেকে ২৫০-৩০০ টি ফল সংগ্রহ করা যায়। পূর্ন বয়স্ক গাছের ফলন ১৫০-২০০ কেজি।

কাউ ফল

প্রযুক্তি ঃ কাউ ফল চাষ

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুলবর্তী জেলা সমুহে যে কয়েকটি ফলের উৎপত্তি হয়েছে কাউ তার অন্যতম। গাছ মাঝারী আকারের চির সবুজ এবং পাতা কচি অবস্থায় লালচে। ফলের ত্বক পুরু ও শাঁস হলুদ। দেশের সর্বত্রই বুনো গাছ হিসাবে এটি জন্মে থাকে। বরিশাল, চাদপুর, খুলনা, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা এলাকায় কাউ ফল বেশি হয়। তবে কাউ একটি বুনো ফল। ফলের ত্বক পুরু ও শাঁস হলুদ। ফলের শাঁসের পরিমাণ কম কিন্তু শাঁসে এক ধরনের সুগন্ধ আছে। ফল টক ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয়। কাউ ফলের স্বাদ টক মিষ্টি ফলে মহিলা ও শিশুদের নিকট বেশ পছন্দনীয়। কাউ ফল দিয়ে আচার, চাটনী ও অন্যান্য সংরক্ষিত খাদ্য উৎপাদনের ব্যপক সম্ভাবনা রয়েছে। কাউ Clusiaceae পরিবারভূক্ত একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Garcinia cowa.* ফলটি খাদ্যগুণে ভরপুর। খাবার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কাউ ফলে ০.৮ গ্রাম আমিষ, ১৩.৪ গ্রাম শ্বেতসার, ০.২ গ্রাম চর্বি, ০.৮ গ্রাম খনিজ লবণ, ১৬ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম ও ৫৯ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। পুষ্টিমানের পাশাপাশি চালতা ঔষধি গুনেও অনন্য। কচি ফল পেটের গ্যাস, কফ, বাত ও পিত্তনাশক হিসাবে কাজ করে। পাকা ফলের রস চিনিসহ পান করলে সর্দিজ্বর উপশম হয়।

চিত্র : কাউফল গাছ

চিত্র : কাউফল

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ প্রায় সবধরনের মাটিতেই কাউ ফল চাষ করা যায়। ইহা উর্বর ও আদ্র ভূমিতে ভালভাবে জন্মে থাকে। তবে সামান্য অম্ল মাটিতে কাউ ফল ভাল হয়। কাউ এর গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ও জলাবদ্ধাতায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। প্রায় সবধরনের মাটিতেই কাউ ফল চাষ করা যায়। তবে সামান্য অম্ল মাটিতে চালতা ভাল হয়।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে কাউ ফলের চাষ করতে হলে পর্যায়ক্রমিকভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমিকে সমান করে নিতে হবে। উঁচু টিলা ও পাহাড়ী এলাকায় চাষ করার জন্য টিলা/পাহাড়ের ডালে স্ট্রিপ বা বেড আকারে জমি তৈরি করে নিতে হবে।

অনুমোদিত জাত ঃ বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে বিশেষ করে উপকুলীয় এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কাউ ফলের চাষ হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে কাউ ফলের কোন অনুমোদিত জাত নেই। চাষকৃত জাতগুলোর মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যেগুলো থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবন সম্ভব।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২০০-২৫০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ সমতল ভূমিতে কাউ ফলের চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে নির্বাচিত জমিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দুরত্ব ৭ মিটার দেয়া যেতে পারে। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মি. × ৭ মি. দূরত্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার

ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। মাদা ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর প্রয়োজনমত পানি, বাঁশের খুটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিত ভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
১-৩	২০	২০০	২৫০	১৫০
৪-৬	২৫	৩০০	৩০০	২৫০
৭ বা তদুর্ধ	৩০	৪০০	৪০০	৩০০

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বর্ষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় গাছের গোড়া থেকে ০.৭৫ মিটার জায়গা খালি রেখে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

ডাল ছাটাইকরণ ঃ বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই কাউ ফলের চারার গোড়ার দিকে বেশ ডালপালা হয়। ফলে সুন্দর কাঠামোর জন্য গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৫০ সেমি পর্যন্ত সমস্ত ডালা পালা সব সময় কেটে রাখতে হয়। ফল সংগ্রহের পর পর রোগ বালাই ও পোকামাকড় আক্রান্ত এবং মরা ডালপালা ছেটে পরিস্কার করতে হবে। চারা গাছের উচ্চতা ৪-৫ ফুটের অধিক হলে তার আগা ভেঙ্গে দিলে গাছের বিস্তার সুন্দর হয়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ নিয়মিত গাছের গোড়ার আগাছা পরিস্কার করতে হবে, খরা মৌসুমে গাছের কান্ডে ১ মিটার দুর থেকে শুরু করে ক্যানোপীর ছায়া পর্যন্ত হালকা কুপিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর পানির অভাব হলে ঘনঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা মৌসুমে ২/৩ বার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ফল ধরার পর প্রয়োজনমত সেচ দেয়া ভাল। বর্ষা মৌসুমে প্রয়োজনীয় নালা তৈরি করে গাছের গোড়ার অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ চালতাতে রোগবালাই খুব একটা দেখা যায়না। কচি পাতা খেকো পোকা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। এদের দমন করার জন্য আক্রান্ত গাছে সুমিথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির পর যখন হালকা হলুদ কিংবা ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণের হতে থাকে তখন ফল সংগ্রহ করতে হবে। শীতের শেষে ফুল ফুটে ও বর্ষাকালে ফল পাকে। পাকা অবস্থায় ফল হলুদ হয়।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত নষ্ট হওয়া ও পোকামাকড় আক্রান্ত ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভালমানের ফলগুলো মুছে পরিস্কার করে হালকা রোদে অল্পক্ষণ ছড়িয়ে রেখে পরবর্তীতে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

তাল

প্রযুক্তি ঃ তাল চাষ

তাল বা Palmyra Palm (*Borumus flabellefer*) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পাম। তাল একটি সুদৃশ্য উদ্ভিদ, কেউ কেউ কেবলমাত্র শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে তাল গাছ লাগিয়ে থাকেন। এর চাষ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। এ এলাকাতেই এর উৎপত্তি স্থান। তাল একটি বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী বৃক্ষ। ছোট অবস্থায় তাল গাছের পাতা পাখা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এর ফল যথেষ্ট পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং কচি ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া হয়। প্রতিটি তাল গাছ থেকে বছরে ৫০০-৬০০ লিটার রস পাওয়া যায়। রস থেকে গুড়, চিনি, মিসরি, মদ (তাড়ি) ইত্যাদি তৈরি করা যায়। তাল গাছের কাঠ খুবই উন্নতমানের ও দীর্ঘস্থায়ী। ঘরের খুটি ও বীম দেয়ার কাজে প্রাচীন কাল থেকেই তাল কাঠ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়া তালের নৌকা এখনও কিছু কিছু এলাকায় চোখে পড়ে। বিগত কয়েক দশকে আমাদের দেশে যে পরিমাণ তাল গাছ কাটা হয়েছে তার শত ভাগের একভাগও রোপণ করা হয়নি। বাংলাদেশের সব এলাকায় কম বেশি তাল গাছ চোখে পড়লেও ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় অধিক হারে তালের চাষ হয়। তাল গাছে আরোহণ ও রস সংগ্রহে দক্ষ লোকের অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। তালের ভক্ষণযোগ্য উপাদান হচ্ছে কচি তালের বীজের শাঁস, পাকা ফলের শাঁস ও রস। কচি তালের শাঁসের প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। পাকা তালের শাঁসও শ্বেতাসার ও অন্যান্য পুষ্টি সমৃদ্ধ। তালের রসে ১২% চিনি থাকে যা থেকে গুড় ও তাল মিসরি তৈরি করা হয়। তালের রস শ্লেষ্মানাশক, মূত্র বৃদ্ধি করে, প্রদাহ ও কুষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে। রস থেকে তৈরি তাল মিসরি সর্দি কাশির মহৌষধ, যকৃতের দোষ নিবারক ও পিত্তনাশক।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশে তালের কোন অনুমোদিত জাত নেই। তবে দুই ধরণের তাল পাওয়া যায়।

মোষে তাল ঃ এ জাতীয় তাল মিশমিশে কাল বর্ণের, আকারে বড় (২-৩ কেজি) ও নাবী। বীজ ছোট, শাঁস রসালো এবং শাঁসে তিতাভাব কম। এ জাত পিঠা তৈরির জন্য অধিক উপযোগী। বাজারে এ তালের চাহিদা ও দাম তুলনামূলকভাবে বেশি।

খুদী তাল ঃ এ জাতীয় তালের বর্ণ বাদামী ও হলুদাভ সবুজের মিশ্রণ সম্বলিত। ফল আগাম, আকারে ছোট (১-২ কেজি), বীজ বড় ও শাঁসের পরিমাণ কম। শাঁস তিতাভাব সম্পন্ন। রস উৎপাদন ও কচি ফল তাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য উত্তম।

চিত্র : তাল গাছ

চিত্র : তাল ফল

চিত্র : পাকা তাল

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ তাল নিরক্ষীয় ও উপ-নিরক্ষীয় এলাকার জলবায়ুর উপযোগী। এরা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ও বিনা যত্নে ভাল ফলন দিতে সক্ষম। খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ত মাটি প্রভৃতি সব অবস্থায়ই তাল গাছ টিকে থাকতে পারে। প্রচন্ড ঝড়েও তাল গাছ তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং সহসা ভেঙ্গে পড়েনা। উপকুলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরির কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাল গাছ রোপণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। যে কোন ধরনের মাটিতে ইহা জন্মানো যায়।

জমি তৈরি ঃ যে কোন ধরনের মাটিতেই বিনা যত্নে সাফল্যজনকভাবে তাল উৎপাদিত হয়। তাই যে জমিতে অন্য ফসল করা কঠিন, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার, বাড়ীর পেছন দিক প্রভৃতি জায়গা তাল গাছ লাগানোর জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। জমি তেমনভাবে তৈরি করার প্রয়োজন পড়েনা।

বংশ বিস্তার ঃ বীজ দিয়ে তালের বংশবিস্তার করা হয়। বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বেশি দিন থাকেনা। তাই ফল থেকে আলাদা করার পর দ্রুত বীজ বপনের ব্যবস্থা করা উত্তম। তালের চারার রোপণজনিত কারণে মৃত্যুর হার অধিক হওয়ায় নির্ধারিত স্থানে বীজ রোপন করা উত্তম। সাধারণত ১০ বছর বয়সের পূর্বে গাছে ফুল আসেনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল আসতে ১৫ বছর লেগে যায়। ফুল দেয়ার পুর্বে গাছ পুরুষ কি স্ত্রী তা বুঝার উপায় নেই।

চারা/ফলনের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ৪০০-৫০০ টি।

চারা রোপন পরিচয় ঃ সমভূমিতে বর্গাকার বা আয়তকার পদ্ধতি এবং রাস্তার ধার, পুকুর পাড় বা বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সারিতে গাছ লাগানো যেতে পারে। তালের বীজ রিকালসিটেন্ট ধরনের হওয়ায় বেশিদিন সংরক্ষন করা যায়না। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল আহরণ মৌসুমে বীজ সংগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দুরত্ব ৫ মিটার দেয়া যেতে পারে। বীজ রোপণের ৮-১০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৫-৬ মিটার দূরত্বে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি পঁচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এর ৮-১০ দিন পর গর্তের ঠিক মাঝখানে একটি করে বীজ মাটির ১০-১৫ সে.মি. গভীরে রোপণ করতে হবে। উই পোকার আক্রমণের আশংকা থাকলে রোপণের সময় গর্তে ডার্সবান, ফুরাডান বা অন্য কোন দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর পর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এর গোড়ার চারদিক সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিত ভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

সারের নাম	***গাছের বয়স (বছর)***			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	১০	১৫	২০	৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৩০০-৪৫০	৪৫০-৬০০	৭৫০
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৩০০-৪৫০	৪৫০-৬০০	৭৫০

উল্লিখিত সার সমান দুই কিস্তিতে বর্ষা মৌসুমের প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে (ফল আহরণের পর) প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঘনঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা মৌসুমে ২/৩ বার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ফল ধরার পর প্রয়োজনমত সেচ দেয়া ভাল। বর্ষা মৌসুমে প্রয়োজনীয় নালা তৈরি করে গাছের গোড়ার অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ তাল গাছে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের তেমন কোন উপদ্রব দেখা যায় না।

রস সংগ্রহ ঃ তাল একটি ডায়োসিয়াস উদ্ভিদ, পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। পুরুষ গাছে ফল না হলেও রস স্ত্রী গাছের তুলনায় রস বেশি হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ধরনের গাছে পুষ্পমঞ্জরী আসে। রস সংগ্রহের জন্য খোলার পূর্বে পুষ্পমঞ্জরী (Spathe) রশি দিয়ে বেঁধে কয়েকদিন কাঠের হাতুড়ী দিয়ে পেটাতে হয়। তারপর এর অগ্রভাগ কেটে দিলে রস বেরুতে শুরু করে। প্রতিদিন ইহা একটু একটু করে কাটতে হয়। এ কাজে প্রচুর দক্ষতার প্রয়োজন। প্রতিটি পুষ্পমঞ্জরী দিনে গড়ে ২ লিটার রস দিয়ে থাকে। একটি গাছ থেকে একই সময়ে ৮-১০ টি পুষ্পমঞ্জরী থেকে রস নেয়া যায়। প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ৫০০-৬০০ লিটার রস পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ তালের ফলও ভক্ষণযোগ্য। কচি ফলের বীজের নরম ও সাদা শাঁস মিষ্টি ও সুস্বাদু। ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে এটি একটি আদৃত খাদ্য বস্তু। প্রতিটি ফলে ২-৩ টি বীজ থাকে। তাল বীজের নরম শাঁস খেতে হলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে কচি তাল আহরণ করতে হবে। পরিপক্কতা লাভের সাথে সাথে বীজ শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ফলের খোসা (Pericarp) মিষ্টি রসে পূর্ণ হয়ে উঠে। খোসা থেকে চাপ দিয়ে রস বের করে ইহা দিয়ে পিঠা তৈরি করে বা অন্যভাবে খাওয়া হয়। পাকা তাল আপনা আপনিই গাছের নীচে ঝড়ে পড়ে।

ফলন ঃ প্রতিটি স্ত্রী গাছে বছরে ২০০-৩০০ টি ফল হয়।

বেল

প্রযুক্তি ঃ বেল চাষ

বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দেশী ফল গুলোর মধ্যে বেল অন্যতম। বেলের বৈজ্ঞানিক নাম *Aegle marmelos* (L.) Corr. ইহা Rutaceae পরিবারের উদ্ভিদ। উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের মতে পাক ভারত বেলের আদি অবস্থান। বেলের গাছ একটি বৃহদাকার পত্রমোচক, কাঁটাময় বৃক্ষ যা ৬-৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ফুল সুগন্ধী ও পর-পরাগায়িত। বাংলাদেশে সাধারণত বাগান আকারে বেল চাষ করা হয়না। বেল একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ক্যালসিয়াম ও লৌহ রয়েছে। এর প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য শাঁসে ৬২.৫% পানি, ১.৮ গ্রাম আমিষ, ৩১.৮ গ্রাম শ্বেতসার, ০.৩৯ গ্রাম স্নেহ, ৮৭ কিলোক্যালোরী খাদ্যশক্তি, ৫৫ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন, ০.১৩ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ১.১৯ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লেবিন, ১.১ মিলিগ্রাম নায়াসিন, ৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৩৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.৭ মিলিগ্রাম খনিজ ও ০.৬ মিলিগ্রাম লৌহ আছে। অন্য কোন ফলে এত বেশি পরিমাণ রাইবোফ্লেবিন পাওয়া যায়না। পাকা ফল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং কাঁচা ফল কলেরা ও আমাশয়ে উপকারক। আধাপাকা, সিদ্ধ ফল আমাশয়ে অধিক কার্যকরী। বেলের পাতা ও ছাল দিয়ে কবিরাজী ঔষধ তৈরি হয়।

জাত ঃ বাংলাদেশে বেলের কোন অনুমোদিত জাত নেই।

চিত্র : বেল গাছ

চিত্র : বেল ফল

চিত্র : পাকা বেল

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ বেল খুবই কষ্ট সহিষ্ণু গাছ। নিরক্ষীয় ও উপ-নিরক্ষীয় উভয় এলাকাতেই এর চাষ হচ্ছে।

সাধারণতভাবে বেলের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ প্রয়োজন। পত্রমোচক বলে নিম্ন তাপমাত্রায় ইহা সহজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। সুনিষ্কাশিত হলে যে কোন রকমের মাটিতে বেল চাষ করা যায়। যে কোন ধরনের মাটিতে ইহা জন্মানো যায়। এমনকি জলাবদ্ধ অম্ল-ক্ষারীয় (pH ৫-১০) এবং কংকরময় মাটিতেও বেল জন্মানো সম্ভব। কর্দমাক্ত মাটি যেখানে অন্যান্য ফসল জন্মানো যায় না সেখানেও বেলের গাছ জন্মানো সম্ভব।

জমি তৈরি ঃ পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে বেলের চাষ করা উচিত। বেল চাষের জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। এর শিকড় মাটির খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করে না তাই জমিতে পানির তল খুব বেশি নীচে থাকা ক্ষতিকর। বাগান আকারে বেল আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উওম রুপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

বংশবিস্তার ঃ যৌন ও অযৌন দুই পদ্ধতিতেই বেলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব। বাংলাদেশে সাধারণত বীজ দিয়েই বেলের বংশবিস্তার করা হয়। পর-পরাগায়িত বলে বীজের গাছে মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে না। এজন্য উৎকৃষ্ট জাতের চারা উৎপাদন করতে চাইলে গুটি কলম অথবা কুঁড়ি সংযোজন/জোড় কলম পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বেলের শিকড় থেকে ফেকড়ী (sucker) বের হয়, এগুলি থেকেও নতুন গাছ জন্মানো সম্ভব। জুন-জুলাই মাসে ১ বা ২ বছরের চারা আদিজোড় হিসাবে ব্যবহার করে এর উপর তালি কলম (Patch budding) অথবা ভিনিয়ার/ফাটল কলমের মাধ্যমে সফলভাবে বংশবিস্তার করা যায়।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টর প্রতি ১৫০-২০০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ বেল গাছ বাগান আকারে করতে চাইলে বর্গাকার পদ্ধতি অনুসরণ করা ভাল। বর্ষাকাল (জুন -জুলাই মাস) বেলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। বাগান আকারে বেলের চাষ করতে চাইলে ৮ × ৮ মিটার দূরত্বে এক বছর বয়সী চারা রোপণ করা উচিত।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই মাদা তৈরি করতে হয়। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ৪০০-৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০০ গ্রাম খৈল গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুঁড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উঁইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নীচের ছকে দেয়া হলঃ

সারের নাম	*গাছের বয়স (বছর)*			
	১-৪	*৫-১০*	*১১-১৫*	*১৫ এর উর্দ্ধে*
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৪৫০-৭৫০	৭৫০-১০০০	১০০০-১২০০
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৩০০-৪৫০	৬০০-৯০০	৯০০-১২০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৩০০-৪৫০	৪৫০-৬০০	৭৫০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ–ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের সময় মাটি নীচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় আচ্ছাদন বা মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ ঃ রোপণের পর গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫ টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। প্রতি বছর শীতের শেষে বেল গাছের পাতা ঝরে যায় এবং সে সময় ফল পাকা শেষ হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে পরে গাছের ছোট ছোট ডালপালা ছেটে দেয়া দরকার। গাছের চারদিকে গাছের শিকড় হতে যথেষ্ট চারা বের হয়। সেসব চারাগুলোকে বাড়তে না দিয়ে সময়মত কেটে ফেলা উচিত।

আগাছা/মালচিং ব্যবস্থাপনা ঃ চারা গজানোর পর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এর গোড়ার চারদিক সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ শুকনা মৌসুমে গাছ সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বেল গাছে ফুল আসে। এসময়ে সেচ দিলে ফলধারণ বৃদ্ধি পায় এবং গুটি ঝরা হ্রাস পায়। বর্ষাকালে জমিতে যাতে পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

টপ ওয়ার্কিং ঃ অনাকাংখিত ও নিম্নমানের বেলগাছকেও টপ ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও ফলনশীল সজীব (vigorous) গাছে রূপান্তর করা যায়। এজন্য বেল গাছকে ১.০-১.৫ মি. উচ্চতায় মার্চ মাসে প্রুনিং করতে হবে। এ থেকে নতুন কুঁড়ি বের হলে কয়েকটি সুস্থ ও মজবুত কুঁড়ি রেখে বাকীগুলি কেটে ফেলতে হবে। জুন, জুলাই মাসে উক্ত কুশিতে কাঙ্ক্ষিত গাছ থেকে সায়ন/উপজোড় নিয়ে তালি/ভিনিয়ার/ফাটল কলমের মাধ্যমে অনুন্নত গাছকে উন্নত গাছে রূপান্তর করা যায়।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

বেলে তেমন কোন মারাত্মক রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় না। তবে পাইরালিড নামক মথের দ্বারা ফল আক্রান্ত হয়। এ পোকার কীড়া কচি ফলের ভিতর ছিদ্র করে ঢুকে এর শাঁস খায়।

প্রতিকারঃ এ পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক (রিপকর্ড/সিমবুশ/সুমিসাইডিন/ডেসিস/অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে শেষ স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ বীজ থেকে গাছ লাগালে ফল ধরতে ৭-৮ বছর সময় লাগে অপরদিকে কলমকৃত গাছে বেল আসতে সময় লাগে ৪-৫ বছর। ফুল ধরার সময় থেকে ফল পাকতে প্রায় এক বছর লাগে। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল আসে এবং পরের বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফল পাকে। ফল সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাটিতে পড়ে ফল ফেটে না যায়। গাছের নীচে জাল বা চট ধরে ঝাকি দিলে পাকা ফল সহজেই পড়ে যায়। সব ফল এক সাথে পাকে না বলে পর্যায়ক্রমে ফল আহরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ফলন ঃ সাধারণত ১০-২০ বছরের গাছ থেকে ২০০-৪০০ টি ফল পাওয়া যায়। তবে ৪০-৫০ বছরের গাছ থেকে ৮০০-১০০০ টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। জাত ভেদে এক একটি ফলের গড় ওজন ৩৬০-১৫০০ গ্রাম তবে ৩ কিলোগ্রাম পর্যন্তও হতে পারে।

জামরুল

প্রযুক্তি ঃ জামরুল চাষ

বাংলাদেশে স্বল্প প্রচলিত ফল গুলোর মধ্যে জামরুল অন্যতম। জামরুলের বৈজ্ঞানিক নাম *Eugenia javanica* ইহা Myrtaceae পরিবারের উদ্ভিদ। ফলটি হালকা মিষ্টি স্বাদের এবং বেশ রসালো। গ্রীষ্মকালে এর কদর বেশি। দেশের সর্বত্র বসতবাড়ীর আশেপাশে বিক্ষপ্তভাবে দু'একটা গাছ দেখা যায়। এটি একটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে ৮.৫ গ্রাম শর্করা ০.৭ গ্রাম আমিষ, ০.৩ গ্রাম খনিজলবন, ৩ মি. গ্রা. ভিটামিন সি, ৮ মি. গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৫ মি. গ্রা. লৌহ, ১৪১ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৪০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি থাকে। ফলে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকায় তৃষ্ণা নিবারণে এটি সহায়ক। বিশেষ করে বহুমুত্র রোগীর জন্য এটি একটি উপকারী ফল।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশে জামরুলের দুধরনের ফল দেখা যায়- সাদা ও মেরুণ বর্ণের। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি জামরুল-১ ও বারি জামরুল-১ নামে দুটি উচ্চ ফলনশীল জাত মুক্তায়ন করেছে।

বারি জামরুল-১ ঃ নিয়মিত প্রচুর ফল উৎপাদনকারী জাত। গাছ মাঝারী, অত্যধিক ঝোপালো। মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত সময়ে গাছে ফুল আসে এবং মধ্য বৈশাখ-মধ্য জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফল চুঙ্গাকৃতির, পাকা ফল আকর্ষণীয় মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু (বিক্রমান ৬.৫%)। ফলের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৭%। গাছপ্রতি ১১০০-১৪০০ টি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি জামরুল-২ ঃ নিয়মিত প্রচুর ফল উৎপাদনকারী জাত। গাছ মাঝারী, অত্যধিক ঝোপালো। বছরে তিন বার অর্থাৎ মধ্য ফাল্গুন, মধ্য বৈশাখ এবং আষাঢ়ের শেষ ভাগে ফল আহরণ করা যায়। ফল গোলাকৃতির, পাকা ফল আকর্ষণীয় হালকা মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু (বিক্রয়মান ৬.০-৭.১%)। ফলের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯২%। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

চিত্র : বারি জামরুল-১

চিত্র : বারি জামরুল-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ সব ধরনের মাটিতেই জামরুল গাছ জন্মিতে পারে। ইহা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। অতি ঠান্ডা বা গরম উভয়ই গাছের জন্য ক্ষতিকর। তবে সুনিষ্কাশিত দোঁআশ মাটি জামরুল চাষের জন্য অধিক উপযোগী।

জমি তৈরি ঃ সুনিস্কাশিত দোঁ-আশ মাটি জামরুল চাষের জন্য উত্তম। বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ দিয়ে অথবা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে সমতল ও আগাছামুক্ত করতে হবে।

বংশবিস্তার ঃ গুটি কলম ও কান্ড কাটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়। সাধারণত ফল সংগ্রহের পর গাছের নতুন পাতা গজাতে শুরু করলে কলম করা ভাল। এক বছর বয়সের ডাল নির্বাচন করে মে-জুন মাসে কলম করা হয়। কান্ড কাটিং এর জন্য বর্ষা মৌসুমে ৪-৫ টি পর্ব সহকারে ডাল কেটে নিয়ে বেডে/পলিব্যাগে লাগাতে হবে। রোপণকৃত কান্ড থেকে নতুন কুঁড়ি বের হলে তা পরবর্তী বছরে মূল জমিতে বা তৈরিকৃত মাদায় লাগাতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টর প্রতি ২০০-২৫০ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজী এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ (জুন-জুলাই)। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বৈশাখ থেকে মধ্য কার্তিক (এপ্রিল-অক্টোবর) মাস পর্যন্ত চারা/কলম রোপণ করা যায়। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দুরত্ব ৭ মিটার দেয়া যেতে পারে।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

সার	*গাছের বয়স*			*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
	১-৩ বছর	*৪-৭ বছর*	*৮-১০ বছর*	সার দুই ভাগ করে বৈশাখ থেকে মধ্য আষাঢ় (মে-জুন) ও মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।
গোবর/কম্পোস্ট সার (কেজি)	১৫-২০	২৫-৩০	৩৫-৪০	
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০-২৫০	৬০০-৭০০	৮০০-১০০০	
টিএসপি (গ্রাম)	২০০-২৫০	৬০০-৭৫০	৮০০-১০০০	
এমওপি (গ্রাম)	২০০-২৫০	৬০০-৭৫০	৮০০-১০০০	

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করে প্রয়োজন মত পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা/মালচিং ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের গোড়া সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিস্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সেচ প্রদান ঃ জামরুলে পানির ভাগ বেশী থাকার কারণে খরা মৌসুমে অবশ্যই পানির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় পানির অভাবে ফলের আকার ছোট হয় এবং অধিক ফল ঝরে পড়তে দেখা যায়। সাধারণত খরা মৌসুমে গাছে প্রয়োজনমত ২-৩ বার সেচ দিলে গুণগত মানসম্পন্ন ফল পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে প্রয়োজনীয় নালা তৈরি করে গাছের গোড়ার অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ ঃ রোগ ও পোকা-মাকড়ে আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিস্কার করতে হবে। গাছ ছোট অবস্থা থেকেই প্রচুর ডালপালা বিস্তার করে বিধায় প্রথম থেকেই ফল দেওয়া কাংখিত ডালগুলো রেখে অন্যান্য ডালপালা ছেটে দিতে হবে। সাধারণত ফল সংগ্রহ করার পর পর ভেঙ্গে যাওয়া ও মরা ডাল কেটে ফেলতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং ঃ জামরুলের সাধারণত একই পুস্পমঞ্জুরীতে অনেকগুলো ফল থাকে বিধায় অপরিপক্ক অবস্থাতেই কিছু ফল ছেটে দিতে হবে। সাধারণত প্রতি পুস্পমঞ্জুরীতে ২-৩ টি ফল রাখলে ফলের আকার বড় হয়। পরিপক্ক ফল বেশ আকর্ষণীয় রংয়ের হওয়ায় ব্যাগিং করে পাখি ও পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ জামরুল গাছে পোকা-মাকড় ও রোগবালাইয়ের তেমন কোন উপদ্রব

নেই। কচি পাতা খেকো পোকার আক্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। এদের দমন করার জন্য আক্রান্ত গাছে সুমিথিয়ন/ফেনিটক্র ২ মি. লি.প্রতি লিটার পানির সাথে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহের/কর্তনের সময়কাল ঃ ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির পর সংগ্রহ করতে হবে। বারি জামরুল-১ এর ফল মধ্য বৈশাখ-মধ্য জ্যৈষ্ঠ মাসে আহরণ করা হয়। পরিপক্ক ফল গাঢ় তামাটে থেকে মেরুন বর্ণ ধারণ করে এবং পরিপুষ্ট ও টসটসে হয়। পরিপক্ক ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া এবং পোকামাকড় আক্রান্ত ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভাল মানের ফলগুলো মুছে পরিস্কার করে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলন ঃ গাছ প্রতি ৫৫০০-৬৫০০ টি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন।

আতা ফল

প্রযুক্তি ঃ আতা ফল চাষ

আতা বা Bullock's heart (*Annona reticulata*) Annonaceae পরিবারভূক্ত একটি স্বল্প প্রচলিত ফল। আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল আতার উৎপত্তিস্থান। বর্তমানে নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রায় সব দেশেই এর চাষ হয়। ফল হিসেবে বাংলাদেশে আতার পরিচিতি দিন দিন ফিকে হয়ে আসছে। এক সময় বেশিরভাগ বসত বাড়িতে আতার গাছ চোখে পড়লেও এখন তা বিরল। অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টি সমৃদ্ধ এ ফলটি দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায় অপরিচিত। দেশের অনেক অঞ্চলে এটি নূনাফল নামে এবং শরীফা আতাফল নামে পরিচিত। ক্যারোটিন, ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সুস্বাদু এ ফলটির এদেশে বাণিজ্যিক চাষের সুযোগ রয়েছে। টাটকা ফল হিসেবে বাংলাদেশে আতা খাওয়া হয়। পাকা ফল বলকারক, বাত ও পিত্তনাশক, তৃষ্ণাশান্তিকারক, রক্তবৃদ্ধিকারক ও মাংশবৃদ্ধিকারক। আতার শিকড় রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। আতা ফল মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক হয় এ সময় সাধারণত অন্যান্য দেশীয় ফল কম পাওয়া যায়। যার কারণে এই ফল চাষে সারা বছর ফলের সহজপাপ্র্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

চিত্র : আতা ফল

চিত্র : আতা ফল (শাঁস)

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও আতা লাগানো যেতে পারে। তবে ভাল ফলন পেতে হলে পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে আতার চাষ করা উচিত। এর জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই আতার চাষ করা চলে, তবে মাটি বিশেষভাবে সুনিষ্কাশিত হওয়া আবশ্যক। আতা খুবই কষ্ট সহিষ্ণু গাছ এবং অনুর্বর বেলে বা কঙ্করময় মাটিতেও এর চাষ করা যায়।

জমি তৈরি ঃ বাগান আকারে আতা আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তম রূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ২৭৫ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ় (মে- জুলাই) মাস আতার চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো যেতে পারে। পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে প্রায় সারা বছরই আতার চারা/কলম লাগানো চলে। বাগান আকারে আতার চাষ করার ক্ষেত্রে ৬ মি. × ৬ মি. দুরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত। চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মি.× ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উঁইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	*গাছের বয়স (বছর)*				সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্দ্ধে	
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০	সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ফল আহরণের পর (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (ভাদ্র-আশ্বিন মাসে) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার ও পাহাড়ী এলাকায় ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা উত্তম। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৩০০-৪৫০	৪৫০-৬০০	৬০০-৭৫০	
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৪৫০-৫০০	
এমওপি (গ্রাম)	১০০-১৫০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৪৫০	
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০	

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা/কলম রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের সময় মাটি নীচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় আচ্ছাদন বা মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ: সাধারণভাবে আতার কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চারা রোপণ করা হলে তাতে ডালপালা না হয়ে খাড়াভাবে বাড়তে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ডাল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। রোপণের পর পর্যায়ক্রমে কলমের গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। চারাটি যাতে খাড়া না হয়ে শাখা সমৃদ্ধ হয় সে জন্য মাটি থেকে ২.০-২.৫ মিটার উপরে মাথা কেটে দেয়া ভাল। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা ডালপালা ছেটে দেয়া দরকার।

সেচের সংখ্যা এবং সময়কাল ঃ ফল ধরার পর দু-তিনবার সেচ দিলে ফলগুলো আকারে বড় হয় ও স্বাদে ভাল হয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

মিলিবাগ ঃ এ পোকার আক্রমণে ফল, কান্ড ও পাতায় সাদা তুলারমত আবরণ দেখা যায়। আবরণের নীচে অবস্থানকৃত পোকা পাতার রস শোষে নেয়। এতে গাছ দুর্বল হয়। পোকা নিসৃত আঠালো পদার্থ পাতা, ফল ও শাখায় সুটি মোল্ড রোগ সৃষ্টি করে।

দমন ব্যবস্থা ঃ রগর/রক্রিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতা ও ডালপালায় ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ডাইব্যাক ঃ আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় এবং কচি ডাল আগা থেকে শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। এছাড়া ম্যানকোজেব (০.২%) অথবা বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করেও এ রোগ দমন করা যায়।

শুটি মোল্ড ঃ মিলিবাগ পোকার আঠালো বিষ্ঠা পাতা, ফল ও শাখায় পড়লে এর উপর এক প্রকার ছত্রাক জন্মে এবং পাতা, ফল ও শাখায় ছাইয়ের মত কাল আবরণ পড়ে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফলের উপর কাল দাগ পড়ার দরুণ এর বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার ঃ শোষক পোকা (মিলি বাগ) দমনের মাধ্যমে (রগর/রক্রিয়ন স্প্রে করে) এ রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছে ০.২% হারে কারবেন্ডাজিম স্প্রে করতে হবে।

কর্তনের সময়কাল ঃ শীতের প্রারম্ভে (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) গাছে ফুল আসে এবং ফুল ধরার ৪-৫ মাস পর মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ফলন ঃ কলমের গাছে ৫ বছর বয়সে প্রায় ৪০-৫০ টা, এবং বয়স্ক গাছে ১০০ টা আতা ধরে থাকে।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় গাছে কোন পাতা থাকে না। আতা ফল পরিপক্ক হলে সিন্দুরী বা হলুদ রং ধারণ করে। ফল পেকে নরম হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বোটাসহ সংগ্রহ করতে হবে। পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে দুই-তিন দিন ঘরে রেখে দিলেই পেকে খাওয়ার উপযোগী হবে।

শরীফা

প্রযুক্তি ঃ শরীফা চাষ

শরীফা বা Custard apple (*Annona squamosa*) Annonaceae পরিবারভূক্ত স্বল্প প্রচলিত ফল। আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল এর উৎপত্তিস্থান। বর্তমানে নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রায় সব দেশেই এর চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে শরীফা একটি বিরল ফল। এক সময় বেশিরভাগ বসত বাড়িতে শরীফার গাছ চোখে পড়লেও এখন তা আর দেখা যায় না। অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টি সমৃদ্ধ এ ফলটি দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায় অপরিচিত। দেশের অনেক অঞ্চলে এটি আতাফল নামে পরিচিত। কেবল মাত্র টাটকা ফল হিসেবে বাংলাদেশে শরীফা খাওয়া হয়। ক্যারোটিন, ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সুস্বাদু এ ফলটির এদেশে বাণিজ্যিক চাষের সুযোগ রয়েছে। পাকা ফল বলকারক, বাত ও পিত্তনাশক, তৃষ্ণাশান্তিকারক, রক্তবৃদ্ধিকারক ও মাংশবৃদ্ধিকারক। শরীফা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরিপক্ক হয় এ সময় সাধারণত অন্যান্য দেশীয় ফল কম পাওয়া যায়। যার কারণে এই ফল চাষে সারা বছর ফলের সহজপাপ্র্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

চিত্র : শরীফা ফল

চিত্র : শরীফা ফল

চিত্র : শরীফা ফল (শাঁস)

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও শরীফা লাগানো যেতে পারে। তবে ভাল ফলন পেতে হলে পূর্ণ রৌদ্র যুক্ত স্থানে শরীফার চাষ করা উচিত। শরীফা জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। এর জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই শরীফার চাষ করা চলে, তবে জলাবদ্ধতার প্রতি সংবেদনশীল বলে মাটি বিশেষভাবে সুনিষ্কাশিত হওয়া আবশ্যক।

জমি তৈরি ঃ আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুড়ি বাগান থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তম রূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

অনুমোদিত জাত ঃ বাংলাদেশে আতার অনুমোদিত কোন জাত নেই।

চারা/কলমের সংখ্যা ঃ হেক্টরপ্রতি ৪২৫ টি।

চারা রোপন ও পরিচর্যা ঃ বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ় (মে- জুলাই) মাস শরীফার চারা/কলম রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো যেতে পারে। পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে প্রায় সারা বছরই শরীফার চারা/কলম লাগানো চলে। বাগান আকারে শরীফার চাষ করার ক্ষেত্রে ৪ মি. × ৪ মি. দুরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত। চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬০ সেমি× ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উঁইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নীচের ছকে

দেয়া হলঃ

সারের নাম	*গাছের বয়স (বছর)*				*সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
	১-৩	৩-৫	৫-১০	১০ এর উর্দ্ধে	সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি ভাদ্র-আশ্বিন মাসে (ফল আহরণের পর) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার ও পাহাড়ী এলাকায় ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা উত্তম। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।
গোবর (কেজি)	৫-১০	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	
ইউরিয়া (গ্রাম)	১০০-১৫০	১৫০-২৫০	২৫০-৪৫০	৪৫০-৫০০	
টি এস পি (গ্রাম)	১০০-১৫০	১৫০-২৫০	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	
এমওপি (গ্রাম)	১০০-১৫০	১৫০-২৫০	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	১৫০	২০০	২৫০	

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা/কলম রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের সময় মাটি নীচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবসস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় আচ্ছাদন বা মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়। গাছের গোড়া সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ফল ধরার পর দু-তিনবার সেচ দিলে ফলগুলো আকারে বড় হয় ও স্বাদে ভাল হয় ।

ডাল ছাঁটাইকরণ: সাধারণভাবে শরীফার চারা/কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোপণের পর কলমের গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। শরীফার নতুন ও পুরাতন সব শাখাতেই ফুল আসে এবং গাছের আকার-আকৃতি বাড়ার সাথে সাথে ফলন বেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

মিলিবাগ ঃ এ পোকার আক্রমণে ফল, কান্ড ও পাতায় সাদা তুলারমত আবরণ দেখা যায়। আবরণের নীচে অবস্থানকৃত পোকা পাতার রস শোষে নেয়। এতে গাছ দুর্বল হয়। পোকার আঠালো বিষ্ঠা পাতা, ফল ও শাখায় শুটি মোল্ড রোগ সৃষ্টি করে।

দমন ব্যবস্থা ঃ রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতা ও ডালপালায় ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ডাইব্যাক ঃ আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় এবং কচি ডাল আগা থেকে শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। এ ছড়া ইন্ডোফিল এম-৪৫ (০.২%) অথবা বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করেও এ রোগ দমন করা যায়।

শুটি মোল্ড ঃ মিলিবাগ পোকার আঠালো বিষ্ঠা পাতা, ফল ও শাখায় পড়লে এর উপর এক প্রকার ছত্রাক জন্মে এবং পাতা, ফল ও শাখায় ছাইয়ের মত কাল আবরণ পড়ে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফলের উপর কাল দাগ পড়ার দরুণ এর বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার ঃ শোষক পোকা (মিলি বাগ) দমনের মাধ্যমে (রগর/রক্সিয়ন স্প্রে করে) এ রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছে ০.২% হারে কারবেন্ডাজিম স্প্রে করতে হবে।

কর্তনের সময়কাল ঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে শরীফা গাছে ফুল আসে এবং ফুল ধরার ৪-৫ মাস পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে। পরিপক্ক হলে শরীফা ফল পুষ্ট ও রং উজ্বল হবে, ফিকে হলদে আভা দেখা দেবে ও চোখগুলো পুষ্ট হয়ে উঠবে। পরিপক্ক ফল হাত দ্বারা বোটাসহ সংগ্রহ করাতে হবে। পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করার ৭/৮ দিনের মধ্যেই পেকে যাবে।

ফলন ঃ শরীফার ফলন বয়স ও জাতভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া পরিচর্যা, জলবায়ু, পোকামাকড় প্রভৃতি বিষয়ও এর জন্য দায়ী। কলমের গাছে ৫ বছর বয়সে প্রায় ৪০-৫০ টা, এবং বয়স্ক গাছে ১০০ টা শরীফা ধরে থাকে।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ ফল পেকে নরম হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বোটাসহ সংগ্রহ করতে হবে। পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে দুই-তিন দিন ঘরে রেখে দিলেই পেকে খাওয়ার উপযোগী হবে।

অরবরই

ফসলের নাম ঃ অরবরই

ভূমিকা ঃ অরবরই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি দেশি ফল। Euphorbiaceae পরিবার ভুক্ত ফলটির ইংরেজি নাম Star/gooseberry এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Phyllanthus distichus*। দেশের গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এই ফলটি কমবেশি দেখা যায়। সাধারণত বসত বাড়ীর আনাচে কানাচে অথবা ফল বাগানে দু'একটি গাছ লাগানো হয়। নোয়াখালী, বরিশাল, খুলণা, বাগের হাট এলাকায় অরবরই চাষ হয়। কেবল মাত্র টাটকা ফল হিসেবে বাংলাদেশে অরবরই খাওয়া হয়। তবে অরবরই হতে বিভিন্ন প্রকার চাটনি ও আচার প্রস্তুত কারা সম্ভব এবং ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও লৌহ সমৃদ্ধ। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম অরবরই এ ৯১.৪ ভাগ জলীয় অংশ, ০.৭ গ্রাম খনিজ লবণ, ৩.৪ গ্রাম আঁশ, ০.৯ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ৩.৫ গ্রাম শর্করা, ৩৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.২ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.০২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২, ৪৬৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ১৯ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে।

প্রযুক্তির এলাকা সমূহ ঃ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের অন্যন্য এলাকা।

উৎপাদন পরিচর্যা ঃ

জমির ধরণ/পানির অবস্থান ঃ আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও অরবরই লাগানো যেতে পারে। তবে ভাল ফলন পেতে হলে পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে অরবরইর চাষ করা উচিত। অরবরই জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। এর জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। সুনিষ্কাশিত যে কোন ধরনের জমিতেই অরবরই চাষ করা যায়।

চিত্র : অরবরই গাছসহ ফল

মাটি ও জমি তৈরি ঃ প্রায় সব ধরনের মাটিতেই অরবরইর চাষ করা চলে, তবে জলাবদ্ধতার প্রতি সংবেদনশীল বলে মাটি বিশেষভাবে সুনিষ্কাশিত হওয়া আবশ্যক। বাগান আকারে অরবরইর আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তম রূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

অনুমোদিত জাত ঃ বাংলাদেশে অনুমোদিত কোন জাত নেই।

বীজের হার ঃ হেক্টরপ্রতি ২৮০ টি।

বপনের সময় ঃ বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ় (মে- জুলাই) মাস অরবরইর চারা/কলম রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো যেতে পারে। পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে প্রায় সারা বছরই অরবরইর চারা/কলম লাগানো যায়।

গাছের দূরত ঃ বাগান আকারে অরবরইর চাষ করার ক্ষেত্রে ৬ মি. × ৬ মি. দুরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ সুনিষ্কাশিত যে কোন ধরনের জমিতেই অরবরই চাষ করা যায়। গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিস্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণ করার জন্য ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পঁচা গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করে ১০/১৫ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে। মাদা তৈরি করার পর তাতে ১০-১৫ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা ঠিক গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার গোড়ায় লাগানো মাটির বলটি কোনভাবেই ভেঙ্গে না যায়। লাগানোর পর হাত দিয়ে আলতো করে চারার গোড়ায় মাটি সুন্দরভাবে চারপাশে সমান করে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। তারপর সম্ভব হলে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থানা ঃ গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাংক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নীচের ছকে দেয়া হলঃ

সারের নাম	***গাছের বয়স (বছর)***			
	১-৩	৩-৫	৫-১০	১০ এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	১৫	২০	৩০	৬০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪০০	৬০০	৮০০	১০০০
টি এস পি (গ্রাম)	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	১৫০	২০০	২৫০

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করার সময় ঠিক মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় গাছের গোড়া থেকে ০.৫ থেকে ১.০ মিটার জায়গা খালি রেখে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ মাদা তৈরি করার পর তাতে ১০-১৫ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা ঠিক গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার গোড়ায় লাগানো মাটির বলটি কোনভাবেই ভেঙ্গে না যায়। লাগানোর পর হাত দিয়ে আলতো করে চারার গোড়ায় মাটি সুন্দরভাবে চারপাশে সমান করে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। তারপর সম্ভব হলে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণঃ সাধারণভাবে অরবরইর চারা/কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা

যায়। রোপণের পর কলমের গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। অরবরইর নতুন ও পুরাতন সব শাখাতেই ফুল আসে এবং গাছের আকার-আকৃতি বাড়ার সাথে সাথে ফলন বেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

আগাছা/মালচিং ঃ গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিস্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার আগে ও শেষে জমিতে চাষ দিয়ে বা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে আগাছা দমন করা যায়।

সেচে প্রদান ঃ চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে অরবরই এ সেচ দেওয়া প্রয়োজন। অরবরই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা ঃ অরবরই খুব একটা রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়না। নিয়মিত বাগান পরিস্কার পরিছন্ন রাখলেই ইহা সফলভাবে চাষ করা যায়।

মিলিবাগ ঃ এ পোকার আক্রমণে ফল, কান্ড ও পাতায় সাদা তুলারমত আবরণ দেখা যায়। আবরণের নীচে অবস্থানকৃত পোকা পাতার রস শোষে নেয়। এতে গাছ দুর্বল হয়। পোকার আঠালো বিষ্ঠা পাতা, ফল ও শাখায় শুটি মোল্ড রোগ সৃষ্টি করে।

দমন ব্যবস্থা ঃ রগর/রক্রিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতা ও ডালপালায় ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

শুটি মোল্ড ঃ মিলিবাগ পোকার আঠালো বিষ্ঠা পাতা, ফল ও শাখায় পড়লে এর উপর এক প্রকার ছত্রাক জন্মে এবং পাতা, ফল ও শাখায় ছাইয়ের মত কাল আবরণ পড়ে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফলের উপর কাল দাগ পড়ার দরুণ এর বাজার মূল্য কমে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ রগর/রক্রিয়ন স্প্রে করে এ রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছে ০.২% হারে কারবেন্ডাজিম স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ঃ সাধারণত শীতের শেষে মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ডাল ও তরকারীতে দিয়ে খাবার জন্য এবং চাটনী তৈরি করে ব্যবহার করার জন্য সাধারণত গাছ হতে কাঁচা ফল পাড়া হয়। সব ফল একসাথে পাকেনা তাই পাকা ফল দেখে সংগ্রহ করতে হবে। পাকা ফল হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণ ধারণ করবে এবং এর গন্ধ ও স্বাদ কাঙ্খিত অবস্থায় পৌঁছবে তখনি ফল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফল ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকাল বা বিকেলের ঠান্ডা আবহাওয়া ফল আহরণের জন্য অধিক উপযোগী।

ফলন (হেক্টরঃ) ঃ কলম গাছে ৫ বছর বয়সে প্রায় ৮-১০ কেজি, এবং বয়স্ক গাছে ২০-৪০ কেজি।

সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি ঃ ফল পেকে নরম হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বোটাসহ সংগ্রহ করতে হবে। পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে ২-৩ দিন ঘরে রেখে দিলেই পেকে খাওয়ার উপযোগী হবে।

তরমুজ

প্রযুক্তি ঃ তরমুজের চাষ

তরমুজের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৯৩% জলীয় অংশ, ০.৫ গ্রাম আমিষ, ৬.৫ গ্রাম শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম ১০ মিঃ গ্রাঃ, লৌহ ০.৭ মিঃ গ্রাঃ, ক্যারোটিন ২৩০ মাইক্রোগ্রাম, খাদ্যাপ্রাণ সি ৬ মিঃ গ্রাম রয়েছে। নোয়াখালি, পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, বরিশাল এর জন্য প্রযোজ্য। তরমুজ কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল। বেড উচুঁ করে চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

চিত্র : তরমুজ

উৎপাদন ও প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ জমি। নিস্কাশনের সুবিধাযুক্ত যে কোন প্রকারের মাটিতে তরমুজের চাষ করা চলে। তবে উর্বর বেলে দোঁআশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম।

বপন সময় ঃ সাধারণত জানুয়ারীর ২য় সাপ্তাহ পর থেকে মাদায় বীজ বোনা যায়। ইদানীং কালে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারীর ২০ তারিখ পর্যন্ত আবহাওয়া প্রায় বিরুপ থাকে যার কারণে ৩য় সাপ্তাহ থেকে বীজ লাগানো উচিত। এ সময় সাধারণত মৃত্তিকা লবনাক্ততা ২.০০-৩.৫০ ডি এস/মি থাকে এবং মাদা ঠিকমত করলে এই লবনাক্ততা থাকে না।

বীজের হার ঃ সরাসরি মাদায় বপনের জন্য : ১.৫-২.০ কেজি/হেক্টর (৬-৮ গ্রাম/শতাংশ), চারা করে মাদায় রোপনের ক্ষেত্রে: ০.৮ -১.০ কেজি/হেক্টর (৩-৪ গ্রাম/শতাংশ)। সাধারণতঃ মাদায় সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি প্রচিলিত থাকলেও চারা তৈরি করে মাদাতে রোপণ করাই উত্তম।

জমি তৈরি ঃ বীজ বপনের আগে প্রয়োজনমত চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত বড় ট্রাক্টর দিয়ে একটা চাষ ও পাওয়ার টিলার দ্বারা দুটি চাষ দেয়া হয়।

বেড তৈরি ঃ জমি তৈরির পর জমির দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে বেডের প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরুপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি নালা থাকবে ।

মাদা তৈরি ঃ মাদার আকার হবে ব্যাস ৫০ সেমি ও গভীরতা ৫০ সেমি। মাদা অবশ্যই ৫০ সেমি গভীর করতে হবে এবং উপরের মাটি গর্তের একপাশে ও নীচের মাটি আরেক পাশে রাখতে হবে। এতে করে লবন উপরে উঠার যে নল তা ভেঙ্গে যাবে এবং মাদায় লবনাক্ততা থাকবে না। ৩০ সেমি প্রসস্থ সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন উভয় বেডের কিনারা হতে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে।

বীজের অংকুরোদগম ঃ সাধারণত কৃষকরা শীতকালে বীজের অঙ্কুরোদগমে সমস্যায় পড়ে। বীজের অংকুরোদগমের জন্য কমপক্ষে ২৫° থেকে ৩০° সে: তাপমাত্রা প্রয়োজন। ১৫° সে: বা এর নিচের তাপমাত্রায় তরমুজের বীজ গজায় না। এজন্য বীজকে ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে গোবরের মাদার ভিতরে কিংবা মাটির পাত্রে রক্ষিত বালির ভিতরে কিংবা চুলার উষ্ণতায় বা বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালিয়ে পলিথিন ব্যাগে বীজ ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিলে ২-৩ দিনের মধ্যেই বীজ অংকুরিত হয়। এছাড়া কৃষকেরা তাদের শরীরে সাথে বীজ রাখে বিশেষ করে লুঙ্গি বাধার স্থানে যার ফলে অনেক সময় অংকুরিত বীজের অগ্রভাগ নষ্ট বা ভেঙ্গে যেতে পারে।

বীজ বপন ঃ বীজ অংকুরিত হলে একটি মাদায় তিন থেকে চারটি বীজ লাগাতে হবে। চারা গজানোর পর সুস্থ সতেজ চারা রাখার পর বাকী গুলো তুলে ফেলতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সার	মোট সারের পরিমাণ		শেষ চাষের প্রয়োগ		চারা রোপনের ১০ দিন পূর্বে বা গর্তে		চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পরে		ফুল আসার সময়	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
পচা গোবর	১০০০	২০ কেজি	৫০০	১০ কেজি	৫০০	১৪ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৩৬	৬৮০ গ্রাম	-	-	৪০	২০০ গ্রাম	৬০	৩০০ গ্রাম	৩৬	১৮০ গ্রাম
টিএসপি	১৭৫	৭০০ গ্রাম	৭৫	৩০০ গ্রাম	১০০	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-
এমওপি	১৫০	৬০০ গ্রাম	৫০	২৫০ গ্রাম	৫০	২৫০ গ্রাম	২৫	১৫০ গ্রাম	২৫	১৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০	২০০ গ্রাম	৫০	২০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
জিংক	১০	৩৪ গ্রাম	-	-	১০	৩৪ গ্রাম	-	-	-	-
বোরাক্স	১০	৩৪ গ্রাম	-	-	১০	৩৪ গ্রাম	-	-	-	-

প্রুনিং ঃ তরমুজের সবগুলো শাখা রেখে দিলে ফলন হ্রাস পায়। খাদ্য উপাদানের ঘাটতি হয়, রোগ বালাই, পোকা মাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। গাছে যখন ৮-১০টি পাতা হয় তখন কমপক্ষে ৫ টি গিট রেখে প্রধান শাখার মাথা কেটে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রধান শাখার সাথে ৪-৫ টি প্রশাখা রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। প্রতি প্রশাখায় ১টি করে ফল (১২-১৩ গিটে) রেখে অতিরিক্ত ফলগুলো ফেলে দিলে মানসম্পন্ন ফল পাওয়া যায়।

পরাগায়ন ঃ তরমুজ পরপরাগায়িত উদ্ভিদ অর্থাৎ এর একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী দুরকমের ফুল হয়। সকাল বেলা স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটার সাথে সাথে স্ত্রী ফুলকে পুরুষ ফুল দিয়ে পরাগায়িত করে দিলে ফল ঝরে যায় না ও ফলের আকারও নষ্ট হয় না।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ তরমুজ খরা সহ্য করতে পারলেও শুকনা মৌসুমে সেচ দেয়া খুব প্রয়োজন এজন্য প্রয়োজন মাফিক দুই-তিনটা সেচ দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে কারণ স্যাঁত স্যাঁতে অবস্থায় তরমুজের গোড়ায় সহজেই পচা রোগ ধরতে পারে। কৃষক সাধারণত আগাছা দমন করেন না (মাদায় ব্যতীত) এবং এতে লবণাক্ততার প্রকোপ কম হয়। প্রয়োজনে আগাছা দমন করতে হবে এবং যদি সেচের পানির অপ্রতুলতা থাকে সেইক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় মালচিং করতে হবে এতে একদিকে যেমন আগাছা দমন হবে তেমনি অন্যদিকে লবণাক্ততাও বাড়তে পারবে না। ফলের আকার ও ওজন বাড়ানোর জন্য প্রতি গাছে ৩-৪ টির বেশি ফল রাখা যাবে না এবং বাকী সব ফল কচি অবস্থাতেই ফেলে দিতে হবে। গাছের শাখার মাঝামাঝি গিটে যে ফল হয় সেটিই রাখতে হয়। চারটি শাখায় চারটি ফলই যথেষ্ট।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

মাছি পোকা ক্ষতির লক্ষণ ঃ

- এ পোকার আক্রমণে কচি তরমুজের ফল নষ্ট হয়ে যায়।
- এই পোকা তরমুজের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে। পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের ভিতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

- এ পোকার আক্রমণের ফলে প্রায় ৫০-৭০ ভাগ ফল নষ্ট হয়ে যায় ।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- পরিস্কার চাষাবাদ ঃ মাছি পোকায় আক্রান্ত ফলসমূহ সংগ্রহ করে কমপক্ষে ৩০ সেমি গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে । অথবা হাত বা পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে ।
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার ঃ কিউলিওর নামক সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার করে পুরুষ মাছি পোকা মেরে ফেলা হয় । ফাঁদের সাবান মিশ্রিত পানি নিয়মিন পরিস্কার করতে হবে ।

কাঁটালে পোকা বা ইপিল্যাকনা বিটল ঃ

ক্ষতির লক্ষন ঃ

- এই পোকা তরমুজের পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে ।
- মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ত অংশ থেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে ।
- ফলের উপরি ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে ।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পোকাসহ আক্রান্ত পাতা হাত বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে ।
- নিমতেল ৫ মিলি + ট্রিকস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা ।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করা ।
- আক্রমণ অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি/কুইনালফস/টাফগার জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি পরিমান) স্প্রে করা ।

পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা ঃ কম বয়স্ক পোকা পাতার সুবুজ অংশ খেয়ে পাতার ভিতরে সুড়ঙ্গ করে ফেলে । বিগত কয়েকবছর ধরে নোয়াখালীতে এই পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হচেছ ।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা সেক্স ফেরোমন ফাঁদের সাহায্যে মেরে ফেলতে হবে । যদিও আমাদের দেশে এটা এখনও বাণিজ্যিকভাবে তেমন একটা পাওয়া যায় না । আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ পোকা দমন করতে হবে । আক্রান্ত ৩০ সেমি মাটির গভীরে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে । কৃষকরা সাধারণত আগাছা দমন করে না । কিন্তু এ পোকা মাটিতে ডিম পারে সুতরাং ভাল করে আগাছা দমন করতে হবে ।

থ্রিপস পোকা ঃ

ক্ষতির লক্ষন ঃ পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থ্রিপস পাতা থেকে রস চুষে খায় ।

- পাতার মধ্য শিরার নিকটবর্তী এলাকা বাদমী রং ধারণ করে ও শুকিয়ে যায় ।
- নৌকার খোলের ন্যায় পাতা উপরের দিকে কুঁকড়ে যায় ।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পাঁচ গ্রাম পরিমাণ গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা ।
- ক্ষেতে সাদা রংয়ের ৩০ সেমি x ৩০ সে.মি. আকারের বোর্ডে পাতলা করে গ্রীজ বা আঠা লাগিয়ে কাঠির সাহায্যে ৩ মিটার দূরে দূরে আঠা ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকা আকৃষ্ট করে মারা ।
- আক্রমনের হার অত্যন্ত বেশি হলে এমিডাক্লোরপিড জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ) স্প্রে করা ।

পামকিন বিটল ঃ

ক্ষতির লক্ষন ঃ

- তরমুজ গাছের পাতা এবং শিকড় ব্যাপক ক্ষতি করে ।

- পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে।
- এই পোকা ফল ও কচি ফলে আক্রমন করে।
- এদের কীড়া শিকড় বা মাটির নীচে থাকা কান্ড ছিদ্র করে ফেলে। তাই গাছ ঢলে পড়ে এবং পরিশেষে শুকিয়ে মরে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. চারা আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণ বয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলা।

২. চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা।

৩. ক্ষেত সবসময় পরিস্কার রাখা।

৪. আক্রমনের হার বেশি হলে প্রতি মাদায় মাটির সাথে চারা প্রতি ২-৫ গ্রাম অনুমোদিত দানাদার কীটনাশক (কার্বোফুরান জাতীয় কীটনাশক) মিশিয়ে গোড়ায় পানি সেচ দেয়া।

তরমুজের লেদা পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

১. তরমুজ এর ফলের উপরিভাগে চামড়া খেয়ে দাগ করে ফেলে।

২. ফল ছিদ্র করে ফেলে। এদের কীড়া শিকড় বা মাটির নীচে থাকা কান্ড ছিদ্র করে ফেলে। তাই গাছ ঢলে পড়ে এবং পরিশেষে শুকিয়ে মরে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- নিয়মিত ক্ষেত জরিপ করে ডিমের গাদা ও পাতাসহ ক্রীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
- বিকল্প পোষক ধ্বংস করা।
- এলোমেলোভাবে কীটনাশক স্প্রে না করে উপকারী পোকা মাকড়সা সংরক্ষন ও বংশবৃদ্ধি করা। বিভিন্ন ধরণের বোলতা যেমন-ব্রাকনিড, এপানটেলিস ও টিলিনোমাস এ পোকার ডিম ও ক্রীড়াকে পরজীবিতার মাধ্যসে ধ্বংস করে।

দাড়ঁকাক ঃ পূর্ণাঙ্গ ফল নষ্ট করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা ঃ জমিতে কাকাতুয়া বসালে ও পুরোনো ক্যাসেটের ফিতা আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন করা।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ ঃ

- চারা বা বড় গাছের পাতা এবং গাছ হঠাৎ করে ঢলে পড়ে, পাতা হলুদ বা বাদামী রং ধারন করে।
- পরবর্তীতে সম্পূর্ন গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- তরমুজকে ফিউরেজিয়াম উইল্ট ও ঠান্ডা জনিত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষার জন্য লাউ বা মিষ্টি কুমড়া গাছের ১২ দিন বয়সের চারাকে রুট স্টক (আদি জোড়) হিসেবে ব্যবহার করে ১৫ দিন বয়সের তরমুজের চারার সাথে জোড় কলম করে তরমুজের চাষ করলে সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যাবে।
- তরমুজের জমিতে পলিথিন মাল্চ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে (৩২-৩৩° সেঃ প্রায়) চাষ করা যেতে পারে।
- রিডোমিল্ড গোল্ড/ব্যভিষ্টিন/ক্যাপটান ২গ্রা/লি পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মোজাইক ভাইরাস

- পাতায় হালকা সবুজ থেকে পুরো হলুদ হয়ে যায়। দাগগুলো ক্রমশ বড় হয়ে মোজাইকের মত দেখায়।
- পাতা কুঁকড়ে যায় ও গাছ খাটো হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- বাহক পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে এমিডাক্লোরপিড ২ মিলি/লি ঔষধ মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে চারা অবস্থা থেকে ফুল আসার আগ পর্যন্ত যদি আবহাওয়া প্রতিকূলে থাকে।
- গাছ আক্রান্ত হওয়া মাত্র তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

এনথ্রাকনোজ

- প্রথমে পাতায় ছোট হলুদাভ ভিজা দাগ পড়ে। দাগ দ্রুত বেড়ে বাদামী ও কাল রং ধারন করে এবং অবশেষে সমস্ত পাতা নষ্ট হয়ে যায়।
- ফলের উপর গোলাকার গভীর ও ভিজা কিনারা বিশিষ্ট দাগ পড়ে। দাগের কেন্দ্র পিংক রং ধারন করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- বীজ শোধন, শস্য পর্যায় অনুসরন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ।
- প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহের সময়ঃ

বীজ বপনের ৯০-১২০ দিন ফসল সংগ্রহ করা যায়। তরমুজ পরিপক্ক হলে উহা গাছ হতে আলাদা করে বোটা সহ সংগ্রহ করতে হয়। আঙ্গুল দিয়ে তরমুজ টোকা দিলে বা হাতের তালু দিয়ে হালকা আঘাত করলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তাতে বুঝতে হবে উহা পরিপক্কতা লাভ করেছে। অপরিপক্ক হলে অনেকটা ধাতবীয় শব্দ হবে। সাধারনত স্ত্রী ফুল ফোটার ৩০-৪০ দিনের মধ্যে তরমুজ পরিপক্ক হয়।

ফলন ঃ অঞ্চল ভেদে তরমুজের ফলন ভিন্ন হয়। পটুয়াখালী অঞ্চলে তরমুজের গড় ফলন হলো ৩০-৩৫ টন/হেক্টর।

ঝুঁকির বিবরন ঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে লবণাক্ততা অধীক হলে তরমুজের উৎপাদন ব্যহত হয়।

সর্জান পদ্ধতিতে উন্নত জাতের পেয়ারা

প্রযুক্তি ঃ সর্জান পদ্ধতিতে পেয়ারার চাষ

প্রযুক্তির এলাকা সমূহ ঃ বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ মাঝারি নিচু ও নিচু পতিত জমি পেয়ারা চাষের আওতায় আনা যায়। গাছ জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হলেও গাছের গোড়ায় জোয়ারের পানি জমে থাকে না।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জাতের নাম ঃ বারি পেয়ারা-১, বারি পেয়ারা ২ ও সরূপকাঠীর স্থানীয়।

জমি ও মাটির ধরন ঃ মাঝারি উচু/মাঝারি নিচু। এঁটেল দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ।

রোপন সময় ও পরিচর্যা ঃ ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমির দৈঘ্য বরাবর ৮-১২ ফুট প্রশস্ত এবং খরিপ মৌসুমে স্বাভাবিক পানির উচ্চতা থেকে ১-১.৫ মিটার উঁচু কান্দি তৈরি করা হয়। অতপর

চিত্র : সর্জান পদ্ধতিতে পেয়ারা চাষ

কান্দিও মাঝ বরাবর ৪ মিটার ব্যবধানে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি গর্ত করে গর্তের মাটির সাথে ১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর গর্তেও মাটি পূনরায় উলটপালট করে গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়া ভাবে চারাটি লাগাতে হবে। চারা রোপনের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে।

বপন সময় ঃ জুন-সেপ্টেম্বর মাস পেয়ারার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*গাছের বয়স (বছর)*		
	১-২	৩-৫	>৬
গোবর	১৫	২৫	৪০
ইউরিয়া	২৫০	৩৫০	৫০০
টিএসপি	২৫০	৩৫০	৫০০
এমওপি	২৫০	৩৫০	৫০০

প্রতি বছর দুই কিস্ততে মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার গাছের গোড়ার না দিয়ে গাছের ডালপালা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে এলাকার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ প্রদান ঃ সার প্রয়োগের পর ও খরার সময় বিশেষ করে গাছে গুটি আসার সময় পানি সেচ অত্যাবশ্যক।ফলন্ত গাছে শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ১০-১৫ দিন অন্তর সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং ফল আকারে বড় হবে এবং ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া পেয়ারার দুটি মারাত্মক রোগ। এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারনে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত ফল পরিপক্ক হলে ফেটে যায় এবং কালো হয়ে যায়। এ রোগ দমনের জন্য গাছে ফুল ধরার পর টপসিন-এম ২ গ্রাম/লিঃ অথবা টিল্ট -২৫০ ইসি ০.৫মিলি/লিঃ হারে ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। পেয়ারা গাছে উইল্ট রোগ হলে প্রথমে পাতা তারপর শাখা-প্রশাখা ও সবশেষে সমস্ত গাছই শুকিয়ে ৮-১০ দিনের মধ্যে মারা যায়। এ রোগের কোন প্রতিকার নেই তাই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধী আদি জোড় যেমন-এল৪৯ ব্যবহার করতে হবে।

কর্তন সময় ঃ আগষ্ট - সেপ্টেম্বর

ফলন (টন/হেক্টরঃ) ঃ ২৩.৪৩

সবজি

সবজি ফসলের চাষাবাদ কৌশল

বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে সবজি চাষের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু লবনাক্ততা সবজি চাষে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলীয় ১৩ টি জেলার ৬৪ টি থানার প্রায় ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবনাক্ততার আওতায় পরে যা মোট চাষাবাদ যোগ্য জমির ৩০%। লবনাক্ততার কারনে উপকূলীয় অঞ্চলে গড় Cropping Intensity ৬২% (চট্টগ্রাম অঞ্চল) হতে ১১৪% (পটুয়াখালী অঞ্চল) পরিলক্ষিত হয় যা জাতীয় গড় ১৯১% হতে অনেক কম। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন উপযুক্ত জাত, পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত সার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যেমে এর পরিবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে চাষাবাদ উপযোগী সবজির তালিকা ঃ

ডাটা, পুইঁশাক সহনশীল (5-10 dS/m)

করলা, লাউ, বেগুন, টমেটো,শসা, ঢেরস, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ব্রোকলি মাঝারি সহনশীল (3-5 dS/m)|

মুলা ও গাজর সহনশীল (1.5-3 dS/m)

টমেটো

প্রযুক্তি ঃ টমেটো চাষ

টমেটো ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ একটি শীতকালীন সবজি, এতে প্রচুর পরিমান ভিটামিন "এ" এবং ভিটামিন "সি" রয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ লবন আছে যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্য গঠনে প্রয়োজন। ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ এবং কৃমি রোগ সহনশীল, তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় গ্রীষ্ম কালে চাষ করা যায়।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি টমেটো- ২ (রতন) ঃ ফলের ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ৩০-৩৫টি ফল ধরে। গাছ প্রতি ফলন ২-২.৫ কেজি।

বারি টমেটো-১৪ ঃ ফলের ওজন ৯০-৯৫ গ্রাম। ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ঃ গ্রীষ্মকালীন জাত। ফলের গড় ওজন ৩৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন ১.২-১.৩ কেজি।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ ঃ গ্রীষ্মকালীন জাত। ফলের গড় ওজন ৫০ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন ১.৫ কেজি।

চিত্র : বারি হাইব্রিড টমেটো-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উঁচু জমি। দোআঁশ ধরনের মাটি টমেটো চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ঃ টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১মি: চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উচুঁ বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিস্কাশনের সুবিধা হয়। লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য চাষীরা সাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি এবং অনেক সময় মালচিং হিসাবে পলিথিন বা খড় ব্যবহার করে। এছাড়া গ্রীষ্মকালে পলিথিন দিয়ে টানেল তৈরি করে চাষ করা যায়।

বীজের হার ঃ ২০০ গ্রাম/হেক্টর (১ গ্রাম/শতাংশ)

বপন/রোপন ঃ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর (শীতকালে), মে-জুলাই (গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে)

গাছের দূরত্ব ঃ ৬০ সেমি × ৪০ সেমি

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ

- সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৫০ গ্রাম সুস্থ বীজ ঘন করে প্রতিটি বীজতলায় (১মি×৩ মি) বুনতে হয়।
- প্রতি হেক্টরে ২০০ গ্রাম (১ গ্রাম/শতাংশ) বীজ বুনতে (গজানোর হার ৮০%) ৪ টি বীজতলার প্রয়োজন।
- গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪° সেমি দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে।
- প্রতি হেক্টর জমিতে ২২ টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।
- বীজতলায় ৪০-৬০ মেস (প্রতি ইঞ্চিতে ৪০-৬০ টি ছিদ্র যুক্ত) নাইলন নেট দিয়ে ঢেকে চারা উপোদন করলে চারা অবস্থায়ই সাদা মাছি পোকার দ্বারা পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ ছড়ানোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। এরুপ সুস্থ সবল ও ভাইরাসমুক্ত চারা রোপন করে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত বৃষ্টি ও রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে পলিথিন ও চাটাই এর আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ*		*জমি তৈরির সময়*		*১ম উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ১০ দিন পর)*		*২য় উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ২৫ দিন পর)*		*৩য় উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ৪০ দিন পর)*	
	হেক্টরপ্রতি	শতাংশপ্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	১০ টন	৪০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	১২০০ গ্রাম	-	-	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	১০০ কেজি	০.৪ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমওপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	-	-	৯০ কেজি	০.৩৫ কেজি	৬০ কেজি	০.২৫ কেজি

সেচ প্রদান ঃ সেচ ও নিষ্কাশন- চারা রোপনের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে সমান ঢালু হওয়া বাঞ্চণীয়।

মালচিংঃ প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা ঃ ১ম ফুলের গোছার ঠিক নীচের কুশিটি ছাড়া নীচের সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

সাদা মাছি পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- এরা পাতার রস চুষে খায় বলে পাতা কুঁকড়ে যায়।
- এদের আক্রমণে পাতার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা বা হলদে দাগ দেখা যায়। পরে অনেক দাগ একত্রে মিশে সবুজ শিরা সহ পাতা হলুদ হয়ে যায়। সাদা মাছি পোকার নিম্ফ রস খাওয়ার সময় এক ধরনের আঠালো মধুর মত রস নিঃসরণ করে। এই রস পাতায় আটকে গেলে তাতে সুটি মোল্ড নামক এক প্রকার কালো রং এর ছত্রাক জন্মায় ফলে গাছের সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

দমন ব্যবস্থা ঃ

- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
- বীজতলা মশারীর নেট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- হলুদ রংয়ের ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি পরিমাণ) অথবা এডমায়ার ২০০ এস এল (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি পরিমাণ) মিশিয়ে স্প্রে করা। তবে ঘন ঘন কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এর ফলে এ পোকা কীটনাশকের প্রতি দ্রুত সহনশীলতা গড়ে তোলে।

টমেটোর ফলছিদ্রকারী পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- এ পোকার আক্রমনের ফলে টমেটোর গায়ে পুরাতন কালচে বা নুতন ছিদ্র ও পোকার তৈরি সুড়ঙ্গ দেখা যাবে।
- সুড়ঙ্গে কীড়া সহ পোকার বিষ্ঠা ও পচা অংশ নজরে পড়বে।
- কীড়া ফলের ভিতর শরীরের সামনের কিছুটা অংশ ঢুকিয়ে খেতে থাকে এবং পেছনের অংশ ফলের বাইরে থাকে।

এদের কীড়া সম্পূর্ণ ফল নষ্ট না করে অংশ বিশেষ ক্ষতি করে। এভাবে একটি কীড়া অনেক গুলি ফল নষ্ট করে থাকে।

দমন ব্যবস্থা ঃ

- পাকা সহ আক্রান্ত ফল হাত বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করতে হবে।
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন ৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ) স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

হলুদ পাতা কুঁকড়ানো ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- পাতার কিনারা থেকে মধ্যশিরার দিকে গুটিয়ে যায়।
- পাতা খসখসে হয়ে শিরাগুলো স্বচ্ছ হলুদ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। পাতা পীতবর্ণ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের ডগায় ছোট ছোট পাতা গুচ্ছ আকার ধারণ করে।

দমন ব্যবস্থাঃ

- চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর থেকে ৭-১০ দিন পরপর অ্যাডমায়ার নামক বিষ প্রয়োগ করে সাদা মাছি পোকা দমন করতে হবে।
- টমোটোর জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগমুক্ত চারা লাগাতে হবে।
- ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত (প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৪০-৫০ টি ছিদ্র) নাইলনের নেট দিয়ে বীজতলা ঢেকে চারা উৎপাদন করতে হবে। ফল সংগ্রহের দুই সপ্তাহ আগেই স্প্রে বন্ধ করতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- গাছের যে কোন বয়সে এ রোগ দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছ যে কোন সময় ঢলে পড়ে যায়।
- পুরো গাছটি দ্রুত মারা যায় ও ফলন কম হয়।

দমন ব্যবস্থা ঃ

- আক্রান্ত গাছ দেখলেই তা তুলে ধ্বংস করা।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা।
- বুনো বেগুন যথা টরভাম ও সিসিম্ব্রিফলিয়ামের সাথে জোড় কলম করা।

ফলন ঃ শীতকালে জাত ভেদে ৭০-৮০ টন/হেক্টর (২০০-৩৫০ কেজি/শতাংশ)। গ্রীষ্মকালে ৩৫-৪৫ টন/হেঃ।

বেগুন

প্রযুক্তি ঃ বেগুন চাষ

চাষাধীন জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদনের দিক থেকে বেগুন সব্জিসমূহের মধ্যে অন্যতম। বেগুন সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায়। ইহা জনপ্রিয়ও বটে। প্রচলিত ক'টি জাত ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু জাত এবং উপজাত।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি বেগুন-৪ (কাজলা) ঃ উচ্চ ফলনশীল এ জাতটির ফলের আকার মাঝারি লম্বাকৃতি, রং কালচে বেগুনী ও চকচকে। এ জাতটির গাছ খাড়া আাকৃতির। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫ টি। প্রতি ফলের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম। পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা , নোয়াখালি এর জন্য প্রযোজ্য। ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ, কৃমি রোগ এবং জ্যাসিড পোকা সহনশীল, তাপ সহিষ্ণু সারা বছর চাষ করা যায়।

বারি বেগুন-৬ ঃ এই জাতটি উচচ ফলনশীল এবং ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, ফল ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জেসিড (Jassid) এবং নেমাটোড রোগ প্রতিরোধী। ফল ডিম্বাকৃতি, রং হালকা সবুজ। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১৫-১৭ টি এবং প্রতিটি ফলের ওজন ২২৫-২৫০ গ্রাম।

বারি বেগুন-৮ ঃ গ্রীষ্মকালে চাষাবাদের জন্য। গাছ খাড়া আকৃতির এবং মাঝারী লম্বা, রং উজ্জল কালচে বেগুনি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২০-২৫ টি এবং প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। জাতটি ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট এবং ফল ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।

চিত্র : বারি বেগুন-৪

চিত্র : বারি বেগুন-৬

চিত্র : বারি বেগুন-৮

উৎপাদন প্রযক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ জমি। আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

জমি তৈরি ঃ বেগুনের ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১মি: চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উচুঁ বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিস্কাশনের সুবিধা হয়।

বিশেষ পরিচর্যাঃ লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য চাষীরা সাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করে এবং অনেক সময় মালচিং হিসাবে পলিথিন বা খড় ব্যবহার করেন।

বীজের হার ঃ প্রতি হেক্টরের জন্য ১০০-১৩৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন/রোপন সময় ঃ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর (শীতকালে), মে-জুলাই (গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে)।

রোপন দূরত্ব ঃ

বেডের আকার ঃ প্রস্থ ঃ ৭০ সেমি, দৈর্ঘ্য ঃ জমির দৈর্ঘের উপর নির্ভর করবে।

নালার আকার ঃ প্রস্থ ঃ ৩০ সেমি, ***গভীরতা ঃ*** ২০ সেমি।

গাছের দূরত্ব ঃ ১০০ সেমি ×৭৫ সেমি।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ

- সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৫০ গ্রাম সুস্থ বীজ ঘন করে প্রতিটি বীজতলায় (৩মিঃ×১মিঃ) বুনতে হয়।
- এই হিসেবে প্রতি হেক্টরে ১০০-১৩৫ গ্রাম বীজ বুনতে (গজানোর হার ৮০%) ৪ টি বীজতলার প্রয়োজন।
- গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪ সেমি দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টি ও রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে পলিথিন ও চাটাই এর আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ		শেষ চাষের সময় প্রয়োগ		চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০-১৫ টন	৪০-৬০ কেজি	সব	সব	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	১.২ কেজি	-	-	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	সব	সব	-	-
এমওপি	২০০ কেজি	৮০০ গ্রাম	সব	সব	-	-

পরিচর্যা ঃ

সেচ প্রদান ঃ চারা রোপনের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে বেগুন চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। বেগুন গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে সমান ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মালচিং ঃ প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- বেগুনের বোটার নীচে ছোট ছিদ্র দেখা যায়।
- আক্রান্ত কচি ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ফলের ভিতরটা ফাঁপা ও পোকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা পর্যায়ক্রমে অনেক বার বংশ বিস্তার করে থাকে।

দমন ব্যবস্থাঃ

তিনটি ধাপের মাধ্যমে এ পোকা কার্যকরীভাবে দমন করা যায় ঃ

পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা ঃ ফল ধরার আগে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার কীড়া বেগুনের ডগার ভেতর খেয়ে বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন উক্ত কীড়া সমেত আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করে ফেললে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার ঃ

সুক্ষ্ম ছিদ্রসহ প্লাষ্টিকের ছোট টিউবে ২-৩ মিঃ গ্রাঃ পরিমাণ ফেরোমন ভরে টিউবটি একটি পোকা ধরা ফাঁদে ঝুলিয়ে রাখলে তা ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষ মথ আকৃষ্ট করতে পারে, যা পরবর্তীতে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা হয় ।

বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার ঃ ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার বেশ কয়েকটি দেশীয় পরজীবি ও পরভোজী পোকা রয়েছে। এদের মধ্যে পরজীবি পোকা, ট্রাথালা ফ্লেভো-অরবিটালিস ও পরভোজী পোকা যেমন, ম্যনটিড, এয়ার ইউগ, পিঁপড়া, লেডি বিটল, মাকড়সা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার না করা বেগুনের জমিতে এরা প্রচুর পরিমাণে ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকাই কেবল ধ্বংস করে না সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা যেমন, জ্যসিড, সাদা মাছি ইত্যাদির সংখ্যা স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং একান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে ।

পাতার হপার পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- পূর্ণবয়স্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক পোকা পাতার রস চুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে।
- পাতার রস চুষার সময এদের লালা গ্রন্থি থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে আসে যা গাছের পাতাকে প্রথমে কুকড়িয়ে ফেলে পরে ঐ পাতার কিনারা লাল হয়ে যায়।
- আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা লাল হয়ে যায় এবং অবশেষে পাতা ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা ঃ

- প্রতিরোধী জাত যেমন, বারি বেগুন-৬ বা বারি বেগুন-৮ চাষ করা।
- নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
- পাঁচ গ্রাম পরিমান গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।

আক্রমনের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করা যায়।

সাদা মাছি পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

- এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়।
- এদের আক্রমনে পাতার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা বা হলদেটে দাগ দেখা যায়। পরে অনেক দাগ একত্রে মিশে সবুজ শিরা সহ পাতা হলুদ হয়ে যায়।

সাদা মাছি পোকার নিম্ফ খাওয়ার সময় এক ধরনের আঠালো মধুর মত রস নি:সরণ করে। এই রস পাতায় আটকে গেলে তাতে সুটি মোল্ড নামক এক প্রকার কালো রং এর ছত্রাক জন্মায় ফলে গাছের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

দমন ব্যবস্থা ঃ

- ৫০ গ্রাম সাবান/সাবানের গুড়া ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচে সপ্তাহে ২-৩ বার ভাল করে স্প্রে করা।
- ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা।
- হলুদ রংয়ের ফাঁদ ব্যবহার করা।
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এবং আক্রমনের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২মিলি পরিমান) অথবা এডমায়ার ২০০ এস এল (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি পরিমান) মিশিয়ে স্প্রে করা। তবে ঘন ঘন ও বার বার কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এর ফলে এ পোকা কীটনাশকের প্রতি দ্রুত সহনশীলতা গড়ে তোলে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

ঢলে পড়া রোগঃ

ক্ষতির প্রকৃতিঃ

- গাছের যে কোন বয়সে এ রোগ দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছ যে কোন সময় ঢলে পড়ে যায়। পুরো গাছটি দ্রুত মারা যায় ও ফলন কম হয়।

দমন ব্যবস্থাঃ

- আক্রান্ত গাছ দেখলেই তা তুলে ধ্বংস করা।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা।
- বন বেগুন যথা টরভাম ও সিসিম্ব্রিফলিয়ামের সাথে জোড় কলম করা।

ফলনঃ উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে জাতভেদে হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৭০ টন/হেক্টর (১২০-২৫০ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ফলন ২৫-৩৫ টন/হেক্টর।

মিষ্টি কুমড়া

প্রযুক্তি ঃ মিষ্টি কুমড়া চাষাবাদ

কচি মিষ্টি কুমড়া সব্জি হিসেবে এবং পাকা ফল দীর্ঘদিন রেখে সব্জি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পরিপক্ক ফল শুষ্ক ঘরে সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় ৪-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়। পরিপক্ক ফলের বিটা-ক্যারোটিন রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে। মিষ্টি কুমড়া ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রনে কাজ করে। পরিপক্ক ফলের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে প্রোটিন ১.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০০ মিগ্রা, ফসফরাস ৩০.০ মিগ্রা, বিটা ক্যারোটিন ৫০ মাইক্রো গ্রাম এবং ভিটামিন-সি ২.০ গ্রাম। এর কচি ডগা, পাতা এবং ফুল সব্জি হিসেবে খুবই মুখোরোচক। পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালি এর জন্য প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি মিষ্টিকুমড়া-১ ঃ আগাম শীতকালীন জাত। আকর্ষণীয় গাঢ় কমলা রং এর মাংস (Flesh) এবং মিষ্টতা ১১.৫% (TSS ১১.৫%)। প্রতি ফলের ওজন ৪.৫-৫.০ কেজি ।

বারি মিষ্টিকুমড়া-২ ঃ সারা বছর চাষ উপযোগী জাত এবং কাঁচা সবজি হিসাবে ব্যবহারের জন্য উত্তম। মিষ্টতা ১০.৫% (TSS ১০.৫%) প্রতি ফলের ওজন ২.৫-৩.০ কেজি।

চিত্র : বারি মিষ্টিকুমড়া-১

চিত্র : বারি মিষ্টিকুমড়া-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ বা মাঝারী উচুঁ জমি। চরাঞ্চলে পলি মাটিতে মিষ্টি কুমড়ার ভালো ফলন হয়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআশ বা এঁটেল দোঁআশ মাটি এর চাষাবাদের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ঃ মিষ্টি কুমড়া চাষে সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ পরিহার করতে পারলে রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমানো যাবে। এদের ব্যাপক শিকড় প্রনালীর যাথযথ বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরূপে তৈরি করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যাঃ লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য চাষীরা সাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করে এবং অনেক সময় মালচিং হিসাবে পলিথিন বা খড় ব্যবহার করে থাকে।

বীজের হার ঃ প্রতিহেক্টরে ৫-৬ কেজি (প্রতি শতাংশে ২০-২৫ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন/রোপন ঃ শীতকালীন ফসলের জন্য অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এবং গ্রীষ্মকালীন ফসলের জন্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময় তবে বীজ উৎপাদনের জন্য নভেম্বরের মধ্যভাগে বীজ বপন উত্তম।

গাছের দূরত্ব ঃ বেড তৈরি এবং বেড থেকে বেডের দূরত্ব ঃ বেডের উচচতা হবে ১৫-২০ সেমি। বেডের প্রস্থ হবে ৩ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামত নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ নালা থাকবে এবং প্রতি দুবেড অন্তর ৩০ সেমি প্রস্থ শুধু নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি এবং বেডে মাদা হইতে মাদার দূরত্ব ঃ মাদার আকার হবে ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীর ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি। বেডের যে দিকে ৬০ সেমি প্রশস্থ সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। একটি বেডের যে কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দেয়া হবে, উহার পাশ্ববর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরূপ নিয়মে মাদা করতে হবে।

বীজতলা তৈরি ঃ মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য চারা নার্সারীতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিতে হবে। এজন্য, আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ২০-২৫ সেমি উঁচু বেড করে নিতে হবে। বেডের উপর ৪.০ × ৫.২ মি আকৃতির ঘর তৈরি করে নিতে হবে। ঘরের কিনারা বরাবর মাটি হতে ঘরের উচ্চতা হবে ০.৬ মি এবং মাটি হতে ঘরের মধ্যভাগের উচ্চ্তা হবে ১.৭ মি। এ ঘর তৈরির জন্য বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি, ছাউনির জন্য প্লাষ্টিক এবং এগুলো বাঁধার জন্য সূতলী বা দড়ি দরকার হবে।

বীজ বপন ঃ বীজ বপনের জন্য ৮ সেমি × ১০ সেমি বা এর থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য "জো" নিশ্চিত করে (মাটিতে "জো" না থাকলে পানি দিয়ে "জো" করে নিতে হবে। অতঃপর প্রতি ব্যাগে দুইটি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুন মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা ঃ

- নার্সারীতে চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।
- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটি চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- মিষ্টি কুমড়ার চারাগাছে 'রেড পামকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। হাতে ধরে এ পোকা সহজে দমন করা যায়।
- চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত গর্তে লাগাতে হবে। চারা অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও কখনও রেড পামকিন বিটল এর আক্রমন হতে পারে। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বীজের অংকুরোদগম ঃ

মিষ্টি কুমড়ার বীজের খোসা কিছুটা শক্ত। তাই সহজ অংকুরোদগমের জন্য শুধু পরিস্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

মিষ্টি কুমড়া দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফল দিয়ে থাকে। কাজেই এসব ফসলের সফল চাষ করতে হলে গাছের জন্য পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। খাবার সংগ্রহের জন্য শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জন্য মাটি পরীক্ষা সাপেক্ষে সারের মাত্রা সুপারিশ করা হয় নাই। কাজেই যে সব অঞ্চলের জন্য সারের মাত্রা নির্দিষ্ট নেই সেসব অঞ্চলের জন্য পরীক্ষা মূলক প্রমাণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত হারে সারের মাত্রা সুপারিশ করা হলো ঃ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি)*	*মোট পরিমাণ (শতাংশপ্রতি)*	*জমি তৈরির সময় (শতাংশপ্রতি)*
পঁচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
এমওপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-

সারের নাম	মাদা প্রতি				
	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পঁচা গোবর	১০ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	-	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০ গ্রাম	-	-	-	-
এমওপি	৪০ গ্রাম	২০ গ্রাম	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৮ গ্রাম	-	-	-	-

পরিচর্যা ঃ

সেচ প্রদান ঃ মিষ্টি কুমড়া ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। বিশেষ করে ফল ধরার সময় প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ধরা ফলের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঝরে যেতে পারে। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। মিষ্টি কুমড়ার জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হইতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যেতে পারে। শুস্ক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার দরকার।

মালচিং ঃ সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ঘাস মিষ্টি কুমড়ার 'মোজাইক ভাইরাস' রোগের আবাসস্থল। তাই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় বলে গাছে এসবের অভাব পড়ে। ফলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না।

বিশেষ পরিচর্যা ঃ

শোষক শাখা অপসারন ঃ গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালা হয়। সেগুলোকে শোষক শাখা বলা হয়। এগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত ডালপালাগুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়নঃ মিষ্টি কুমড়ার পরাগায়ন প্রাকৃতিক ভাবে প্রধাণতঃ মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্রকৃতিতে মৌমাছির পরিমাণ পর্যাপ্ত নহে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে মিষ্টি কুমড়ার ফলন শতকরা ২৫-৩০ ভাগ বাড়ানো যায়। মিষ্টি কুমড়ার ফুল খুব সকালে ফোটে। ফুল ফোটার পর যত তাড়াতাড়ি পরাগায়ন করা যায় ততই ভালো ফল পাওয়া যাবে। মিষ্টি কুমড়ায় কৃত্রিম পরাগায়ন সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর পুরুষ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আস্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে (যেটি গর্ভাশয়ের পিছনে পাপড়ির মাঝখানে থাকে) ঘষে দেয়া হয়।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

সাদা মাছি পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলো ফলের শাস খায়, ফল পচে যায় এবং অকালে ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধবংস করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার। বিষটোপের জন্য থেতলানো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়ার সাথে ০.২৫ গ্রাম সেভিন ৮৫ পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। বিষটোপ ৩-৪ দিন পরপর পরিবর্তন করতে হয়।

পামকিন বিটল ঃ

ক্ষতির প্রকৃতিঃ পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটু করে খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে, বড় গাছ মেরে ফেলতে পারে।

দমন ব্যবস্থাঃ আক্রান্ত গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন চারা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন/কার্বারিন-৮৫ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২-৫ গ্রাম বাসুডিন/ডায়াজিনন -১০ জি মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

পাউড়ারি মিলডিউ ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ

পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডার বা গুঁড়া দেখা যায় । ধীরে ধীরে এ দাগগুলো বড় ও বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়। কোন একটি লতার পাতায় আক্রমণ বেশি হলে ধীরে ধীরে সেই লতা ও পরে পুরো গাছই মরে যেতে পারে। ফল ঝরে যেতে পারে। দাগ শুকিয়ে গেলে সেখানে আলপিনের মাথার মত কালো কালো বিন্দু দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা ঃ জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। আগাম চাষ করে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। জমির আশে পাশের হাঁতিশুড় জাতীয় আগাছা দমন করা। আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম থিওভিট বা সালফোলাক্স/ কুমুলাস অথবা ১০ গ্রাম ক্যালিক্সিন ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা।

ফলন ঃ হেক্টরপ্রতি ৩০-৪৫ টন (১২০-১৮০ কেজি/শতাংশ) পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব।

করলা

প্রযুক্তি ঃ করলা চাষ

করলা কুমড়া পরিবারভূক্ত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সব্জি। স্বাদে তিক্ত হলেও বাংলাদেশের সকলের নিকট এটি প্রিয় সব্জি হিসেবে বিবেচিত। করলার অনেক ঔষধি গুণ আছে। এর রস বহুমুত্র, চর্মরোগ, বাত এবং হাঁপানী রোগের চিকিৎসার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য করলায় শতকরা ৮৩-৯২ ভাগ পানি, ৪.০-১০.৫ ভাগ শর্করা, ১.৫-২.০ ভাগ আমিষ, ০.২-১.০ ভাগ তেল এবং ০.৮-১.৭ ভাগ আঁশ আছে। অন্যান্য কুমড়া জাতীয় সব্জির চাইতে করলায় অধিক পরিমাণে খনিজ ও খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, খুলনা এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি করলা-১ ঃ বারি করলা-১ জাতটিতে গাঢ় সবুজ রংয়ের ২৫-৩০ টি ফল ধরে (গাছ প্রতি)। প্রতি ফলের গড় ওজন ১০০ গ্রাম যা লম্বায় ১৭-২০ সেমি এবং ব্যাস ৪-৫ সেমি। এ জাতটি ছাড়াও স্থানীয় সহজলভ্য জাতের চাষ হচ্ছে তারমধ্যে টিয়া ও গজ করলা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

চিত্র : বারি করলা-১

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় করলা ভাল জন্মে। পরিবেশগতভাবে এটি একটি কষ্টসহিষ্ণু উদ্ভিদ। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়াতেও এটি জন্মানো যায়, তবে বৃষ্টিপাতের আধিক্য এর জন্য ক্ষতিকর। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে পরাগায়ন বিঘ্নিত হতে পারে। তাই শীতের দু'এক মাস বাদ দিলে বাংলাদেশে বছরের যেকোন সময় করলা জন্মানো যায়। শীতকালে গাছের বৃদ্ধির হার কমে আসে। ভালো ফলন পেতে হলে সারাদিন রোদ পায় এবং পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা আছে এমন স্থানে করলার চাষ করা উচিত। সব রকম মাটিতেই করলার চাষ করা যেতে পারে, তবে জৈব সার সমৃদ্ধ দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। সারা বছর চাষ করা যায়। উচুঁ বেড তৈরি করে লবণাক্ত এলাকায় চাষ করা যায়।

জমি তৈরি ঃ খরিফ মৌসুমে চাষ হয় বলে করলার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বসতবাড়িতে করলার চাষ করতে হলে দু' চারটি মাদায় বীজ বুনে গাছ বেয়ে উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা করলেই হয়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নিদিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। বেডের প্রশ্বস্ততা হবে ১.০ মিটার এবং দু' বেডের মাঝে ৩০ সেমি নালা থাকবে।

বিশেষ পরিচর্যা ঃ লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য চাষীরা স্বাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করে এবং অনেক সময় মালচিং হিসেবে পলিথিন বা খড় ব্যবহার করে।

বীজের হার ঃ করলা ও উচ্ছের জন্য হেক্টরপ্রতি যথাক্রমে ৬-৭.৫ ও ৩-৩.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন/রোপন ঃ বছরের যে কোন সময় করলার চাষ সম্ভব হলেও এদেশে প্রধানত খরিফ মৌসুমেই করলার চাষ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে যে কোন সময় করলার বীজ বোনা যেতে পারে। কেউ কেউ জানুয়ারী মাসেও বীজ বুনে থাকে কিন্তু এ সময় তাপমাত্রা কম থাকায় গাছ দ্রুত বাড়তে পারে না, ফলে আগাম ফসল উৎপাদনে তেমন সুবিধা হয় না। উচ্ছে চাষের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, বছরের যে কোন সময় এর চাষ করা যায়। তবে শীত কালে এটি বেশি চাষ হয়ে থাকে।

গাছের দূরত্ব ঃ উচ্ছের ক্ষেত্রে সারিতে ১.০ মিটার এবং করলার জন্য ১.৫ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ

উচ্ছে ও করলার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন করতে হবে। অথবা পলিব্যাগে (১০ × ১৫ সেমি) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে।

বীজতলা পরিচর্যা ঃ

- নার্সারীতে চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।
- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটি চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- করলার চারাগাছে 'রেড পামকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। হাতে ধরে এ পোকা সহজে দমন করা যায়।
- চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত গর্তে লাগাতে হবে। চারা অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও কষনও রেড পামকিন বিটল এর আক্রমন হতে পারে। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বীজের সহজ অংকুরোদগম ঃ

করলার বীজের খোসা কিছুটা শক্ত। তাই সহজ অংকুরোদগমের জন্য শুধু পরিস্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে এক রাত্রি ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জন্য মাটি পরীক্ষা সাপেক্ষে সারের মাত্রা সুপারিশ করা হয় নাই। কাজেই যে সব অঞ্চলের জন্য সারের মাত্রা নির্দিষ্ট নেই সেসব অঞ্চলের জন্য পরীক্ষা মূলক প্রমাণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত হারে সারের মাত্রা সুপারিশ করা হলো।

সার	*মোট সারের পরিমান*		*জমি ও মাদা তৈরির সময় দেয়*	
	হেক্টরে	*শতাংশে*	*হেক্টরে*	*শতাংশে*
গোবর	১০ টন	৮০ কেজি	সব	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	সব	৩৫০ গ্রাম
এমওপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	৫০ কেজি	২০০ গ্রাম
জিপসাম	৭০ কেজি	৪০০ গ্রাম	সব	৪০০ গ্রাম
জিংক অক্সাইড	১০ কেজি	৫০ গ্রাম	সব	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	৮ কেজি	৪০ গ্রাম	-	৪০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১০ কেজি	৫০ গ্রাম	-	-

সার	*চারা রোপনের ২০ দিন পর*		*চারা রোপনের ৪০ দিন পর*		চারা রোপনের ৬০ দিন পর	
	হেক্টরে	*শতাংশে*	*হেক্টরে*	*শতাংশে*	*হেক্টরে*	*শতাংশে*
ইউরিয়া	৫০ কেজি	***১০ গ্রাম***	৫০ কেজি	***১০ গ্রাম***	৫০ কেজি	***১০ গ্রাম***
এমওপি	৪০ কেজি	***২০ গ্রাম***	৩০ কেজি	***১০ গ্রাম***	৩০ কেজি	-

পরিচর্যা ঃ

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ

- চারা লাগানোর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময় আগাছমুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় বলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না।
- সেচের পর জমিতে চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

সেচ প্রদান ও নিস্কাশন ঃ

- খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। পানির অভাবে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরবর্তীতে ফুল ঝরে যাওয়া, ফলের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া ও ঝরে যাওয়া ইত্যাদি। জুন-জুলাই মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন হয় না। জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য বেড ও নিকাশ নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে করলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
- করলার বীজ উৎপাদনের সময় ফল পরিপক্ক হওয়া শুরু হলে সেচ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা ঃ

- বাউনীর ব্যবস্থা করা করলার প্রধান পরিচর্যা। চারা ২০-২৫ সেমি উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মি উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে।

- কৃষক ভাইরা সাধারণত উচ্ছে চাষে বাউনী ব্যবহার না করে তার বদলে মাদা বা সারির চারপাশের জমি খড় দিয়ে ঢেকে দেয়। উচ্ছের গাছ খাটো বলে এ পদ্ধতিতেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। তবে এভাবে করলা বর্ষাকালে মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজার মূল্য কমে যায় ও ফলে পচন ধরে প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে বলে ফলনও কমে যায়।
- বাউনী ব্যবহার করলে খড়ের আচ্ছাদনের তুলনায় উচ্ছের ফলন ২৫-৩০% বৃদ্ধি পায়। ফলের গুণগত মানও ভালো হয়।
- গাছের গোড়ার দিকের ছোট ছোট ডগা (শোষক শাখা) গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই সেগুলো কেটে দিতে হয়। এতে গোড়া পরিষ্কার থাকে, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উৎপাত কম হয় এবং আন্তঃকর্ষণের কাজ সহজ হয়।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

সাদা মাছি পোকা ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলো ফলের শাস খায়, ফল পচে যায় এবং অকালে ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধবংস করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার। বিষটোপের জন্য থেতলানো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়ার সাথে ০.২৫ গ্রাম সেভিন ৮৫ পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। বিষটোপ ৩-৪ দিন পরপর পরিবর্তন করতে হয়।

পামকিন বিটল ঃ

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটু করে খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে, বড় গাছ মেরে ফেলতে পারে।

দমন ব্যবস্থা ঃ আক্রান্ত গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন চারা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন/কার্বারিন-৮৫ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২-৫ গ্রাম বাসুডিন/ডায়াজিনন -১০ জি মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

পাউডারী মিলডিউ।

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডার বা গুঁড়া দেখা যায়। ধীরে ধীরে এ দাগগুলো বড় ও বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়। কোন একটি লতার পাতায় আক্রমণ বেশি হলে ধীরে ধীরে সেই লতা ও পরে পুরো গাছই মরে যেতে পারে। ফল ঝরে যেতে পারে। দাগ শুকিয়ে গেলে সেখানে আলপিনের মাথার মত কালো কালো বিন্দু দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা ঃ জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। আগাম চাষ করে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। জমির আশে পাশের হাঁতিশুড় জাতীয় আগাছা দমন করা। আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম থিওভিট বা সালফোলাক্স/ কুমুলাস অথবা ১০ গ্রাম ক্যালিক্সিন ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা।

ফলন ঃ উচচ ফলনশীল জাত যথাযথভাবে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৩০-৪৫ টন (১২০-১৮০ কেজি/শতাংশ) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

লাউ

প্রযুক্তি ঃ লাউ চাষ

শীতকালে কুমড়া জাতীয় সব্জির মধ্যে লাউ অত্যধিক জনপ্রিয় সব্জি। লাউয়ের পাতা ও কচি ডগা শাক এবং কচি ফল তরকারী হিসাবে একটি উত্তম খাদ্য। বাংলাদেশে প্রায় বারো মাসেই লাউ-এর আবাদ হচ্ছে। আগে লাউ শুধু বাড়ীর আঙ্গিনায় মাচা তৈরী করে চাষ করা হতো কিন্তু আজকাল জমিতে অন্যান্য ফসলের ন্যায় বানিজ্যিক ভাবে লাউ এর চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, বরিশাল, নোয়াখালি এর জন্য প্রযুক্তিটি প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট ঃ

বারি লাউ-১ ঃ প্রধানত শীত মৌসুমের জাত। এটি লম্বাটে (৪০-৪৫ সেমি) হালকা সবুজ রঙের এবং ফলের ব্যাস ১০ সেমি। গাছপ্রতি প্রায় ১০-১৫ টি লাউ ধরে যার প্রতিটির ওজন গড়ে ১.৫-১.৭ কেজি।

চিত্র : বারি লাউ-১

বারি লাউ-২ঃ আগাম শীত থেকে শুরু করে আগাম গ্রীষ্ম পর্যন্ত ফলন দিয়ে থাকে। এটি তাপ ও অতিবৃষ্টি সহিষ্ণু, ফলে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যম গ্রীষ্ম মৌসুমেও এর চাষ করা যায়। এটি খাটো (১৭-২০ সেমি) হালকা সবুজ রঙের এবং ফলের ব্যাস ১৪-১৭ সেমি। গাছ প্রতি গড়ে প্রায় ২০-২৫ টি বাজারজাতযোগ্য ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৩-১.৬ কেজি। বারি উদ্ভাবিত এ জাতগুলো ছাড়াও স্থানীয় সহজলভ্য জাতের চাষ হচ্ছে।

চিত্র : বারি লাউ-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ ও মাঝারি উচুঁ। লাউ প্রায় সব ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে প্রধানত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআশ বা এঁটেল দোঁআশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ঃ এ ফসল চাষে সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ পরিহার করতে পারলে রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমানো যাবে। এদের ব্যাপক শিকড় প্রনালীর যাথযথ বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরূপে তৈরি করতে হয়।

বেড তৈরি এবং দূরত্ব ঃ বেডের উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি। বেডের প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামত নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ নালা থাকবে এবং প্রতি দুবেড অন্তর ৩০ সেমি প্রশস্থ শুধু নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি এবং মাদার দূরত্ব ঃ মাদার আকার হবে ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীর ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি। বেডের যে দিকে ৬০ সেমি প্রশস্থ সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। একটি বেডের যে কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দেয়া হবে, উহার পাশ্ববর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরূপ নিয়মে মাদা করতে হয়।

বিশেষ পরিচর্যাঃ লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য চাষীরা স্বাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করেন এবং অনেক সময় মালচিং হিসাবে পলিথিন বা খড় ব্যবহার করেন।

বীজের হার ঃ হেক্টরে ৫-৭ কেজি এবং প্রতি শতকে ২০-২৫ গ্রাম বীজের প্রয়াজন হয়।

বপন/রোপন ঃ লাউ সারা বছরই চাষ করা যায়। শীতকালীন চাষের জন্য মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (আগস্ট থেকে অক্টোবর) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে বীজ উৎপাদনের জন্য অক্টোবরের শেষ দিকে বীজ বপন উওম। গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ বপন করতে হয়।

গাছের দূরত্ব ঃ বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ উড়চুঙ্গা পোকা লাউ এর কঁচি চারা কেটে দেয়। এজন্য শুন্যস্থান পূরণ করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কিছু চারা ছোট পলিথিনের ব্যাগে (৮ সেমি × ১০ সেমি) জন্মিয়ে রাখা যেতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের নাম	*মোট পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি)*	*মোট পরিমাণ (শতাংশপ্রতি)*	*জমি তৈরির সময় (শতাংশপ্রতি)*
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
এমওপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-

সারের নাম	*মাদা প্রতি*				
	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	*চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর*	*চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর*	*চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর*	*চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর*
পঁচা গোবর	৯ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	-	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০ গ্রাম	-	-	-	-
এমওপি	৪০ গ্রাম	২০ গ্রাম	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৮ গ্রাম	-	-	-	-

পরিচর্যা ঃ

সেচ দেওয়াঃ লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারণ ব্যাহত হবে এবং যেসব ফল ধরেছে সেগুলোও আস্তে আস্তে ঝরে যাবে। লাউয়ের সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আট্‌কে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

বাউনি দেওয়া ঃ লাউয়ের অধিক ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। লাউ মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

মালচিং ঃ

সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ঘাস লাউয়ের 'মোজাইক ভাইরাস' রোগের আবাস স্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় বলে গাছে এসবের অভাব পড়ে। ফলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। তাই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

শোষক শাখা অপসারন ঃ গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালা হয়। সেগুলোকে শোষক শাখা বলা হয়। এগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত ডালপালাগুলো ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা নিম্নরূপে সনাক্ত করা যায়-

- ফলের গায়ে প্রচুর শুং এর উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নোখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নোখ ডাবে যাবে।
- পরাগায়নের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

লাউয়ের ফলের লম্বা বোঁটা রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা ফল কাটতে হবে। ফল কাটার সময় যাতে গাছের কোনরূপ ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। লাউ ফল যত বেশি সংগ্রহ করা হবে ফলন তত বেশী হবে।

ফলন ঃ হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪৫ টন (১৪০-১৮০ কেজি / শতাংশ) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

ঢেঁড়শ

প্রযুক্তি ঃ ঢেঁড়শ চাষ

ঢেঁড়শ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গ্রীষ্মকালীন সব্জি। দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছেই এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমাদের দেশে ঢেঁড়শ মূলত ভাজি, ভর্তা এবং তরকারীর উপকরণ হিসেবে বাবহৃত হয়। ঢেঁড়শে যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন এ, বি, সি এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিশেষ করে ক্যালশিয়াম, লোহা, আয়োডিন রয়েছে। ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ঢেঁড়স কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল সবজি। সুতরাং এর চাষ বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালি এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ স্থানীয় সহজলভ্য জাতের চাষ হচ্ছে, তবে বারি উদ্ভাবিত বারি ঢেঁড়শ -১ চাষ করা যেতে পারে।

বারি ঢেড়শ-১ ঃ

বারি ঢেড়শ-১ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। সব পত্র কক্ষেই ফুল ও ফল ধরে। গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২০-৩০টি। ফল ৫ শিরা বিশিষ্ট। সবুজ এবং ১৪-১৮ সেমি লম্বা। বীজের রং বাদামী। জীবনকাল ৫ মাস।

চিত্র : বারি ঢেঁড়শ-১

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ ও মাঝারি উচুঁ। দোঁ-আশ মাটি ঢেঁড়শের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করতে পারলে বেলে ধরণের মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মাটি সুনিস্কাশিত হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে উপযোগী অম্লক্ষারত্ব ৬.০-৬.৮।

জমি তৈরি ঃ বৃষ্টির পানি জমে না এবং সারাদিন রৌদ্র পায় এমন স্থানে ঢেঁড়শের চাষ করা উচিত। নিস্কাশনের সুবিধার জন্য জমি কয়েক খন্ডে ভাগ করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

ঢেঁড়শের বীজের খোসা খুব শক্ত, তাই বোনার পুর্বে বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে চুবিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম তাড়াতাড়ি হয়। লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য চাষীরা স্বাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করেন এবং অনেক সময় মালচিং হিসাবে পলিথিন বা খড় ব্যবহার করেন।

বীজের হার ঃ প্রতি হেক্টরে বপনের জন্য ৪-৫ কেজি (১২-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন/রোপনঃ বাংলাদেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঢেঁড়শ লাগানো হয়। তবে বছরের অন্যান্য সময় ও সীমিতভাবে এর চাষ হয়ে থাকে।

গাছের দূরত্ব ঃ সারি থেকে সারি ৬০ সেমি এবং সারিতে গাছ ৫০ সেমি হবে।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ উড়চুঙ্গা পোকা ঢেঁড়শের কচি চারা কেটে দেয়। এজন্য শুন্যস্থান পূরণ করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কিছু চারা ছোট পলিথিনের ব্যাগে (৮ সেমি × ১০ সেমি) জন্মিয়ে রাখা যেতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সার	*মোট পরিমাণ*	*জমি তৈরির সময়*	*চারা গজানোর ২০ দিন পর*	*চারা গজানোর ৪০ দিন পর*	*চারা গজানোর ৬০ দিন পর*
ইউরিয়া	৬০০ গ্রাম	-	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম	সব	-	-	-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম

* মাটির উর্বরতা ভেদে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।

পরিচর্যা ঃ

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ

সময়মত নিড়ি দিয়ে আগাছা সবসময় পরিস্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে ।

পোকামাকড় ও ব্যবস্থাপনা ঃ

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ

ঢেঁড়শের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা ক্ষতির লক্ষণ ডিম থেকে বাদামী রংয়ের কীড়া বের হয়ে ডগা বা কচি ফলে আক্রমন করে। কীড়া ডগা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ভেতরের নরম অংশ কুরে কুরে খায়। আক্রান্ত ডগা নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায় ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- সপ্তাহে অন্তত: একবার মরা বা নেতিয়ে পড়া ডগা, আক্রান্ত ফুল ও ফল সংগ্রহ করে কমপক্ষে একহাত গভীর গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করে পোকার কীড়া বা পুত্তুলি ধ্বংস করা।
- বিকল্প পোষক গাছ যেমন তুলার আবাদ ঢেঁড়শের জমির কাছাকাছি না করা।
- আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে অন্ত:বাহী বিষ ক্রিয়া সম্পন্ন কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে বিষ প্রয়োগের দুই সপ্তাহের মধ্যে খাওয়ার জন্য কোন ফল সংগ্রহ করা যাবে না ।

সাদা মাছি পোকার লক্ষণ ঃ

- ঢেড়শের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকারক পোকা সাদা মাছি পোকা। এ পোকার আক্রমনে ঢেড়শের ফলন কমে যেতে পারে।
- এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে পাতা কুকড়ে যায়। এদের আক্রমণে পাতার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা বা হলদে দাগ দেখা যায়। পরে অনেক দাগ একত্রে মিশে সবুজ শিরাসহ পাতা হলুদ হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- ৫০ গ্রাম সাবান/সাবানের গুড়া ১০ লিঃ পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচে সপ্তাহে ২-৩ বার ভাল করে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা।
- ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২মিলি পারিমাণ) অথবা এডমায়ার ২০০ এমএল (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি পরিমাণ) মিশিয়ে স্প্রে করা।

ফসল সংগ্রহ ঃ ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে ৪০-৪৫ দিনে এবং এর পর বপন করলে ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করে। ফুল ফোটার ৫/৬ দিন পর থেকেই ফল সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত ফলের পরাগায়নের ৭-৮ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফলের বয়স ১০ দিনের বেশি হলে ফল আঁশময় এবং পুষ্টিমান কম হয়। একদিন পর পর প্রতিদিনই ঢেঁড়শের ক্ষেত থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত। কচি ফল সংগ্রহ করলে ফলন সামান্য কমে কিন্তু ফলের স্বাদ ও পুষ্টিমান অনেক বেড়ে যায়।

ফলন ঃ হেক্টরপ্রতি ১৪-১৬ টন।

পুঁইশাক

প্রযুক্তি ঃ পুঁইশাক চাষ

প্রযুক্তির বর্ণনা ঃ পুঁইশাক বাংলাদেশের পাতা জাতীয় সব্জির মধ্যে অন্যতম। এটি খরিফ মৌসুমের প্রধান শাক। এ শাকে প্রচুর পরিমান ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ক্যারোটিন রয়েছে। এ ছাড়াও এটি আশঁ জাতীয় সব্জির মধ্যে অন্যতম বিধায় কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক। পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, খুলনা এর জন্য প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি পুঁইশাক-১ ঃ চারা অবস্থায় পুরো গাছটাই সবুজ। বয়ো:বৃদ্ধির সাথে সাথে কান্ড এবং পাতার শিরা হালকা বেগুনী বর্ণের হয় । পাতা মধ্যম আকারের, নরম ও সবুজ বর্ণের। অধিক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, ঘন ঘন উত্তোলন উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত।

বারি পুঁইশাক-২ঃ চারা অবস্থায় সবুজ থাকে। বয়ো:বৃদ্ধির সাথে সাথে কান্ড কিছুটা বেগুনী হয়। বারি পুঁইশাক-১ এর চেয়ে পাতা প্রশস্থ ও পুরু এবং কান্ডও তুলনামুলক ভাবে মোটা। বার বার কান্ড ও পাতা উত্তোলণ উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত। বারি উদ্ভাবিত এ জাতগুলো ছাড়াও স্থানীয় সহজলভ্য জাতের চাষ হচ্ছে।

চিত্র : বারি পুঁইশাক-১

চিত্র : বারি পুঁইশাক-২

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ ও মাঝারি উচুঁ। সব ধরনের মাটিতেই পুঁইশাক জন্মে তবে সুনিস্কাশিত দোঁ-আশ ও বেলে দোঁয়াশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত।

জমি তৈরি ঃ জমি খুব ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সময় অনুমোদিত মাত্রার সার প্রয়োগের পর বীজ বপন/চারা রোপনের জন্য বেড প্রস্তুত করতে হবে ।

চারা রোপনের জন্য বেড তৈরি ঃ

বেডের প্রস্থ	ঃ	১ মিটার
দৈর্ঘ্য	ঃ	জমির দৈঘ্য অনুযায়ী
উচ্চতা	ঃ	১০-১৫ সেমি
নালার প্রস্থ	ঃ	৩০ সেমি
গভীরতা	ঃ	১৫ সেমি

বিশেষ পরিচর্যাঃ লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করতে হবে।

বীজের হার ঃ

- চারা উত্তোলন পদ্ধতিতে ২-২.৫ কেজি/হেক্টর (৮-১০ গ্রাম/শতাংশ),
- সরাসরি বপন পদ্ধতিতে ৩-৩.৫ কেজি/হেক্টর (১২-১৫ গ্রাম/শতাংশ)

বপন/রোপন ঃ সব্জি উৎপাদনের জন্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত। বীজ উৎপাদনের জন্য মে-জুন মাসে বীজ বপন অথবা পুড়ানো গাছের কান্ড কেটে রোপন করা যায়।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যাঃ

- বীজ তলায় বা পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম। এ ক্ষেত্রে ১ মিটার প্রশস্হ এবং ৩ মিটার লম্বা বেডে ৫ সেমি x ৫ সেমি দূরত্বে দুটি করে বীজ বপন করতে হয়। পলিব্যাগে চারা করলে ১০ সেমি x ১২ সেমি সাইজের পলিব্যাগে ২ টি করে বীজ বপন করতে হবে (সাধারণতঃ ১০০ বর্গ মিটার বীজ তলায় চারা ১ হেক্টর জমিতে রোপণ করা যায়)। চারার বয়স ২০-২৫ দিন হলে মূল জমিতে বা মাদায় চারা রোপণ করতে হবে।
- পুঁইশাকের বীজ সরাসরি বপন বা চারা তৈরি করে রোপণ করা যায় ।
- একক গাছ উৎপাদন পদ্ধতিতে বেডে সারি-সারি এবং গাছের দুরত্ব ১৫ সেমি x ১৫ সেমি দূরত্বে বীজ সরাসরি বপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে গাছ ২০-২৫ সেমি লম্বা হলেই মূলসহ উঠিয়ে বাজারজাত করা যায়।
- কোথাও কোথাও পুঁইশাক মাচাতে চাষ করা হয় সেক্ষেত্রে পাতা ও বীজ সব্জি হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সার	মোট সারের পরিমান		জমি তৈরির সময় + গর্তে প্রয়োগ		চারা রোপনের ১০ দিন পর		চারা রোপনের ৩০ দিন পর		চারা রোপনের ৪৫ দিন পর	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	৫+৫ টন	২০+২০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	৭০০ গ্রাম	৭৫ কেজি	২৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমও পি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	৫০ কেজি	২০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম

আগাছা ব্যবস্থাপনা/ গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া/ ডগা কাটা ঃ

- সময়মত আগাছা পরিস্কার, গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া এবং সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- গাছ যখন ২০-৩০ সেমি লম্বা হয় তখন গাছের মাথার ডগা কেঁটে (Pincing) দিলে গাছের শাখা প্রশাখা বেশি হবে।
- পুঁই শাক মাচায় তুলে দিলে মাচা ১.৫ মিটার উচু হলেই চলবে।
- বীজ উৎপাদন করতে হলে নিচের বয়স্ক পাতাগুলি কেটে পরিস্কার করে দিতে হবে।
- বেশি ফলন পাওয়ার জন্য ফসল কাটার পর অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া এবং এমপি সার উপরি প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ঃ বেড ও নালা পদ্ধতিতে পুঁইশাকের জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। জমিতে রসের অভাব হলে ৭-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। পরিমিত সেচ দেয়া না হলে পুঁইশাকের পাতা আঁশ যুক্ত হয়ে যায় ফলে গুনগতমান, ফলন ও বাজার মূল্য কমে যায়।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

রোগবালাই	*রোগের লক্ষণ*	*দমন ব্যবস্থাপনা*
পাতায় দাগ রোগ (বীজ বাহিত)	পাতায় দাগ পরে ফলে শাকের গুনগত মান ও বাজার মূল্য কমে যায়।	ক) রোগ মূক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ
কান্ডের গোড়া পচা রোগ।	পূঁইশাকের গোড়া পচে যায় ফলে গাছ মরে যেতে পারে।	খ) ব্যাভিষ্টিন বা নোইন (ছত্রাকনাশক) ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ ঃ শাঁক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ১০-১২ টি পাতাসহ কচি ডগা অথবা ৩০-৩৫ দিন বয়সের সম্পূর্ণ গাছ সংগ্রহ করে বাজারজাত করা যেতে পারে।

ফলন ঃ ৫০-৭৫ টন/হেক্টর ।

ডাটা

প্রযুক্তি ঃ ডাঁটা চাষ

ডাঁটা বাংলাদেশের একটি অন্যতম গ্রীষ্মকালীন সব্জি। ডাঁটায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি ও ডি এবং ক্যালসিয়াম ও লৌহ বিদ্যমান। ডাঁটার কান্ডের চেয়ে পাতা বেশি পুষ্টিকর। খুব কম সব্জিতেই এত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। প্রযুক্তিটি পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালি এর জন্য প্রযোজ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বারি ডাটা-১ (লাবনী) ঃ গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী। তবে বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়। কান্ড খাড়া, হালকা বেগুনী রংয়ের, নরম ও কম আঁশযুক্ত। পাতার নিচের অংশ হালকা বেগুনী এবং উপরের অংশ গাঢ় বেগুনী রংয়ের। দ্রুত বর্ধনশীল জাত। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই খাওয়ার উপযোগী হয়।

চিত্র : বারি ডাটা-১

চিত্র : বারি ডাটা-২

বারি ডাটা-২ ঃ গ্রীষ্মকালে চাষপযোগী। তবে বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়। দ্রুত বর্ধনশীল, কান্ড নরম, বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে উত্তোলন উপযোগী হয়। বারি উদ্ভাবিত এ জাতগুলো ছাড়াও স্থানীয় সহজলভ্য জাতের চাষ হচ্ছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উচুঁ বা মাঝারি উচুঁ। বেলে দোআঁশ ধরনের মাটি ডাঁটা চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ঃ জমি গভীর ভাবে চাষ দিয়ে বড় ঢেলা ভেঙ্গে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে এবং শেষ চাষের সময় নির্ধারিত মাত্রায় গোবর, টিএসপি ও এমওপি সার মিশিয়ে দিতে হবে। সারিতে বীজ বপন করলে নিম্নরূপে বেড প্রস্তুত করতে হবে।

বেডের প্রস্থ ঃ ১ মিটার

দৈর্ঘ্য ঃ জমির দৈর্ঘ্যে অনুযায়ী

সারি থেকে সারি ঃ ২৫ সেমি

নালার আকার ঃ প্রস্থ ৩০ সেমি গভীরতা ১৫ সেমি।

বিশেষ পরিচর্যা ঃ লবনাক্ততা প্রশমনের জন্য সাভাবিকের চেয়ে উচুঁ বেড তৈরি করতে হবে।

বীজের হার ঃ

সারিতে বপনের জন্যঃ ১-১.৫ কেজি/হেক্টর (৪-৬ গ্রাম/শতাংশ)।

ছিটিয়ে বপনের জন্য ঃ ২-৩ কেজি/হেক্টর (৮-১২ গ্রাম/শতাংশ)।

বপন/রোপন ঃ ফেব্রুয়ারি থেকে জুন বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত সময়। তবে সেচের ব্যবস্হা থাকলে ডাঁটার বীজ সারা বছরই বপন করা যায়।

গাছের দূরত ঃ ২৫ সেমি সারি থেকে সারি।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ

- সারিতে কাঠির সাহায্যে ১-১.৫ সেমি গভীর লাইন টানতে হবে। লাইনে বীজ বপন করে হাত দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিতে হবে।
- বীজ ছিটিয়ে বপন করলে বীজের সাথে সমপরিমান ছাই বা পাতলা বালি মিশিয়ে নিলে সমভাবে বীজ পড়বে। বপনের পর হালকা ভাবে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।
- বীজ বপনের পর ঝাঝড়ি দিয়ে হালকা করে কয়েক দিন পানি দিতে হবে। তাহলে বীজ দ্রুত এবং সমান ভাবে গজাবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সার	মোট সারের পরিমান		শেষ চাষের সময় প্রয়োগ		বীজ বপনের ২০ দিন পর		বীজ বপনের ৪০ দিন পর	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	-	-	-	-
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	১ কেজি	১২৫ কেজি	৪০০ গ্রাম	৬৭.৫ কেজি	৩০০ গ্রাম	৬৭.৫ কেজি	৩০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	-	-	-	-
এমওপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	-	-	-	-
জিপসাম	৭৫ কেজি	৩০০ গ্রাম	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	-	-	-	-

পরিচর্যাঃ

- গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা আবশ্যক ।
- প্রয়োজন মত জমিতে সেচ দিতে হবে, নাহলে কান্ড দ্রুত আঁশযুক্ত হয়ে ডাটার গুনাগুন ও ফলন কমে যাবে ।
- মাটির চটা ভেঙ্গে মাটি ঝুরঝুরে করে দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং গোড়া পচা রোগ রোধ হয় ।
- চারা গজানোর ৭ দিন পর হতে পর্যায়ক্রমে গাছ পাতলাকরণের কাজ করতে হবে । জাতভেদে ৫-১০ সেমি অন্তর গাছ রেখে বাকী চারা তুলে শাক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ।
- ডাটা যেহেতু দ্রুত বর্ধনশীল ফসল তাই সঠিক সময়ে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে পানি সেচ দিতে হবে ।

পোকামাকড় ও ব্যবস্থাপনা ঃ

জাব পোকা ঃ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক জাব পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের নতুন ডগা বা পাতার রস চুষে খেয়ে থাকে । ফলে পাতা বিকৃত হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও প্রায়শঃ নীচের দিকে কোঁকড়ানো দেখা য়ায় । মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় এদের বংশ বৃদ্ধি বেশি হয় । প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে এদের সংখ্যা কমে যায় ।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যেতে পারে । নিম বীজের দ্রবন (১ কেজি পরিমাণ অর্ধভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) স্প্রে করেও এ পোকার আক্রমন অনেকাংশে কমানো যায় । আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে স্বল্পমেয়াদী বিষ ক্রিয়া সম্পন্ন কীটনাশক ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে) অথবা পিরিমর ৫০ ডিপি (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

মরিচা রোগ ঃ

পাতার নীচে সাদা অথবা হলুদ দাগ দেখা যায় । পরে সেগুলো লালচে বা মরিচা রং ধারণ করে এবং পাতাগুলি মরে যায় ।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ ডাইথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে । স্প্রে করার ১ সপ্তাহ পর ফসল সংগ্রহ করা যাবে ।

এনথ্রাকনোজ বা ফলপঁচা ঃ বীজ ফসল এনথ্রাকনোজে আক্রান্ত হয় । পাতায় গোলাকৃতি দাগ দেখা যায় । আক্রান্ত অংশ খুলে পরে ও পাতা ছিদ্রযুক্ত হয় । কান্ডে লম্বাটে কালো দাগ দেখা যায় । বীজের পরিপুষ্টতা হ্রাস পায় এবং গজানোর ক্ষমতাও কমে যায় ।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ রোগমুক্ত ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে । ঝরণা দিয়ে গাছে পানি সেচ দেওয়া যাবে না । অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যাভিষ্টিন/ নোইন বা একোনাজল বীজ ফসলে আক্রমণের শুরুতেই প্রয়োগ করতে হবে । ডাটার বীজ-ফসলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে বীজ রোগমুক্ত রাখতে হবে ।

ফসল সংগ্রহ ঃ ডাঁটার কান্ডের মাঝামাঝি ভাঙ্গার চেষ্ঠা করলে যদি সহজে ভেঙ্গে যায় তাহলে বুঝতে হবে ডাটা আঁশমুক্ত আছে । এ অবস্থাই ডাটা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় ।

ফলন ঃ শাক হিসাবে হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ টন (৪০-৬০ কেজি/শতাংশ) এবং ডাটা হিসাবে ৪৫-৫০ টন (১৮০-২০০ কেজি/শতাংশ) ।

প্রযুক্তিঃ সর্জান (কান্দি) পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও মৌসুমি মাছ চাষ

উপকূলীয় অঞ্চলে এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত নিয়মিত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হওয়া, অতিবৃষ্টি, উপকূলীয় বিস্তীর্ন এলাকায় বিভিন্ন মাত্রার মৃত্তিকা ও পানির লবনাক্ততা, শুকনা মৌসুমে মৃত্তিকা পানির স্বল্পতা, ভারী কর্দমুক্ত এঁটেল মাটি প্রভৃতি কারনেই পটুয়াখালী অঞ্চলে ধান বাদে শাক-সবজি ও অন্যান্য ফল-মূলের আবাদ অত্যন্ত সীমিত। এ এলাকায় সীমিত পরিসরে যে সবজি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে চাহিদার ন্যূনতম অংশ পূরণ হয় না। এ অবস্থায় যে ফসল উৎপন্ন হয় তা দিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা বহু কষ্টে জীবন ধারণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবিকা অর্জন দুরুহ হয়ে পড়ে এবং চরম অপুষ্টির শিকার হয়। বেডে সারা বছর বিন্যাস ভিত্তিক সবজি ও দ্রুত উৎপাদনশীল ফল এবং বর্ষা মৌসুমে নালায় মৌসুমি মাছ চাষ করা হয়। নালার পানি দিয়ে শুকনা মৌসুমে বেডের সবজি ও ফল গাছে সেচ দেয়া হয়। তবে কৃষক ইচ্ছে করলে অনেক বড় জমিতে সর্জান পদ্ধতির প্রবর্তন করে বাণিজ্যিক ভিতিতে শুধুমাত্র দ্রুত উৎপাদনশীল ফল (যেমন-আপেল কুল/বাউ কুল) আবাদ করে অল্প সময়ে অধিক লাভবান হতে পারে। সর্জান পদ্ধতি অত্র এলাকার জন্য উপযোগী এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক সবজি উৎপাদনের কৌশল হিসেবে উদ্ভাবন করা হয়। পটুয়াখালী লবনাক্ত ও অলবনাক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ বেডে সারা বছর বিন্যাস ভিত্তিক সবজি ও দ্রুত উৎপাদনশীল ফল এবং বর্ষা মৌসুমে নালায় মৌসুমি মাছ চাষ করা হয়। নালার পানি দিয়ে শুকনা মৌসুমে বেডের সবজি ও ফল গাছে সেচ দেয়া হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ মাঝারী নীচু থেকে উঁচু জমি। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ।

জমি তৈরি ঃ একটি মডেল হিসেবে ২৮ মিটার লম্বা এবং ১১ মিটার চওড়া এবং খন্ড জমির প্রয়োজন । বেড তৈরির সময় প্রথমে নালা তৈরির স্থান থেকে ১০-১৫ সেমি মাটি কেটে একপাশে রাখতে হবে এবং বেড তৈরি শেষ হলে তা পুরো বেডের উপর বিছিয়ে দিতে হবে। কমপক্ষে এক মিটার উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। ফলে দুই বেডের মধ্যে প্রায় ১০.৫, ১.৫ ও ১.২৫ মিটার গভীর নালা তৈরি হবে। এভাবে ৫টি বেড তৈরি করতে হবে এবং পরবর্তীতে ৫-৬টি পরীক্ষা বা নালা খোঁড়ার প্রয়োজন হতে পারে। জমির চারপাশে নালা থাকলে তা গরু-ছাগলের আক্রমণকে ফসল রক্ষায় সহায়তা করবে। বেড তৈরি শেষ হলে তার ঢাল কোদাল বা মুগর দিয়ে পিটিয়ে সমান করে দিতে হবে। মাটি কাটার জন্য ব্যয় হয় মাত্র বিশ হাজার টাকা।

অনুমোদিত জাত ঃ বারি উদ্ভাবিত সবজির বিভিন্ন জাত অথবা স্থানীয় কিংবা হাইব্রিড জাতীয় সবজির বিভিন্ন জাত।

বীজের হার ঃ অনুমোদিত মাত্রা

সজান পদ্ধতির মডেল ঃ

স্থান	***ফসল***	
	রবি	***খরিপ***
১ নং বেড	লাল শাক + টমেটো	ঢেঁড়শ
২ নং বেড	সবজি চারা - বেগুন	ডাঁটা + গ্রষ্মকাপলীন টমেটো
৩ নং বেড	লালশাক + ঝাড়সীম/বাঁধাকপি/ওলকপি	মরিচ
৪ নং বেড	পেঁপে	পেঁপে + পুঁইশাক
৫ নং বেড	কলা	কলা + গীমা কলমী
নালার ঢাল	করলা/লাউ	ঝিঙ্গা/চিচিঙ্গা/শসা
বেডের ঢাল	সীম	বরবটি

গাছের দূরত্ব ঃ ওলকপি ও টমেটো ঃ ৫০ সেমি × ৫০ সেমি, ***বাঁধাকপি ঃ*** ৬০ সেমি × ৪৫ সেমি, ***বেগুন ঃ*** ৭৫ সেমি × ৬০ সেমি,

মরিচ ঃ ৫০ সেমি × ৪০ সেমি, ***লাউ এবং শসা ঃ ১.৫*** মিটার × ১.৫ মিটার, ***করলা ঃ*** ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার এবং ***ঢেঁড়শ ঃ*** ৬০ × ৫০ সেমি।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ ওলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পঁচা গোবর সার মিশিয়ে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স বা ভ্যবিষ্টিন দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজন মত সেচ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বীজতলায় আগাছা হলে তা পরিস্কার করতে হবে।

জৈব সার ঃ পঁচা গোবর ৮-১০ টন/হেক্টর। সবটুকু পঁচা গোবর সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/হেক্টর) ঃ

শস্য	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
ডাঁটা	১৬০	১১০	১১০	-	-
ওলকপি	৩২৫	১৮০	২৩০	-	-
টমেটো	৩০০	২০০	২২০	-	-
বাঁধাকপি	৩৭৫	২৫০	২৫০	-	-
বেগুন	৩৭৫	১৫০	১৫০	১০০	-
মরিচ	২১০	৩০০	২০০	১১০	-
লাউ	১৭৫	১৭৫	১৫০	১০০	১২.৫০
করলা	১৭৫	১৭৫	১৫০	১০০	১২.৫০
শসা	১৭৫	১৫০	১৭৫	১০০	১২.৫০
ঢেঁড়শ	১৫০	১০০	১৫০	-	-
পুঁইশাক	১৭৫	১২৫	১২৫	-	-
সীম	২৫	৯০	৬০	০৫	-
গীমাকলমি	১৬০	১২০	১২০	-	-
ঝিঙ্গা/চিচিঙ্গিঁ (গাছপ্রতি)	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৮০ গ্রাম	গোবর ২.৫ কেজি	-
পেঁপে	১২৫০	১২৫০	১২৫০	৬২৫	৫০
	বোরিক এসিড ৫০ কেজি		জৈব সার ৩৭.৫ টন		
কলা	১৬২৫	১০০০	১৫০০	৭৫০	-

পদ্ধতি ও সময়কাল ঃ

বাঁধাকপি ও ওলকপি ঃ শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর, টিএসপি, এক-তৃতীয়াংশ এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার সমান তিন কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ২৫ ও মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

টমেটো ঃ অর্ধেক গোবর ও টিএসপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া এমওপি দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশি ছাঁটাই এর পর চারা লাগানোর ৩য় ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয়।

বেগুন ঃ সমস্ত গোবর, টিএসপি ও এমওপি সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর, ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং ফল ধরার মাঝামাঝি সময়ে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে।

মরিচ ঃ সমগ্র গোবর, টিএসপি, এক-তৃতীয়াংশ এমওপি ও সম্পুর্ণ জিপসাম সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ২৫, ৫০ ও ৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

লাউ, শসা ও করলা ঃ এক-চতুথাংশ গোবর, ১/২ টিএসপি, ১/৩ এমওপি এবং সবটুকু জিপসাম ও দস্তা সার শেষ চাষে সময় মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর ও এমওপি সার গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান চার কিস্তিতে চারা লাগানোর ১৫, ৩৫, ৫৫ ও ৭৫ দিন পর মাদায় প্রয়োগ করতে হবে।

ঢেঁড়শ ঃ সমুদয় গোবর, টিএসপি ও এমওপি শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে চারা গজানোর ২০, ৩৫ ও ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

পুঁইশাক ঃ ইউরিয়া ব্যতিত সব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সীম ঃ অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার পূর্ণ মাত্রায় মাদায় দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া চারা লাগানোর ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ঝিঙ্গা/চিচিঙ্গা ঃ ইউরিয়া ৫০ গ্রাম ও অন্যান্য সার পূর্ণমাত্রায় জমি তৈরির সময় এবং বাকি ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে ১০, ২৫ ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

গীমাকলমি ঃ অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার পূর্ণমাত্রায় জমি তৈরির সময় এবং বাকি ইউরিয়া ৩-৪ কিস্তিতে শাক কাটার পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পেঁপে ঃ ইউরিয়া ও টিএসপি সার ব্যতিত অন্যান্য সমুদয় সার চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। চারা রোপনের ১ মাস পর হতে প্রতি মাসে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও টিএসপি সার গাছের গোড়ার চারিদিকে মাট্রির সাথে এবং গাছে ফুল আসার পরে এর মাত্রা দ্বিগুন করে প্রয়োগ করতে হবে।

সারের ৫০% গোবর, টিএসপি ও জিপসাম জমি তৈরির সময় এবং বাকি ৫০% গোবর, টিএসপি ও জিপসাম এবং ২৫% এমওপি গর্তে দিতে হবে। রোপনের দেড় থেকে দুই মাস পর ৫০% ইউরিয়া ও এমওপি সার গাছের গোড়ার চারিদিকে এবং ২ মাস পর পর ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও এমওপি সার গাছের গোড়ার চারিদিকে মাটির সাথে এবং গাছে ফুল আসার পরে এর মাত্রা দ্বিগুন করে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা ঃ

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ দুই-তিন বার।

সেচ প্রদান ঃ সেচের সংখ্যা ৬-৮ বার। নালা কিংবা নিকটস্থ পুকুর বা খালের অলবণাক্ত পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে।

রোগ বালাই ও ব্যবস্থাপনা ঃ

বাঁধাকপি ও ওলকপি ঃ অল্টারনারিয়া লিফস্পট : পাতায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে। দাগগুলো চাক চাক আকারে পর পর সাজানো কতগুলি বলয়ের মত দেখা যায়। অধিক আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন : পপ্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে রোভরাল মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

টমেটো ঃ টমেটো লিফ কার্ল ভাইরাস : পাতার কিনারা থেকে মধ্যশিরা দিকে গুডঁয়ে যায়। পাতা পীতবর্ণ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের ডগায় ছোট ছোট পাতা গুচ্ছাকারে দেখা যায়।

দমন ঃ চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর এডমায়ার নামক কীটনাশক ১ মিলি/লিটার হারে স্প্রে করে সাদা মাছি দমন করতে হবে।

বেগুন ঃ ফমোপসিস ব্লাইট : পাতায় ছোট ছোট চক্রাকার দাগ দেখা যায়, ধীরে ধীরে পাতা হলুদ হয়ে পড়ে। আক্রান্ত ফলে গোলাকার বাদামী রঙের গর্তের সৃষ্টি করে ফল পঁচিয়ে ফেলে।

প্রযুক্তি ঃ এগ্রোফিসারী মিনি পন্ড

উপকূলীয় অঞ্চলে সবজি আবাদের সুযোগ নেই বললেই চলে। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সবজি চাষ সম্প্রসাণের জন্য পুকুরের পাড় চওড়া করে বছরব্যাপী সবজি আবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুকুরের পাড় চওড়া করে রবি মৌসুমে ওলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া লাউ, শসা ইত্যাদি এবং খরিপ মৌসুমে ঢেঁড়শ, পুইশাক, শসা, করলা ইত্যাদি চাষ করা হয়। এ প্রযুক্তিটি পটুয়াখালী ও বরগুনা এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ মাছ চাষের পাশাপাশি বছর ব্যাপী সবজির সহজ প্রাপ্যতা এবং কোন কারণে মাছের উৎপাদন ব্যহত হলে সবজির উৎপাদন দিয়ে তা পুষিয়ে নেওয়া।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ মাঝারী নীচু থেকে থেকে উঁচু জমি। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ

জমি তৈরি ঃ পুকুরের পাড় কোদাল দিযে কুপিয়ে জমি তৈরি করা হয় এবং মাদা তৈরি করা হয়।

অনুমোদিত জাত ঃ বারি উদ্ভাবিত অনুমোদিত বা সহজ প্রাপ্য সবজির জাত।

বীজের হার ঃ

বপন/রোপনের সময় ঃ রবি মৌসুম-নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ।

খরিপ মৌসুম- জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ।

গাছের দুরত্ব ঃ ওলকপি ও টমেটো ঃ ৫০ সেমি × ৫০ সেমি, ***বাঁধাকপি ঃ*** ৬০ সেমি × ৪৫ সেমি, ***বেগুন ঃ*** ৭৫ সেমি × ৬০ সেমি, ***মরিচ ঃ*** ৫০ সেমি × ৪০ সেমি, ***লাউ এবং শসা ঃ ১.৫*** মিটার × ১.৫ মিটার, ***করলা ঃ*** ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার এবং ***ঢেঁড়শ ঃ*** ৬০ সেমি × ৫০ সেমি।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ ওলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পঁচা গোবর সার মিশিয়ে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স বা ব্যভিষ্টিন দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজন মত সেচ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বীজতলায় আগাছা হলে তা পরিস্কার করতে হবে।

জৈব সারের পরিমাণ ঃ পঁচা গোবর ঃ ৮-১০ টন/হেক্টর।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ সবটুকু পঁচা গোবর সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকার ও পরিমান (কেজি/হে.)

শস্য	*ইউরিয়া*	*টিএসপি*	*এমওপি*	*জিপসাম*	*জিংক সালফেট*
ওলকপি	৩২৫	১৮০	২৩০	-	-
টমেটো	৩০০	২০০	২২০	-	-
বাঁধাকপি	৩৭৫	২৫০	২৫০	-	-
বেগুন	৩৭৫	১৫০	১৫০	১০০	-
মরিচ	২১০	৩০০	২০০	১১০	-
লাউ	১৭৫	১৭৫	১৫০	১০০	১২.৫০
করলা	১৭৫	১৭৫	১৫০	১০০	১২.৫০
শসা	১৭৫	১৫০	১৭৫	১০০	১২.৫০
ঢেঁড়শ	১৫০	১০০	১৫০	-	-
পুঁইশাক	১৭৫	১২৫	১২৫	-	-

প্রযুক্তি ঃ এগ্রোফিসারী মিনি পন্ড

উপকূলীয় অঞ্চলে সবজি আবাদের সুযোগ নেই বললেই চলে। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সবজি চাষ সম্প্রসাণের জন্য পুকুরের পাড় চওড়া করে বছরব্যাপী সবজি আবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুকুরের পাড় চওড়া করে রবি মৌসুমে ওলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া লাউ, শসা ইত্যাদি এবং খরিপ মৌসুমে ঢেঁড়শ, পুইশাক, শসা, করলা ইত্যাদি চাষ করা হয়। এ প্রযুক্তিটি পটুয়াখালী ও বরগুনা এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ মাছ চাষের পাশাপাশি বছর ব্যাপী সবজির সহজ প্রাপ্যতা এবং কোন কারণে মাছের উৎপাদন ব্যহত হলে সবজির উৎপাদন দিয়ে তা পুষিয়ে নেওয়া।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ মাঝারী নীচু থেকে থেকে উঁচু জমি। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ

জমি তৈরি ঃ পুকুরের পাড় কোদাল দিযে কুপিয়ে জমি তৈরি করা হয় এবং মাদা তৈরি করা হয়।

অনুমোদিত জাত ঃ বারি উদ্ভাবিত অনুমোদিত বা সহজ প্রাপ্য সবজির জাত।

বীজের হার ঃ

বপন/রোপনের সময় ঃ রবি মৌসুম-নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ।

খরিপ মৌসুম- জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ।

গাছের দুরত্ব ঃ ওলকপি ও টমেটো ঃ ৫০ সেমি × ৫০ সেমি, ***বাঁধাকপি ঃ*** ৬০ সেমি × ৪৫ সেমি, ***বেগুন ঃ*** ৭৫ সেমি × ৬০ সেমি, ***মরিচ ঃ*** ৫০ সেমি × ৪০ সেমি, ***লাউ এবং শসা ঃ ১.৫*** মিটার × ১.৫ মিটার, ***করলা ঃ*** ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার এবং ***ঢেঁড়শ ঃ*** ৬০ সেমি × ৫০ সেমি।

বীজতলা তৈরি, বীজ বপন এবং বীজতলার পরিচর্যা ঃ ওলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পঁচা গোবর সার মিশিয়ে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স বা ব্যভিষ্টিন দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজন মত সেচ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বীজতলায় আগাছা হলে তা পরিস্কার করতে হবে।

জৈব সারের পরিমাণ ঃ পঁচা গোবর ঃ ৮-১০ টন/হেক্টর।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ সবটুকু পঁচা গোবর সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকার ও পরিমান (কেজি/হে.)

শস্য	*ইউরিয়া*	*টিএসপি*	*এমওপি*	*জিপসাম*	*জিংক সালফেট*
ওলকপি	৩২৫	১৮০	২৩০	-	-
টমেটো	৩০০	২০০	২২০	-	-
বাঁধাকপি	৩৭৫	২৫০	২৫০	-	-
বেগুন	৩৭৫	১৫০	১৫০	১০০	-
মরিচ	২১০	৩০০	২০০	১১০	-
লাউ	১৭৫	১৭৫	১৫০	১০০	১২.৫০
করলা	১৭৫	১৭৫	১৫০	১০০	১২.৫০
শসা	১৭৫	১৫০	১৭৫	১০০	১২.৫০
ঢেঁড়শ	১৫০	১০০	১৫০	-	-
পুঁইশাক	১৭৫	১২৫	১২৫	-	-

বাঁধাকপি ও ওলকপি ঃ শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর, টিএসপি, এক-তৃতীয়াংশ এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার সমান তিন কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ২৫ ও মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

টমেটো ঃ অর্ধেক গোবর ও টিএসপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশি ছাঁটাই এর পর চারা লাগানোর ৩য় ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয়।

বেগুন ঃ সমস্ত গোবর, টিএসপি ও এমওপি সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর, ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং ফল ধরার মাঝামাঝি সময়ে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে।

মরিচ ঃ সমগ্র জৈবসার, টিএসপি, এক-তৃতীয়াংশ এমওপি ও সম্পুর্ণ জিপসাম সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ২৫, ৫০ ও ৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

লাউ, শসা ও করলা ঃ এক-চতুথাংশ গোবর, ১/২ টিএসপি, ১/৩ এমওপি এবং সবটুকু জিপসাম ও দস্তা সার শেষ চাষে সময় মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর ও এমওপি সার গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান চার কিস্তিতে চারা লাগানোর ১৫, ৩৫, ৫৫ ও ৭৫ দিন পর মাদায় প্রয়োগ করতে হবে।

ঢেঁড়শ ঃ সমুদয় গোবর, টিএসপি ও এমওপি শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে চারা গজানোর ২০, ৩৫ ও ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

পুঁইশাক ঃ ইউরিয়া ব্যতিত সব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা ঃ

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ দুই-তিন বার।

সেচ প্রদান ঃ সেচের সংখ্যা ৬-৮ বার। নালা কিংবা নিকটস্থ পুকুর বা খালের অলবণাক্ত পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

বাঁধাকপি ও ওলকপি ঃ অল্টারনারিয়া লিফস্পট : পাতায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে। দাগগুলো চাক চাক আকারে পর পর সাজানো কতগুলি বলয়ের মত দেখা যায়। অধিক আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন : প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে রোভরাল মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

টমেটো ঃ টমেটো লিফ কার্ল ভাইরাস : পাতার কিনারা থেকে মধ্যশিরা দিকে গুডিঁয়ে যায়। পাতা পীতবর্ণ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের ডগায় ছোট ছোট পাতা গুচ্ছাকারে দেখা যায়।

দমন ঃ চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর এডমায়ার নামক কীটনাশক ১ মিলি/লিটার হারে স্প্রে করে সাদা মাছি দমন করতে হবে।

বেগুন ঃ ফমোপসিস ব্লাইট : পাতায় ছোট ছোট চক্রাকার দাগ দেখা যায়, ধীরে ধীরে পাতা হলুদ হয়ে পড়ে। আক্রান্ত ফলে গোলাকার বাদামী রঙের গর্তের সৃষ্টি করে ফল পঁচিয়ে ফেলে।

দমন ঃ প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে প্রোভেক্স দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে এবং প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

মরিচ ঃ এনথ্রাকনোজ : পাতায় বসানো দাগ হয়। ফলে এ দাগ দেখা যায়। পাতা ঝরে পড়ে ও ফল পঁচে যায়।

দমন ঃ ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

লাউ ঃ এনথ্রাকনোজঃ পাতায় গোলাকৃতি দাগ দেখা যায়। কুয়াশায় পাতার পঁচন লক্ষ্য করা যায়। বীজ লাউ পাকার কিছু দিন আগে ফলে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দমন ঃ অনুমোদিত কীটনাশক ব্যাভিস্টিন/নোইন/একোনাজেল আক্রমণের শুরুতেই ২ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।

শসা ও করলা ঃ পাউডারি মিলডিউ : পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের গুড়ার মত দেখা যায়। ধীরে ধীরে এ দাগগুলি বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। কোন লতার পাতায় আক্রমণ বেশি হলে ধীরে ধীরে সেই লতা ও পরে পুরো গাছই মরে যেতে পারে।

দমন ঃ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম থিওভিট বা সালফোলাক্স বা কুমুলাস ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ঢেঁড়শ ঃ মোজাইক : এ রোগে পাতার শিরাগুলো ও ফল হলদে রং ধারণ করে। আক্রমনের মাত্রা বিশি হলে ফলন মারাত্নক কমে যায়।

দমন ঃ এডমায়ার নামক কীটনাশক ১ মিলি / লিটার হারে স্প্রে করে সাদা মাছি গমন করতে হবে।

পুঁইশাক ঃ পাতায় দাগ ও গোড়া পঁচা রোগ : প্রথমোক্ত রোগে পাতায় ব্যাঙের চোখের মত দাগ পড়ে। শাকের গুনগত মান ও বাজার মূল্য কমে যায়। আর শেষোক্ত রোগের কারণে পুঁইশাকের গোড়া পচে যায় এবং গাছ মরে যেতে পারে।

দমন ঃ ব্যাভিস্টিন বা নোইন ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফলন ঃ ওলকপি ২০-২২, টমেটো ৫০-৫৫, বাঁধাকপি ৫০-৫৫, বেগুন ৮-১০, মরিচ ২-৩, লাউ ১৯-২০, করলা ১০-১২, শসা ১৫-১৬, ঢেঁড়শ ১০-১২ এবং পুঁইশাক ৪০-৪৫ টন/হেক্টর।

প্রযুক্তিঃ ধাপে সবজির চারা ও সবজি উৎপাদন

চিত্র : ধাপে সবজির চারা ও সবজি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধ পতিত জমিতে আটকা পরা কচুরিপানা ও টোপাপানা দিয়ে ধাপ তৈরি করা হয়। ধাপে কচুরিপানা ও টোপাপানা পঁচে যথেষ্ট জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। ফলে চারা তৈরি বা সব্জি উৎপাদনে তেমন কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। সেচের প্রয়োজন হয় না তাই চারা/সব্জি উৎপাদন খরচ কম। আগাম সব্জির চারা করে দক্ষিনাঞ্চল তথা দেশের অন্যত্র সরবরাহ করে অধিক আয় করা সম্ভব। এই প্রযুক্তি আগাম শীতকালীন শব্জি উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে। চারা উৎপাদনের পাশাপাশি ভাসমান ধাপে খরিপ সব্জি আবাদ করা হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পানি নেমে গেলে ধাপ মাটির উপর বসে যায় এবং সেখানে শীতকালীন সব্জি আবাদ করা হয়।

প্রযুক্তির এলাকা সমূহ ঃ পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার নিচু জমি যা খরিপ মৌসুমে স্বাভাবিক জোয়ারের পানিতে ৩-৫ ফুট পর্যন্ত প্লাবিত হয় সে সব জমিতে কচুরিপানা দিয়ে ধাপ তৈরি করে শীতকালীন সবজির চারা ও

পানি নেমে যাওয়ার পর সেখানে সবজি উৎপাদন করা হয়।

ধাপ তৈরির প্রণালী ঃ নিচু জমির আবদ্ধ পানিতে ভাসমান কচুরিপানা স্তরে স্তরে সাজিয়ে ধাপ তৈরি করা হয়। কচুরিপানা, টোপাপানা ও দুলালি লতা (স্থানীয় নাম; ঘাস জাতীয় এক ধরণের লতা যা পানিতে জন্মে) সমন্বয়ে তৈরি এক একটি ধাপ সাধারনতঃ ১২০ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া ও ১-১.৫ মিটার গভীর হয়।

বপন সময় ঃ ১৫ জৈষ্ঠ্য থেকে ১৫ আষাঢ় এর মধ্যে ধাপ তৈরি করে ঘাস জাতীয় এক ধরণের লতা পেঁচিয়ে গোল বল তৈরি করে তার ভিতর বীজ দেয়া হয়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বীজ গজিয়ে চারা বের হয়। কার্তিক মাস (নভেম্বর) পর্যন্ত চারা তৈরি ও পাশাপাশি খরিপ সব্জি আবাদ চলতে থাকে।

বপন দূরত্ব ঃ লতা দিয়ে তৈরি বলগুলো পাশাপাশি ঘন করে সাজিয়ে বীজ লাগানো হয়।

সার ব্যস্থাপনা ঃ

ইউরিয়া ঃ প্রতিটি ধাপে ১২০ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া শুধুমাত্র ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ছাড়া অন্য কোন সার প্রযোগ করা হয়না।

ফলন ঃ প্রতিটি ধাপ ১২০ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া থেকে মাসে ৪৫০০-৫০০০ টি চারা উৎপাদন করা যায়।

মোট ব্যয় ঃ একটি ধাপ তৈরিতে আনুমানিক খরচ ৪০০০ টাকা।

মোট আয় ঃ একটি ধাপ থেকে আয় প্রায় ১৮৫০০ টাকা ।

আয় ও ব্যয় অনুপাত ঃ ৪.৬৩ঃ১.০০

প্রযুক্তির নাম ঃ "বসত বাড়ীর বাগানে সবজি চাষ" (লেবুখালী মডেল)

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ অল্প পরিমান জমিতে অনেক প্রকার সবজি আবাদ করা যায়। শাক সবজির ফসল পেতে বেশি সময় লাগে না। তাই একই জমিতে বছরে কয়েকবার সবজি চাষ করা সম্ভব। পুষ্টিহীনতা দূর করা যায় এবং রোগ মুক্ত থাকাও সম্ভব হয়। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বিক্রি করে পরিবারের একটা বাড়তি আয়ও আসতে পারে। পরিবারের লোকেরা নিজেরাই বসত বাড়ির বাগানে কাজ করে অবসর সময় কাটাতে পারেন।

যে এলাকার জন্য প্রযোজ্য ঃ পটুয়াখালী

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

স্থান নির্বাচন ঃ

বাড়ির আংগিনায় যেসব অংশে মোটামুটি সারাদিন রোদ পড়ে এবং বর্ষাকালে পানি দাঁড়ায় না, জোয়ারের পানি উঠে না এমন জায়গা সবজি চাষের জন্য বেছে নিতে হবে। প্রয়োজন বোধে পূর্ব ও দক্ষিন দিকের কিছু গাছপালা কেটে (সম্ভব হলে) সূর্যের আলো প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

জমির পরিমান ঃ একই খন্ডে ৩০ ফুট × ৩০ ফুট বা ৯ মিটার × ৯ মিটার আকারের জমি। চাষীর জমির আকার ও আয়তনের তারতম্য অনুযায়ী মডেল পরিবর্তন করা যেতে পারে। এছাড়াও বাড়ীর ছায়াযুক্ত জমি, ঘরের পার্শ্বস্থান (পীড়া) এবং অফলা গাছে পরিকল্পনা অনুযায়ী বছরব্যাপী বিভিন্ন সবজি ও ফল চাষ করে অতিরিক্ত আয় করা যেতে পারে।

সবজি বিন্যাস ঃ

উম্মুক্ত স্থান ঃ

প্রথম খন্ড ঃ লালশাক + বেগুন - গীমাকলমী

দ্বিতীয় খন্ড ঃ পালংশাক + বাঁধাকপি/ওলকপি – ডাঁটা/ঝিংগা

তৃতীয় খন্ড ঃ ধনিয়াশাক + মূলা - বরবটি - পুঁইশাক

চতুর্থ খন্ড ঃ ধনিয়াশাক - আলু - ঢেঁড়শ - পুঁইশাক

পঞ্চম খন্ড ঃ লালশাক + টমেটো - গীমাকলমী

বেড়ায় লতানো সব্জী ঃ করলা, ঝিঙ্গা ইত্যাদি

ঘরের চালে লতানো সব্জী ঃ কুমড়া, লাউ ইত্যাদি

পুকুড় পাড়/মাচায় ঃ করলা, সিম, লাউ, ঝিঙ্গা, শসা ইত্যাদি

অফলা গাছ ঃ গাছ আলু, ধুন্দল ইত্যাদি

ছায়া/আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান ঃ হলুদ, আদা ইত্যাদি

ঘরের পার্শ্ব স্থান ঃ পেপে, বেগুন ইত্যাদি

জমি/বেড ও নালা তৈরি ঃ নালা খনন করার সময় তার মাটি পার্শ্ববর্তী বেড ও জমিতে দিলে একদিকে যেমন নালা তৈরি হয়ে যাবে, অপরদিকে তেমন সব্জির বেডগুলোও উঁচু হবে। তাতে বেডে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে পারবে না, আবার নালা দিয়ে বাগান থেকে পানি নিষ্কাশন হয়ে যাবে, বাগানের সুবিধামত স্থান বা কোণা দিয়ে বর্ষাকালে নালাগুলোর পানি যেন বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য বাগানের ভিতর থেকে বাইরের দিকে নালা কেটে দিতে হবে। বাগানের মাটিও যেন ক্রমশ সেদিকে ঢালু হয়ে যায় তাও দেখতে হবে।

অনুমোদিত জাত ঃ বারি উদ্ভাবিত উফশী অথবা স্থানীয় উপযোগী জাত।

বীজের হার/বপন/রোপন দূরত্ব ঃ

ফসল	বীজ হার/বপন/রোপন দূরত্ব
ডাটা	৪ গ্রাম
ঝিংগা	১০০ সেমি × ১০০ সেমি
পালংশাক	১৫ সেমি × অবিরত
টমেটো	৬০ সেমি × ৫০ সেমি
গীমাকলমী	৫০ সেমি × অবিরত
আলু	৪০ সেমি × ৩০ সেমি
লালশাক	৪ গ্রাম
বেগুন	৬০ সেমি × ৫০ সেমি
ঢেঁড়শ	৫০ সেমি × ৪৫ সেমি
পুঁইশাক	৫০ সেমি × ৩০ সেমি
মূলা	৪০ সেমি × ৪০ সেমি
বাধাকপি/ওলকপি	৫০ সেমি × ৫০ সেমি

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

বেড নং-০১ ঃ

সবজি বিন্যাস ঃ লালশাক + বেগুন গীমাকলমী

বপন/রোপণসময় ঃ ২০-২৫ অক্টোবর থেকে ১৫-২০ নভেম্বর ১৫-২০ মে

প্রথম লালশাকের বীজ বপন করতে হবে। একই সময়ে বাগানের বেড়ার পার্শ্ববর্তী খালি স্থানে বেগুনের চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হবে। যেসব স্থানে বেগুনের চারা রোপণ করা হবে সেখানকার লালশাক প্রথমদিকে তুলতে

হবে। নির্ধারিত তারিখের ৪-৫ দিন পূর্বে বেগুনের চারা লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট দিয়ে গর্ত ভর্তি করে নির্ধারিত তারিখে চারা রোপণ করতে হবে। বেগুন শেষ হলে গাছ তুলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ৪-৫ দিন রৌদ্রে রেখে পরে সারি করে গীমাকলমীর বীজ বপন করতে হবে।

বেড নং-০২ ঃ

সবজির বিন্যাস ঃ	পালংশাক + বাঁধাকপি	ওলকপি	ডাঁটা	ঝিংগা
বপন/রোপন সময় ঃ	২০-২৫ অক্টোবর	২৫-৩০ নভেম্বর	০১-০৭ মার্চ	২৫-৩০ এপ্রিল

প্রথম পালংশাকের বীজ বপন করতে হবে। একই সময়ে বাগানের বেড়ার পার্শ্ববর্তী খালি স্থানে বাঁধাকপি/ওলকপির চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হবে। যেসব স্থানে বাঁধাকপি/ওলকপির চারা রোপণ করা হবে সেখানকার পালংশাক প্রথমদিকে তুলতে হবে। এই ফাঁকা স্থানে পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট মিশিয়ে নির্ধারিত তারিখে চারা রোপণ করতে হবে। বাঁধাকপি/ওলকপি সংগ্রহ শেষ হলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ৪-৫ দিন রৌদ্রে রেখে পরে সারি করে ডাঁটার বীজ বপন করতে হবে। বেডের দুইপার্শ্বে সারি করে মাদা করে পলিব্যাগে চারা তৈরি করতে হবে। ডাঁটার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে রোপণ করতে হবে এবং মাদার পার্শ্ববর্তী ডাঁটা আগে তুলতে হবে। ঝিঙ্গার চারা রোপণের কমপক্ষে একমাস আগে চারা উৎপাদনের জন্য বীজ বপন করতে হবে।

বেড নং-০৩ ঃ

সবজির বিন্যাস ঃ	ধনিয়াশাক + মূলা	বরবটি	পুঁইশাক
বপন/রোপন সময় ঃ	২০-২৫ অক্টোবর	২৫-৩০ ফেব্রুয়ারী	০১-০৭ মে

ধনিয়া ও মূলার বীজ একত্রে বপন করতে হবে। ধনিয়াশাক ও মূলা তোলার পরে মাদা করে বেডের দুই পাশে দুই সারি বরবটির বীজ বপন করতে হবে। বরবটি উঠে গেলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ৪-৫ দিন রৌদ্রে রেখে পরে সারি করে পুঁইশাকের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের কমপক্ষে একমাস আগে চারা উৎপাদনের জন্য বাগানের পার্শ্ববর্তী স্থানে বীজ বপন করতে হবে।

বেড নং-০৪ ঃ

সবজির বিন্যাস ঃ	ধনিয়াশাক	আলু	ঢেঁড়শ	পুঁইশাক
বপন/রোপন সময় ঃ	২০-২৫ অক্টোবর	০১-১০ ডিসেম্বর	০১-০৭ মার্চ	২৫-৩০ মে

জমি উত্তমরূপে তৈরি করে ধনিয়ার বীজ বপন করতে হবে। ধনিয়াশাক তোলা শেষ হলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে সারি করে আলুবীজ রোপণ করতে হবে। আলু তুলে ভালভাবে বেড তৈরি করে ঢেঁড়শের বীজ সারি করে বপন করতে হবে। ঢেঁড়শের ফলন কমে আসলে গাছ সম্পূর্ণ তুলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ৪-৫ দিন রৌদ্রে রেখে পরে সারি করে পুঁইশাকের চারা রোপণ করতে হবে।

বেড নং-০৪ ঃ

সব্জির নাম ঃ	ধনিয়াশাক	আলু	ঢেঁড়শ	পুঁইশাক
বপন/রোপন সময় ঃ	২০-২৫ অক্টোবর	০১-১০ ডিসেম্বর	০১-০৭ মার্চ	২৫-৩০ মে

জমি উততমরূপে তৈরি করে ধনিয়ার বীজ বপন করতে হবে। ধনিয়াশাক তোলা শেষ হলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে সারি করে আলুবীজ রোপণ করতে হবে। আলু তুলে ভালভাবে বেড তৈরি করে ঢেঁড়শের বীজ সারি করে বপন করতে হবে। ঢেঁড়শের ফলন কমে আসলে গাছ সম্পূর্ণ তুলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ৪-৫ দিন রৌদ্রে রেখে পরে সারি করে পুঁইশাকের চারা রোপণ করতে হবে।

বেড নং-০৫

সবজির বিন্যাস ঃ লালশাক + টমেটো গীমাকলমী

বপন/রোপন সময় ঃ ২০-২৫ অক্টোবর থেকে ২৫-৩০ নভেম্বর ১০-১৫ এপ্রিল

প্রথম লালশাকের বীজ বপন করতে হবে। একই সময়ে বাগানের বেড়ার পার্শ্ববর্তী খালি স্থানে টমেটোর চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হবে। যেসব স্থানে টমেটোর চারা রোপণ করা হবে সেখানকার লালশাক প্রথমদিকে তুলতে হবে। নির্ধারিত তারিখের ৪-৫ দিন পূর্বে টমেটোর চারা লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট দিয়ে গর্ত ভর্তি করে নির্ধারিত তারিখে চারা রোপণ করতে হবে। টমেটো শেষ হলে গাছ তুলে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ৪-৫ দিন রৌদ্রে রেখে পরে সারি করে গীমাকলমীর বীজ বপন করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

ফসল	***সারের পরিমান (গ্রাম/বেড)***			
	ইউরিয়া	***টিএসপি***	***এমওপি***	***গোবর (কেজি)***
ডাটা	২৪০	১৫০	১৮০	১২
ঝিংগা	১৮০	১২০	১২০	০৫
পালংশাক	৩০০	৯০	৭০	১২
টমেটো	৪০০	৩৬০	২৬০	-
গীমাকলমী	৪৮০	২১৬	১২০	১২
আলু	৩১০	২৪০	২৪০	১২
লালশাক	২৬০	১২০	১২০	১২
বেগুন	৩৬০	২৫০	১৯০	-
ঢেঁড়শ	৩০০	১৮০	১৪০	০৬
পুঁইশাক	৩৬০	২৪০	২০০	১২
মূলা	৩৩০	২৪০	২৪০	-
বাধাকপি/ওলকপি	৪০০	১৩০	২৪০	০৬

পরিচর্যা ঃ

বেড়া নির্মাণ ঃ বাগানের চতুর্দিকে অবশ্যই বেড়া দিতে হবে। তা না হলে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ফসল নষ্ট করে ফেলবে। তাই নতুন বাগান তৈরির পরপরই চারিপার্শ্বে জিগা/মাদার গাছের ডাল পুততে হবে। পুরাতন মাছ ধরা জাল দিয়ে ১ মিটার উঁচু করে ঘিরে দিতে হবে। এরপর সুযোগমত চারিদিকে ঢোল কলমী, কাটা মেহেদী বা পাতা বাহার গাছের ডাল ঘন করে লাগাতে হবে যা পরবর্তীতে স্থায়ী বেড়া হিসাবে কাজ করবে। ফলে প্রতি বছর জাল বা বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়ার খরচ কমে যাবে।

ফসল সংগ্রহত্তোর ঃ কাচা অবস্থায় অথবা সব্জী আগে ধুয়ে পরে কাটতে হবে ও কম তাপে, কম সময়ে রান্না করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ ঃ বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ করার জন্য সুস্থ ও সুস্পষ্ট এবং বড় আকারের ফলগুলোকে আগে থেকেই চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে। এসব ফল পাকার পর রোদে ভালভাবে শুকিয়ে মুখবন্ধ প্লাষ্টিকের পাত্রে সংরক্ষন করতে হবে।

লাভ ক্ষতির বিবরণ ঃ

সব্জির নাম	পরিমান (কেজি)	টাকা (আয়)	টাকা (ব্যয়)
লালশাক	৪০	৪০০/-	বিভিন্ন প্রকার সার+ বেড়ার জাল+ খুটি +বিভিন্ন বীজ
পালংশাক	২০	২০০/-	
বাধাঁকপি	২০	২০০/-	
গীমা কলমি	৪০	৪০০/-	
আলু	২০	২০০/-	
ডাটা	৩০	৩০০/-	
মূলা	২০	১৬০/-	
বেগুন	১৫	২২৫/-	
টমেটো	৩০	৩০০/-	
পুঁইশাক	২৫	২৫০/-	
ঢেড়শ	২০	৩০০/-	
করলা	২০	২০০/-	
বরবটি	১০	১২০/-	
লাউ	২০	২০০/-	
কুমড়া	১০	২০০/-	
মোট আয়	৩৪০ কেজি	৩৬৫৫/-	মোট ব্যয় = ২১০০/-
নীট আয় (টাকা)	৩৬৫৫-২১০০ = ১৫৫৫/-		

প্রযুক্তি ঃ শুষ্ক মৌসুমে মাদা ফসলে (সবজি) কলসের মাধ্যমে সেচ প্রদান পদ্ধতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮ টি জেলার ৯৩ টি উপজেলার মৃত্তিকা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততায় আক্রান্ত। লবণাক্ততার কারণে এই এলাকার শস্য নিবিড়তা মাত্র ১৩৩ শতাংশ। শুকনো মৌসুমে এই এলাকার অধিকাংশ জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। কোনও কোনও এলাকায় সীমিত আকারে তিল ও মুগডালের চাষ হয়। আবার দেরিতে পানি নিস্কাশনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো তিল ও ডালের বপন করা সম্ভব হয় না। দেরিতে তিল, ডালের বপনের ফলে তিল, ডাল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ষার পানিতে তা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে এই এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির (লবনমুক্ত) অভাবে আমন ধানের পরে বোরো ধানের চাষও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বিরাট একটি এলাকা পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এই অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র লবণাক্ত কবলিত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে চলেছে। সম্প্রতি এই গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তির নাম "কলস সেচ (Pitcher Irrigation)" প্রযুক্তি। 'কলস সেচ' প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ কলস সেচ (Pitcher Irrigation)

- কলস সেচ প্রযুক্তি শুধুমাত্র মাদা ফসল যেমন ঃ কুমড়া, তরমুজ, উচ্ছে, ঝিংগা ইত্যাদির জন্য উপযোগী।
- যেসব এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির পর্যাপ্ত উৎস থাকে না।
- সেচের পানি অপচয় রোধ ও সুষম ব্যবহার। যেসব এলাকায় পানি সেচের জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা যায়।
- মাটির লবণাক্ততার মাত্রা কমিয়ে ফসল চাষ।

কলস সেচ প্রযুক্তি কার্যপ্রণালী

- একটি সাধারণ আকারের মাটির কলস সংগ্রহ করুন।
- কলসের নিচে ড্রিল মেশিন দ্বারা বলপয়েন্ট কলমের আকারে (পরিধি আনুমানিক ২.২ সেমি) ছিদ্র করতে হবে এবং ঐ ছিদ্রে দেড়-দুই হাত পাট শক্ত করে প্রবিষ্ঠ করতে হবে।
- পাটযুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্রগুলি ও পাটের আঁশ মাটির নিচে থাকে।
- কলসের চারপাশে ৩-৪টি বীজ বপন করতে হবে। তাহলে কলসের চারপাশে চারা গজাবে।
- কলসের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত পাট ধীরে ধীরে পানি বহন করে নিয়ে গাছের গোড়ায় সরবরাহ করবে। এতে মাদা সবসময় ভিজে থাকবে। ফলে মাটির নিচ স্তর থেকে মাদা এলাকায় (গাছের শিকড় সংলগ্ন এলাকায়) লবনযুক্ত পানি উঠে আসবে না এবং এর ফলে মাদা এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ কম থাকবে। সেই সাথে গাছ পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য উপাদান আহরণ করতে পারবে এবং গাছ সতেজ থাকবে।
- কলস সেচ পদ্ধতিতে মাদার লবণাক্ততার পরিমাণ ২.০ থেকে ৩.০ ডিএস/মি. পর্যন্ত কমিয়ে রাখা সম্ভব। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা গেছে, শুকনো মৌসুমে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাদায় সেচ প্রদান করলে যেখানে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮.০ থেকে ১২.০ ডিএস/মি এর মধ্যে থাকে, সেখানে কলস পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে লবণাক্ততার পরিমাণ ৬.৫ থেকে ৮.৫ ডিএস/মি. এর মধ্যে রাখা সম্ভব। এ মাত্রার লবণাক্ততায় মাদা ফসল চাষ করা সম্ভব।

চিত্র : কলস পদ্ধতি সেচসমূহ সবজি চাষ

ফসলের জাত ঃ কুমড়া (সুইটি/স্থানীয়), ঝিংগা (স্থানীয়), উচ্ছে (স্থানীয়), তরমুজ (ওয়ার্ল্ড কুইন ও অন্যান্য)।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমির ও মাটির বর্ণনা ঃ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি। দোআঁশ থেকে এটেল, কিঞ্চিৎ মন্দ থেকে মন্দ নিষ্কাশিত মাটি, অতি আগাম থেকে দেরিতে পানি অপসারিত মাটি, কম থেকে বেশি আহরণযোগ্য রসের অবস্থা সম্পন্ন মাটি, দৃঢ় দৃঢ়তা সম্পন্ন মাটি, মৃদু অম্ল থেকে মৃদু ক্ষার প্রতিক্রিয়াযুক্ত মাটি, অতি সামান্য থেকে অধিক লবণযুক্ত মাটি।

জমি/মাদা তৈরি ঃ সমগ্র জমিতে ৩-৪টি চাষ দিয়ে নির্দিষ্ট দুরত্ব অনুযায়ী মাদা প্রস্তুত করতে হবে।

বীজের ঃ প্রতি মাদায় ৩/৪টি বীজ দিতে হবে।

বপনের সময় ঃ ফেব্রুয়ারী হতে মার্চের প্রথম সপ্তাহ।

গাছের ঘনত্ব ঃ কুমড়াঃ ২.৫×২.৫ মিটার, উচ্ছেঃ ১.৫×১.৫ মিটার, ঝিংগাঃ ২.০×২.০ মিটার, তরমুজঃ ২.০×২.০ মিটার। গজানো বীজ মাদায় বপন করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

জৈব সারের পরিমাণ ঃ গোবর ৪ কেজি/মাদা।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ চারা লাগানোর ৫-৭ দিন পূর্বে মাদা তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

রাসায়নিক সারের পরিমাণ (গ্রাম/মাদা) ঃ

ফসল	সারের পরিমান (গ্রাম/বেড)					
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা	সলুবর
কুমড়া	১১৫	১১৫	৩০	১৭	২১	২
উচ্ছে	৮০	১০০	১০	১০	১৫	-
ঝিংগা	৯০	১০৫	১৫	১২	১৫	-
তরমুজ	১৮০	১৪০	৩০	৩০	৫	৫

পদ্ধতি ও সময়কাল ঃ টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা ও সলুবর চারা লাগানোর ৫-৭ দিন পূর্বে মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া চারা গজানোর ৭ দিন, ২৫ দিন এবং ৩০ দিন পর প্রয়োগ করা হয়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ দুই বার আগাছা দমন করা হয়। লবণাক্ততা কমানোর জন্য প্রতি মাদাতে মাল্‌চ্‌ হিসেবে ধানের খড় ব্যবহার করা হয়।

সেচ প্রদান ঃ কলস খালি হওয়া সাপেক্ষে প্রায় ৩-৪ দিন পর পর কলসে পানি ভর্তি করা হয়।

রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ গাছে পামকিন বিটল ও মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কার্বারিল অথবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্তনের সময়কাল ঃ মে হতে মধ্য জুন।

ফলন (টন/হেক্টরঃ) ঃ কুমড়াঃ ২০, উচ্ছেঃ ৮, ঝিংগাঃ ১০, তরমুজঃ ২০ ।

প্রযুক্তির ঝুকির বিবরণ ঃ কলসের নিরাপত্তার অভাব। কলস ছিদ্র করার সময় ফেটে যাওয়ার ভয়।

প্রযুক্তি ঃ উপকূলীয় এলাকায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে খামার পুকুর প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২৮.৬ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রায় ১০.৫৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত কবলিত। এই লবণাক্ততার কারণে শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে ফসল চাষ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সময়ে মাটির লবণাতক্ততা ৮.০ ডিএ/মি এর উপরে চলে যায়। এছাড়া এই সময়ে নদীর পানির লবণাক্ততা ২৫.০-৩০.০ ডিএস/মি পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। আবার এই এলাকার খালগুলো পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে ফসল চাষের নিরাপদ পানির সংস্থান কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই শুধুমাত্র মাটি ও পানির লবণাক্ততার কারণে এ এলাকায় বোরো ধান চাষসহ অন্যান্য সবজি চাষ সম্ভব হয় না। লবণাক্ততার পাশাপাশি এ এলাকার আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো মন্দ নিস্কাশন ব্যবস্থা। অর্থাৎ জমিতে সময়মতো "জো" আসে না। তাই ইচ্ছা থাকলেও এ এলাকার কৃষকেরা রবি ফসল চাষ করতে পারেন না। এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুকনো মৌসুমে সীমিত আকারে তিল ও মুগডালের চাষ হয়ে থাকে। তবে দেরিতে বীজ বপনের ফলে, দেরিতে ফল পরিপক্ক হয়। অর্থ্যাৎ তিল ও মুগডাল ঘরে তোলার আগেই বর্ষার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ খামার পুকুর প্রযুক্তি এমন একটা প্রযুক্তি যাতে উপকূলীয় এলাকায় একটি খামারের মধ্যে পুকুর কেটে ঐ পুকুরে বর্ষাকলের পানি জমিয়ে রেখে সেই পানি দিয়ে শুকনো মৌসুমে ফসল চাষ করা। এই প্রযুক্তিকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তিও বলা হয়। এছাড়া উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানি পুকুরে সংরক্ষণপূর্বক শুকনো মৌসুমে সেচ কাজে ব্যবহার।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমি ও মাটির বর্ণনা ঃ উঁচু জমি হতে নিচু জমি ।

খামার-পুকুর প্রস্তুত প্রণালী ঃ

- কোনও একটি জমির পাঁচ ভাগের একভাগ জমিতে মোটামুটি ৬-৭ হাত গভীরতার ১ টি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে ।
- জমির যে অংশটা অপেক্ষাকৃত নীচু সে অংশে পুকুরটি খনন হবে ।
- পুকুরের চারদিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে হবে, যাতে পানি আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।
- বাঁধের উচ্চতা হবে দুই থেকে আড়াই হাত ও প্রস্থ হবে তিন থেকে চার হাত ।

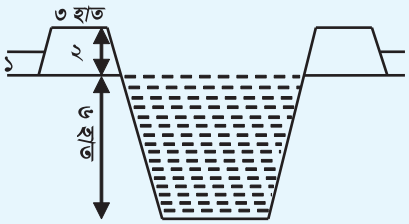

চিত্র : পুকুরের লেআউট

- অবশিষ্ট মাটি দিয়ে ঐ জমির বাকী চার ভাগ ভরাট করতে হবে । এতে জমিটা প্রায় ১ হাত উচুঁ হবে । ফলে ঐ জমির নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং রবি মৌসুমে সময়মত জো আসবে এবং বীজ বপন করা সম্ভব হবে । যেটা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না সময় মত জো না আসার ফলে ।
- জমিতে এমনভাবে ফেলতে হবে যাতে উপরের মাটি উপরে থাকে । কারণ উপরের মাটিতে পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে । কোনও ভাবেই নিচের মাটি যেন উপরে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- উপকূলীয় অঞ্চলের কোথায়ও কোথায়ও কষ মাটির উপস্থিতি আছে । এরূপ ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য ফসল আবাদ/মাছ চাষ উভয় ক্ষেত্রেই চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে ।
- এছাড়া, মাঠের চারিদিকের পাড়/বাঁধ দিতে যাতে বর্ষাকালে মাঠের অতিরিক্ত পানি সহজে পুকুরে এসে জমা হতে পারে ।
- ভূমির নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য জমিটিকে ভালভাবে সমতল করতে হবে । এতে করে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যাবে । যাতে করে সর্বত্র উদ্ভিদের পানি ও পুষ্টি উপাদানের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা হবে ।
- এছাড়া ঐ জমির লবন নিচে চুইয়ে যাবে ।

কয়েকটি খামার পুকুর প্রযুক্তির লেআউট

চিত্র : খামারের মধ্যে পুকুর

চিত্র : খামারের কোনায় পুকুর

চিত্র : খামারের পাশে পুকুর

ফসলের জাত ঃ কুমড়া (সুইটি/স্থানীয়)।

বীজের হার ঃ কুমড়াঃ প্রতি মাদায় ৩/৪টি বীজ।

বপনের সময় ঃ ফেব্রুয়ারী হতে মার্চের প্রথম সপ্তাহ গজানো বীজ মাদায় বপন করা হয়।

গাছের দূরত্ব ঃ কুমড়াঃ ২.৫ মিটার × ২.৫ মিটার।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

গোবর ৪ কেজি/মাদা। ইউরিয়া-১১৫, এমওপি-৩০, জিপসাম-১৭, দস্তা-২১, সলুবর-২ গ্রাম/মাদার।

পদ্ধতি এবং সময়কাল ঃ চারা লাগানোর ৫-৭ দিন পূর্বে মাদা তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা ও সলুবর চারা লাগানোর ৫-৭ দিন পূর্বে মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া চারা গজানোর ৩০ ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করা হয়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ দুই বার আগাছা দমন করা হয়। লবণাক্ততা কমানোর জন্য প্রতি মাদাতে মাল্‌চ্‌ হিসেবে ধানের খড় ব্যবহার করা হয়।

সেচ প্রদান ঃ প্রতি ২-৩ দিন পর পর ফসলের চাহিদা মোতাবেক।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ গাছে পামকিন বিটল ও মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কার্বারিল অথবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্তনের সময়কাল ঃ মে হতে মধ্য জুন।

ফলন ঃ কুমড়া ঃ ২০ টন/হেক্টর।

পান

প্রযুক্তি ঃ পান চাষ

বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলার বিস্তীর্ন এলাকায় পান চাষ হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

বৈশিষ্ট্য	ঃ	বারি পান-১	বারি পান-২	বারি পান-৩
পানের স্বাদ	ঃ	অপেক্ষাকৃত কম ঝাঁঝালো	বারি পান- ১ এর তুলনায় বেশি ঝাঁঝালো	ঝাঁঝালো এবং সুগন্ধযুক্ত
পাতার আকার	ঃ	বড়	বড়	মাঝারি
পাতার আকৃতি	ঃ	ডিম্বাকৃতি ও প্রশস্ত	ডিম্বাকৃতি ও প্রশস্ত	উপ- বৃত্তাকার
পাতার পুরুত্ব	ঃ	কম পুরু	অপেক্ষাকৃত বেশি পুরু	বেশি পুরু
পাতার শীর্ষ	ঃ	শীর্ষদেশ চোখা	শীর্ষদেশ অপেক্ষাকৃত বেশি চোখা ও ক্রমান্বয়ে সুচালো	বারি-২ এর তুলনায় বেশি চোখা এবং বেশি সুচালো
পাতার রঙ	ঃ	সবুজ	অপেক্ষাকৃত গাঢ় সবুজ	কালচে সবুজ
পাতার বোঁটা	ঃ	খাটো	অপেক্ষাকৃত লম্বা	বারি- ১ এর তুলনায় খাটো
পাতার ভিতরের পৃষ্ঠা	ঃ	মসৃণ, শিরাগুলো সবুজ	মসৃণ, শিরাগুলো সবুজ	মসৃণ, শিরাগুলো গোলাপী
পাতার গঠন	ঃ	নরম	নরম	তুলনামূলক শক্ত
সাধারণ পদ্ধতিতে ১০ দিন সংরক্ষণের পর পানি হ্রাসের পরিমাণ	ঃ	২৮.৫৫%	২৮.৩১%	৩৩.০৯%
সাধারণ পদ্ধতিতে ১০ দিন সংরক্ষণের পর জীবাণুর আক্রমণে পচাঁ পানের হার।	ঃ	৫৫.১২%	৬৩.৫৬%	৫২.২১%

চিত্র : পান গাছ

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

জমির ধরন ঃ পান চাষের জন্য সাধারণত পুকুর বা জলাশয়ের ধারে উঁচু জমি নির্বাচন করা উচিত। দীর্ঘকাল পতিত অবস্থায় আছে এমন এঁটেল জমিও পান চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। পান চাষের জমি নির্বাচনের সময় দু'টি বিষয় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত জমি যেন পর্যাপ্ত উঁচু হয় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে এবং জমির কাছে যেন সেচের পানির উৎস থাকে।

মাটির ধরন ঃ পান চাষের জন্য সুনিস্কাষিত উর্বর মাটি প্রয়োজন। পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ এবং সুনিস্কাশিত দো-আঁশ, কর্দম দো-আঁশ এবং পলি দো-আঁশ মাটি পান চাষের উপযুক্ত।

জমি তৈরির প্রণালী ঃ জমির আয়তনের উপর ভিত্তি করে চলাফেরার সুবিধার্থে কয়েকটি খন্ডে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতিটি খন্ডে কতগুলো বেড/কান্দি তৈরি করা হয়। এ কান্দিগুলোতে পান গাছ লাগাতে হবে। কান্দিগুলো দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা হবে। প্রতিটি কান্দি ৫০ সেমি চওড়া এবং ১৫ সেমি উঁচু হবে। এক কান্দি থেকে অন্য কান্দির দুরত্ব হবে ৪০-৫০ সেমি। প্রতিটি কান্দিতে ২০-২৫ সেমি পরপর লতা লাগাতে হবে।

বীজের হার ঃ রোপণ দূরত্ব অনুযায়ী হেক্টরে আশি হাজার থেকে এক লক্ষ কাটিং প্রয়োজন হয়।

রোপন/কাটিং তৈরি ঃ পানের বংশ বিস্তার লতার মাধ্যমে করা হয়। এই লতাগুলোকে কাটিং বলা হয়। যে কোন ধরণের লতা হতে কাটিং তৈরি করা যায় তবে ভাল কাটিং তৈরির জন্য সুস্থ, সবল ও নীরোগ বীজ লতা বাছাই করে উক্ত বীজ লতা হতে ৭-৮ মাস পান সংগ্রহ বন্ধ রাখতে হবে। বীজ লতার বয়স ২-৩ বৎসরের মধ্যে হলে ভাল হয়। পানের লতার উপরের, মাধ্যমের বা গোড়ার যে কোন অংশ কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে উপরের ও মাঝের অংশ গোড়ার অংশের তুলনায় ভাল। উপরের এবং মাঝের লতাগুলো অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি নতুন কুশি ও শিকড় ছাড়তে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপরের এবং মাঝের অংশের লতার দ্বারা তৈরি কাটিং গোড়ার অংশের তুলনায় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে। সাধারণত কাটিং এর দৈর্ঘ্য ৩০-৪৫ সেমি এর মধ্যে হলেই ভাল। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিটি কাটিং এ ৪-৫ টি পাতা থাকে। এ ধরনের বীজ লতা হতে কাটিং সংগ্রহ করে প্রায় ৮০ টির মত কাটিং একত্রে বেধেঁ একটা বান্ডিল তৈরি করা হয়। তাপমাত্রা বেশি ও বৃষ্টিপাত কম হলে এ বান্ডিলে কাদা মেখে ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। এভাবে দৈনিক ২-৩ বার নতুন করে কাদা লাগাতে হয় অথবা পানি দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া কাদা নরম করে দিতে হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে পর্বসন্ধি হতে নতুন শিকড় বের হলে কাটিং লাগানো যায়। কাটিং ৪ দিনের বেশি রাখা ভাল নয়। কারণ বেশি দেরি করে লাগালে কাটিং মারা যাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়।

বপন সময় ঃ জলবায়ুর তারতম্যের উপরে ভিত্তি করে রোপণের সময় বিভিন্নরকম হতে পারে। প্রধানতঃ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত এর উপরই রোপণ সময় নির্ভর করে। রোপণ মৌসুমে আর্দ্র এবং উষ্ণ আবহাওয়া থাকতে হয়। ঠান্ডা আবহাওয়াতে লতার পরিস্ফুটন ও বৃদ্ধি ব্যবহত হয় এবং শিকড় ছাড়তে সময় লাগে। রোপণকালীন সময়ে মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে তবে অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা জমে থাকা পানি রোপণকৃত লতায় রোগের সংক্রমণ ঘটায়, কুশি ছাড়তে দেরি হয় এবং আগা শুকিয়ে যায়। দেশের দক্ষিনাঞ্চলে সাধারনত বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পান লাগানো হয়ে থাকে।

বপন দূরত্ব ঃ ৪০-৫০ সেমি ব্যবধানে কান্দি তৈরি করে কান্দিতে ২০-২৫ সেমি সেমি পরপর লতা লাগাতে হবে। তবে সাধারণত কাটিং এর দৈর্ঘ্য ৩০-৪৫ সেমি এর মধ্যে হলেই ভাল। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিটি কাটিং এ ৪-৫ টি পাতা থাকে।

সার ব্যস্থাপনা ঃ

সারের নাম	নতুন বরজ	পুরাতন বরজ
গোবর	১৫-২০ টন	-
খৈল	৬ টন	৪ টন
ইউরিয়া	১৩০ কেজি	১৮০ কেজি
টিএসপি	২২০ কেজি	১৫০ কেজি
এমওপি	৩৬ কেজি	৩৬ কেজি
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০ কেজি
জিংক সালফেট	১৫ কেজি	১৫ কেজি

সাধারণতঃ পানের লতা লাগানোর পূর্বে কোন সার প্রয়োগ করা হয়না। তবে মাটির উর্বরতা কম হলে শেষ চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ১৫ টন পঁচা গোবর সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমানে রোপণের পূর্বে শেষ চাষের সময় জমিতে টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

সেচ প্রদান ঃ আমাদের দেশে বর্ষাকালে খুব ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হয় বলে এসময় সেচের প্রয়োজন হয় না বরং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হয়। সেচ প্রদানের সময় একটা বিষয় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এ পানি কোন অবস্থাতেই আধা ঘন্টার বেশি জমে না থাকে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে রবি মৌসুমে এবং খরাপীড়িত খরিপ মৌসুমে পান ক্ষেতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত সেচের পানি বা বৃষ্টির পানি জমে থাকলে মূল পঁচে যায় এবং পাতা পড়ে যায়। তাই সাধারণতঃ সকাল বেলা সেচ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পানের জন্য গাছের যখন লতা নামানো হয় তখন স্বাভাবিকের তুলনায় ঘন ঘন সেচ দিতে হয় এবং গাছ যখন পূর্ণমাত্রায় ফলনশীল অবস্থায় থাকে তখন অপেক্ষকৃত কম সেচ দেয়া উচিত।

গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ঃ সেচ প্রদান, আগাছা পরিষ্কার, সার প্রয়োগ, লতা নামানো প্রভৃতি কারণে গাছের গোড়ার মাটি সরে যায়। এতে শিকড় বেরিয়ে গিয়ে গোড়া দূর্বল হয়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। বছরে কমপক্ষে একবার বাইরে থেকে ঝুরঝুরে মাটি এনে গোড়ায় দিতে হবে। এটা বর্ষার শেষে করলে ভাল হয়।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতি বছর কৃষকেরা পান চাষে বিভিন্ন সমস্যার সম্মখীন হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এসমস্যাগুলোর মধ্যে রোগবালাই অন্যতম। তন্মধ্যে পাতা পঁচা, ক্ষতরোগ, লতাপঁচা বা ঢলে পড়া, গোড়া পঁচা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাতা পচাঁ, লতা পঁচা ও গোড়া পচাঁ রোগঃ

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ পাতা পঁচা বা লতাপঁচা কান্ড রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে দুই গ্রাম রিডোমিল এম জেড-৭২ ডব্লিউ পি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর তিনবার স্প্রে করতে হবে।

পাতার ক্ষত রোগ দমনের জন্য নোইন-৫০ ডব্লিউ পি, নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে দুই গ্রাম অথবা ডাইথেন এম-৪৫ একই মাত্রায় মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর তিনবার স্প্রে করতে হবে।

গোড়া পঁচা বা মূল পঁচা দমনের জন্য ভিটাভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম হিসাবে অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলিলিটার পরিমাণ মিশিয়ে আক্রান্ত ও সুস্থ গাছের গোড়ায় ১২-১৫ দিন অন্তর তিনবার ঢেলে মাটি ভিজিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড় ও ব্যবস্থাপনা ঃ পান অনিষ্টকর কীটপতঙ্গের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পানের সাদামাছি, শোষক পোকা, ছাতরা পোকা ইত্যাদি।

দমন ঃ পূর্ণাঙ্গ সাদা মাছি ও এদের অপূর্ণাঙ্গ নিস্ফ পান পাতার ও কচি ডগার রস চুষে খায় এবং শোষক পোকাও পাতার রস চুষে খায়। মার্চ মাস হতে শুরু করে আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের আক্রমন অধিক হয়ে থাকে। তাছাড়া ছাতরা পোকার আক্রমনে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পাতা ছোট ও বিকৃত হয়ে যায়। এ পোকা গুলো দমনের জন্য ক) ম্যালাথিয়ন ৫৭ ই সি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার পরিমাণ মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ১৫-২০ দিন পর পর ছিটাতে হবে। অথবা খ) সিমবুশ ১০ ই সি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার পরিমাণ মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৭-১০ তিন পর পর ছিটাতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ সাধারণত পানের লতা লাগানের ৬-৮ মাসের মধ্যে পাতা তোলার উপযুক্ত হয়। রবি মৌসুমে দেরিতে এবং খরিপ মৌসুমে দ্রুত পান সংগ্রহ করা যায়। এ ছাড়া মাটি, আবহাওয়া, রোপণ পরবর্তী যত্ন, সার প্রয়োগ, পানের জাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি পান সংগ্রহ করা যাবে। একবার পান সংগ্রহ শুরু হলে এটা পরবর্তীতে অনবরত চলতে থাকে। বর্ষাকালে সর্বাধিক সংখ্যক পান সংগ্রহ করা যায়। এ সময়ে প্রতিটি লতা হতে সপ্তাহে দু'বার পরিপক্ক পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু রবি মৌসুমে এবং খরার সময়ে মাসে মাত্র একবার পাতা সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য এ সময়ে নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে পাতা সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

ফলন ঃ বারি পান-১ ঃ ৩৬ লক্ষ পাতা/বছর/হেঃ (১৮.০০ টন/হেঃ), বারি পান-২ ঃ ৪০ লক্ষ পাতা/বছরে/হেঃ (১৪.০০ টন/হেঃ) এবং বারি পান ৩ ঃ ৩২ লক্ষ পাতা/বছর/হেঃ (১০.২৫ টন/হেঃ)।

মোট ব্যয় ঃ টাকা ৩৯৬০০০/ হেক্টর।

মোট আয় ঃ টাকা ৮৮০,০০০/হেক্টর।

আয় ও ব্যয় অনুপাত ঃ ২.২২ ঃ ১.০০।

মৎস্য

মৎস্য চাষের কলাকৌশল

প্রযুক্তি ঃ পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্টঃ মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়া চাষ অত্যন্ত লাভ জনক। স্বাদু ও লবনাক্ত পানিতে এ মাছ সহজে চাষ করা যায়। পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়া একক ভাবে চাষ করলে বেশি লাভ পাওয়া যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পুকুর প্রস্তুত প্রনালী ঃ পুকুরের পাড় মেরামত, জলজ আগাছা পরিস্কার এবং অবাঞ্চিত মাছ দূর করে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ আবশ্যক। পানির গভীরতা ৩-৫ ফুট থাকে এমন ছোট বড় যে কোন পুকুর। চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৮-১০ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের ১ সপ্তাহের মধ্যে পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্র : মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ

মাছ ছাড়ার সময় ও পোনার ঘনত্ব ঃ ডিসেম্বর-জানুয়ারী বাদে সারা বছর। প্রতি শতাংশে ১৫-২০ গ্রাম ওজনের সুস্থ সবল ২৫০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্যের উৎস্য ঃ পোনা মজুদের পর ২৫% প্রোটিন সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রতিদিন পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট দেহ ওজনের ৩-১০% হারে।

সার প্রয়োগ ঃ ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পোনা মজুদের ১৫ দিন পর পর পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। পানি পরিবর্তন করতে পারলে ভাল হয়।

রোগের বিবরণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ তেলাপিয়া একটি উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাছ। তবে উচ্চ মজুত ঘনত্ব ও বদ্ধ জলজ পরিবেশে পরিত্যক্ত খাবার, মাছের বিপাকীয় বর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা পঁচনের ফলে পানি দূষিত হয়ে অনেক সময় রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। সাধারণত তেলাপিয়া প্রটোজোয়ান প্যারাসাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতাংশে ১.৫-২.০ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হবে। দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য আক্রান্ত মাছকে ১,০০০ লিটার পানিতে ২৫-৩০ মিলিলিটার ফরমালিন মিশিয়ে ৫-১০ মিনিট গোসল করাতে হবে। অনেক সময় তেলাপিয়া স্ট্রেপটোকক্কাস ও এরোমোনাড সেপটিসেমিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এরূপ হলে ৫০-৭৫ মি.গ্রা. ইরাইথ্রোমাইসিন বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রতি কেজি খাদ্যে মিশিয়ে ৪-৭ দিন খাওয়াতে হবে।

আহরনের সময়কাল ও প্রযুক্তি ঃ ৪-৬ মাস। পুকুরে পোনা মজুদের ৪ মাসের মধ্যে প্রতিটি তেলাপিয়া মাছের ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এ অবস্থায় পুকুর শুকিয়ে সমস্ত মাছ আহরণ করতে হবে।

উৎপাদন (টন/হেঃ) ঃ ৮-৯ টন মাছ/হেক্টর।

প্রযুক্তি ঃ গলদা চিংড়ি ও মনোসেক্স তেলাপিয়ার মিশ্র চাষ।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ মনোসেক্স তেলাপিয়া জলবায়ুর পরিবর্তন, লবনাক্ততার ব্যপক পরিবর্তন সহজেই সহ্য করতে পারে। গলদা চিংড়ি সর্ব বৃহৎ ও দ্রুত বর্ধনশীল। এর অর্থনৈতিক গুরত্বও সবচেয়ে বেশি। ৫-৬ মাসের মধ্যে বাজারজাত করা যায়।

অনুমোদিত প্রজাতি ঃ মনোসেক্স তেলাপিয়া ও গলদা চিংড়ি ।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পানির অবস্থান ঃ প্লাবন ও দুষনমুক্ত ঘের ৩০-৫০ শতাংশ হলে ভাল হয় ।

পানির বর্ননা ঃ ৩-৫ ফুট পানি ।

ঘের প্রস্তুত প্রনালী ঃ ঘের শুকিয়ে তলদেশের কাদা/পলি অপসারন করে, তলদেশ সমান করে, পাড়/বাধ মেরামত, তলদেশে চাষ দেয়া, ছাকনী স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা । অবাঞ্চিত মাছ দূর করে প্রতি হেক্টরে ২৫০ কেজি হারে চুন ও ১২০-১২৫ কেজি/হেঃ ইউরিয়া সার প্রয়োগ । গোবর ৮-১০ কেজি/শতাংশ । পুকুর প্রস্তুতির পর চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৮-১০ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয় ।

অনুমোদিত প্রজাতি ঃ মনোসেক্স তেলাপিয়া ও গলদা চিংড়ি ।

পোনার ঘনত্ব ঃ প্রতি শতাংশে ১০-১২ সেমি গলদা চিংড়ি ৮০-১০০ টি ও মনোসেক্স তেলাপিয়া ৪০টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে ।

খাদ্যের উৎস্য ঃ পোনা মজুদের পর ২৫-৩০% প্রোটিন সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রতিদিন পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট দেহ ওজনের ৩-১০% হারে ।

মাছ ছাড়ার সময় ঃ ডিসেম্বর-জানুয়ারী বাদে সারা বছর ।

সার ব্যবস্থাপনা

প্রকার ও পরিমান ঃ ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

পদ্ধতি ও সময়কাল ঃ পোনা মজুদের ৭-১০ দিন পর পর পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

পরিচর্যা ঃ প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে ।

পানি পরিবর্তন ঃ প্রতি ১৫ দিন পরপর পানি পরিবর্তন করা ।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা ঃ চিংড়ির ক্ষেত্রে খোলস নরম পাতলা, গায়ে কালো কালো দাগ, লেজ ভাঙ্গা ও পচন ধরা, ফুলকাতে কালো কালো দাগ পড়া ও পচন ধরা । তেলাপিয়া একটি উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাছ । তবে তেলাপিয়া চাষের সমস্যা ও সমাধান পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে ।

আহরনের সময়কাল প্রযুক্তি ঃ ৪-৬ মাস । পুকুরে পোনা মজুদের ৪ মাসের মধ্যে প্রতিটি তেলাপিয়া মাছের ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে । এ অবস্থায় পুকুর শুকিয়ে সমস্ত মাছ আহরণ করতে হবে ।

উৎপাদন ঃ ২১৩৩ কেজি/হেক্টর (১০৪৬ কেজি চিংড়ি + ১০৮৭ কেজি তেলাপিয়া) ।

কার্প

প্রযুক্তি ঃ কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ মাছের মিশ্রচাষ হলো একই পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের একত্রে চাষ। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো পুকুরে সব স্তরের খাবারের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, বিগহেড, কমনকার্প ইত্যাদি মাছকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয়। এসব মাছ পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বসবাস করে এবং বিভিন্ন স্তরের খাবার খায় অর্থাৎ সব প্রজাতির মাছ সাধারণত: সব স্তরের খাবার খায় না। কাতলা ও সিলভার কার্প পুকুরের উপরের স্তরের, রুই মধ্য স্তরের এবং মৃগেল, কালবাউশ ও কার্পিও তলদেশের খাবার খায়। আবার সব প্রজাতির মাছ একই ধরণের খাবার খায় না এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে থাকে।

চিত্র : কার্প মাছ

অনুমোদিত প্রজাতি ঃ রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, সিলভার কার্প, বিগহেড, কমনকার্প।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পানির অবস্থান ঃ মিশ্রচাষের জন্য কমপক্ষে ৮-১০ মাস পানি থাকে এ রকম, অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির পুকুর হলে ভাল হয়। পুকুরের আয়তন ১০ শতাংশের চেয়ে বড় এবং পানির গড় গভীরতা ৪-৬ ফুট থাকা আবশ্যক। পুকুর পাড়ে বড় গাছ-পালা না থাকা বাঞ্ছনীয়।

পুকুর প্রস্তুত প্রনালী ঃ পাড় বাঁধাই ও তলদেশ ঠিক করা; জলজ আগাছা দমন; রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ উচ্ছেদ; চুন প্রয়োগ। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি শতাংশে ১০০-১২০ গ্রাম (৪ ফুট পানির গভীরতায়) রোটেনন বা প্রতি শতাংশে ৪টি; ফসটক্সিন ট্যাবলেট (৪ ফুট পানির গভীরতায়) প্রয়োগ করে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ দূর করতে হবে।

পুকুর তৈরি, পোনা ছাড়া ও পরিচর্যা ঃ পুকুর পাড়ে ঝোপঝাড় থাকলে লতাপাতা পুকুরের পড়ে পচে গিয়ে পানি নষ্ট করতে পারে। মাছ খেকো প্রাণী যেমন সাপ, উদবিড়াল, গুইসাপ পানিতে আশ্রয় নিয়ে মাছ খেতে পারে। তাই পুকুরের আগাছা, পাড়ের ঝোপঝাড় পরিস্কার করতে হবে । পুকুর শুকানোর মাধ্যমে রাক্ষুসে মাছ (শোল, গজার, বোয়াল, টাকি ইত্যাদি) এবং অবঞ্ছিত মাছ (মলা, ঢেলা, পুঁটি, চান্দা, দাড়কিনা ইত্যাদি) সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি শতাংশে ১০০-১২০ গ্রাম (৪ ফুট পানির গভীরতায়) রোটেনন বা প্রতি শতাংশে ৪টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট (৪ ফুট পানির গভীরতায়) প্রয়োগ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গোবর ৮-১০ কেজি/শতাংশ। পুকুর প্রস্তুতির পর চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৮-১০ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পোনা মজুদের ৭-১০ দিন পর পর পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পোনার ঘনত্ব ঃ

প্রতি শতাংশে (সংখ্যা) ঃ কাতল = ৩-৪ টি, রুই = ৫-৮ টি, মৃগেল = ৬-১০ টি, সিলভার কার্প = ৭-১২ টি, কার্পিও = ১-২ টি, গ্রাস কার্প = ২-৪ টি, মোট = ২৪-৪০ টি।

খাদ্যের উৎস্য ঃ সম্পূরক খাবার হিসেবে চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল সমপরিমাণে মিশিয়ে পুকুরে সরবরাহ করা হয়। তবে উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য তিন ভাগ চালের কুঁড়ার সাথে এক ভাগ সরিষার খৈল মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে । কুঁড়া ও খৈল এক সংগে ভিজিয়ে বলের মত করে পুকুরের বিভিন্ন স্থানে ছিটিয়ে দিতে হবে। খৈল পাওয়া না গেলে শুধু চালের কুঁড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। মাছ ছাড়ার পরের দিন থেকে প্রতিদিন সকালে মজুদকৃত ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ হারে খাবার দিতে হবে।

মাছ ছাড়ার সময় ঃ পোনা প্রাপ্তির ওপর পোনা মজুদের সময় নির্ভর করে। তবে মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাছ দ্রুত বাড়ে বিধায় পোনা মার্চ মাসের মধ্যেই মজুদ করতে পারলে ভাল হয়।

পরিচর্যা ঃ পানির স্বচ্ছতা ৮ সেন্টিমিটারের নিচে নেমে গেলে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে মাছ পানির উপরে উঠে খাবি খেতে থাকে। এ অবস্থায় পানিতে লাঠি পেটা করে বা সাঁতার কেটে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। যে মাছগুলো বিক্রি বা খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে সেগুলো ধরে ফেলতে হবে। তাহলে ছোট আকারের মাছগুলো বাড়ার সুযোগ পাবে। ১৫ দিন পর পর মাছের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে। পানি পরিবর্তন করার সুযোগ থাকলে পরিবর্তনে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা ঃ লেজ ভাঙ্গা ও পচন ধরা, ফুলকাতে কালো কালো দাগ পড়া ও পচন ধরা। উচ্চ মজুত ঘনত্ব ও বদ্ধ জলজ পরিবেশে পরিত্যক্ত খাবার, মাছের বিপাকীয় বর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা পঁচনের ফলে পানি দূষিত হয়ে অনেক সময় রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। রোগ দেখা দিলে মাছ কমিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

আহরনের সময়কাল প্রযুক্তি ঃ ৬-৮ মাস। উল্লেখিত পদ্ধতিতে ৮ মাস চাষ করলে মাছ বিক্রি এবং খাবার উপযোগী হতে পারে এবং রাজপুঁটি মাছ ২-৩ মাস বয়সেই খাবার উপযোগী এবং বিক্রি যোগ্য হয়। মাছ ধরার জন্য ঝাকি জাল বা টানা বেড়জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারে বিক্রয় করতে হলে খুব ভোরে মাছ ধরার কাজ শুরু করা উচিত।

উৎপাদন (টন/হেঃ) ঃ ৫-৬ টন মাছ।

পাঙ্গাস মাছ

প্রযুক্তি ঃ পাঙ্গাস মাছের একক ও মিশ্র চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্টসমুহ ঃ পাঙ্গাস মাছ অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। বৃদ্ধির হার রুই জাতীয় মাছের চেয়ে বেশি। প্রতিকুল পরিবেশে বাঁচতে পারে ফলে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক। রাক্ষুসে মাছ নয় বলে রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়। সর্বভুক বিধায় সম্পুরুক খাদ্য প্রয়োগে চাষ করা যায়। পানির লবনাক্ততা ২-১০ পিপিটি পর্যন্ত, ঘের, খাঁচা ও মৌসুমী পুকুরে পাঙ্গাস মাছ চাষ করা যায়।

অনুমোদিত প্রজাতি ঃ পাঙ্গাস, রুই, সিলভার কার্প ও মনোসেক্স তেলাপিয়া।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পানির অবস্থান ঃ কমপক্ষে ৮-১০ মাস পানি থাকে এ রকম, অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির পুকুর হলে ভাল হয়। পুকুরের আয়তন ৩০ শতাংশের চেয়ে বড় এবং পানির গড় গভীরতা ৪-৬ ফুট থাকা আবশ্যক। পুকুর পাড়ে বড় গাছ-পালা না থাকা বাঞ্ছনীয়।

পুকুর প্রস্তুত প্রনালী ঃ আগাছা ও পাড় পরিস্কার করা, পাড় ও তলা মেরামত করা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ নির্মুল করা, চুন প্রয়োগ। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি শতাংশে ১০০-১২০ গ্রাম (৪ ফুট পানির গভীরতায়) রোটেনন বা প্রতি শতাংশে ৪টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট (৪ ফুট পানির গভীরতায়) প্রয়োগ করে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ দূর করতে হবে।

চিত্র : পাঙ্গাস মাছ

পোনার ঘনত্ব ঃ

পাঙ্গাস মাছ একক চাষে প্রতি শতাংশে ১০-১২ সেমি আকারের ১০০-১২০ টি, মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশে ১০-১২ সেমি, আকারের ।

পাঙ্গাস = ৫০-৬০ টি, সিলভার কার্প = ১২-১৫ টি, রুই = ৮-১০ টি, মৃগেল = ৬-১০ টি, মনোসেক্স তেলাপিয়া = ৩০-৩৫ (৫-৭ সেমি) ।

মাছের ঘনত্ব ঃ শতাংশে ১০০-১২০ টি ।

খাদ্যের উৎস্য ঃ মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে । মাছ ছাড়ার পরের দিন হতে ১ম ১৫ দিন মজুদকৃত মাছের মোট দেহ ওজনের ১০-১৫% হারে ও পরে মাসে মাসে কমিয়ে ২-৩% হারে ২৫-৩২% প্রেটিন সমৃদ্ধ খাবার দিনে দুই বেলা প্রয়োগ করতে হবে ।

মাছ ছাড়ার সময় ঃ পোনা প্রাপ্তির ওপর পোনা মজুদের সময় নির্ভর করে । তবে মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাছ দ্রুত বাড়ে বিধায় পোনা মার্চ মাসের মধ্যেই মজুদ করতে পারলে ভাল হয় ।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গোবর ৮-১০ কেজি/শতাংশ । পুকুর প্রস্তুতির পর চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে প্রতিশতাংশে ৮-১০ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয় । এছাড়া ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করা যেতে পারে । পোনা মজুদের ৭-১০ দিন পর পর পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

পরিচর্যা ঃ পানির স্বচ্ছতা ৮ সেন্টিমিটারের নিচে নেমে গেলে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে । পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে মাছ পানির উপরে উঠে খাবি খেতে থাকে । এ অবস্থায় পানিতে লাঠি পেটা করে বা সাঁতার কেটে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে । মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে । মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে । যে মাছগুলো বিক্রি বা খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে সেগুলো ধরে ফেলতে হবে । তাহলে ছোট আকারের মাছগুলো বাড়ার সুযোগ পাবে ।

নমুনায়নের সংখ্যা ঃ ১৫ দিন পর পর ।

পানি পরিবর্তন ঃ পানি দ্রুত কমে গেলে অন্য কোন উৎস হতে পানি দিয়ে ভরার ব্যবস্থা নিতে হবে । অপরদিকে পানি বেড়ে উপচে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে ।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা ঃ বিভিন্ন পরজীবি, ব্যাকটেরিয়া জনিত ক্ষত রোগ ও অন্যান্য রোগ হতে পারে । মাছ রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা তত সহজ নয় । রোগের সনাক্তকরন ও চিকিৎসা পদ্ধতি জটিল, ঝুকিপুর্ণ ও ব্যয়বহুল । রোগ প্রতিরোধে পানির গুনগত মান সংরক্ষণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা অধিক গ্রহনযোগ্য । মাছের আচরনের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে । । মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে । প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে ।

আহরনের সময়কাল ও প্রযুক্তি ঃ ৮-১০ মাস । মাছ ধরার জন্য টানা বেড়জাল ব্যবহার করা যেতে পারে । বাজারে জীবিত অবস্থায় বিক্রয় করতে হলে খুব ভোরে মাছ আহরণ করলে উচ্চ মুল্য পাওয়া যাবে ।

উৎপাদন ঃ ২৫-৩০ টন/হেক্টর প্রতি বছর ।

থাই কৈ মাছ

প্রযুক্তি ঃ পুকুরে থাই কৈ মাছের একক চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ উচ্চ ফলনশীল। কৈ মাছ স্বল্প গভীরতা সম্পন্ন পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। ৩-৪ মাসে বিক্রী যোগ্য হয়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সহজে ব্যপক পোনা উৎপাদন সম্ভব। খেতে সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা বেশি।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পানির অবস্থান ঃ কৈ মাছ চাষের জন্য ৪-৫ মাস পানি থাকে এ রকম ১৫-৫০ শতাংশের পুকুর নির্বাচন করতে হবে, তবে এর চেয়ে ছোট অথবা বড় পুকুরেও এ মাছ চাষ করা যায়।

চিত্র : থাই কৈ মাছ

পানির বর্ননা ঃ ৪-৬ ফুট পানি থাকা আবশ্যক।

পুকুর তৈরির প্রস্তুত প্রনালী ঃ

- পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- পুকুর শুকিয়ে অবাঞ্চিত মাছ ও প্রাণী দূর করতে হবে।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি শতাংশে ৫০-৬০ গ্রাম রোটেনন প্রযোগ করেও অবাঞ্চিত মাছ ও প্রাণী দূর করা যায়।
- অতপর প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হাওে চুন প্রয়োগ আবশ্যক।
- চুন প্রয়োগের ৫ দিন পরে পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরের চারিদিকে নাইলন নেটের বেড়া দিতে হবে।

পোনার ঘনত ঃ প্রতি শতাংশে ২-৩ গ্রাম ওজনের সুস্থ-সবল ৩০০ টি পোনা মজুদ করতে হবে।

খাদ্যের উৎস্য ঃ পোনা মজুদের দিন থেকে ৩৫-৪০% প্রোটিন সমৃদ্ধ সম্পূরক পিলেট খাদ্য (ফিশমিল ৩০%, মিট ও বোন মিল ১০%, সরিষার খৈল ১৫%, চালের কুড়া ২০%, ভুট্টা ১০%, আটা ৪%, ভিটামিন ও খনিজ লবন ১%) এর মিশ্রণ মাছের দেহ ওজনের ২০-৪০% হারে সকাল, দুপুর ও বিকালে পুকুরে ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে ।

মাছ ছাড়ার সময় ঃ পোনা প্রাপ্তির ওপর পোনা মজুদের সময় নির্ভর করে। তবে মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাছ দ্রুত বাড়ে বিধায় পোনা মার্চ মাসের মধ্যেই মজুদ করতে পারলে ভাল হয়।

মাছের ঘনত্ব ঃ শতাংশে ১০০-১২০টি।

পুকুর তৈরি, পোনা ছাড়া ও পরিচর্যা ঃ

- প্রতি ১৫ দিন পর পর জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।
- পোনা মজুদের পর ৩০ দিন অন্তর অন্তর শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- কৈ মাছের পুকুরে প্রচুর প্লাংটনের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, এই প্লাংটন নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি শতাংশে ৮-১০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়া ও ২-৩ টি সিলভার কার্পের পোনা মজুদ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ গোবর ৮-১০ কেজি/শতাংশ। পুকুর প্রস্তুতির পর চুন প্রয়োগের ৩ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৮-১০ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পোনা মজুদের ৭-১০ দিন পর পর পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ পানির স্বচ্ছতা ৮ সেন্টিমিটারের নিচে নেমে গেলে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে মাছ পানির উপরে উঠে খাবি খেতে থাকে। এ অবস্থায় পানিতে লাঠি পেটা করে বা সাঁতার কেটে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। যে মাছগুলো বিক্রি বা খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে সেগুলো ধরে ফেলতে হবে। তাহলে ছোট আকারের মাছগুলো বাড়ার সুযোগ পারে। পানি দ্রুত কমে গেলে অন্য কোন উৎস হতে পানি দিয়ে ভরার ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরদিকে পানি বেড়ে উপচে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে ।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নমুনায়নকৃত মাছগুলোকে পুকুরে ছেড়ে দিলে ক্ষত রোগ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে মাছগুলোকে পুকুরে ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই ৩% লবন পানিতে গোছল করানো প্রয়োজন। রোগ প্রতিরোধে পানির গুনগত মান সংরক্ষণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা অধিক গ্রহনযোগ্য। মাছের আচরনের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

আহরনের সময়কাল ও প্রযুক্তি ঃ ৪-৫ মাস। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে কৈ মাছ চাষ করলে ৪-৫ মাসের মধ্যে ৮০-১০০ গ্রাম ওজনের হবে। এ সময় জাল টেনে এবং পুকুরের সমস্ত পানি শুকিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা নিতে হবে।

উৎপাদন ঃ হেক্টরপ্রতি ৭৫০০-৮০০০ কেজি মাছ ৪-৫ মাসে ।

নোনা টেংরা

প্রযুক্তি ঃ নোনা টেংরার কৃত্রিম প্রজনন।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

নোনা টেংরা অতি সুস্বাদু এবং উপকূলীয় অঞ্চলে এ মাছের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে এ মাছের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে হ্যাচারীতে কৃত্রিম উপায়ে নোনা টোংরার পোনা উৎপাদন করে এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

ব্রুড মাছ উৎপাদন ঃ

- প্রজনন মৌসুমের ৩-৪ মাস পূর্ব হতে সুস্থ সবল ব্রুড মাছ উৎপাদন শুরু করতে হবে।
- সঠিকভাবে খাদ্য প্রয়োগ ও পুকুরের মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থ সবল ব্রুড মাছ উৎপাদন করতে হবে।

চিত্র : নোনা টেংরা

ব্রুড মাছ নির্বাচন ঃ

- পরিপক্ক স্ত্রী মাছের পেট ফোলা থাকে, জননেন্দ্রিয় গোলাকার, লালচে-গোলাপী বর্ণের পুরু পেশীবহুল হয়ে থাকে। পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় পেটের নীচের দিকে হালকা চাপ দিলে দুই একটি ডিম বের হয়ে আসতে দেখা যায়।
- পরিপক্ক পুরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় মোচাকৃতির পেশীযুক্ত এবং বাহিরের দিকে বেরিয়ে থাকে। পূর্ণ পরিপক্ক পুরুষ মাছের পেটের নীচের দিকে চাপ দিলে বীর্য বেরিয়ে আসে।

হরমোন প্রয়োগ ঃ

- কৃত্রিম প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় মাছকে একক মাত্রায় ১.৫-২.০ মিলি/কেজি দেহ ওজন হিসেবে ওভাপ্রিম হরমোন মাছের পৃষ্ঠ পাখনার গোড়ায় গভীর মাংসল অংশে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর হাপা/সিষ্টার্ণে ৫-১২ পিপিটি লোনা পানিতে ১ঃ২ অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে রাখতে হবে।
- হরমোন প্রয়োগের ৬-৭ ঘন্টা পর বহিঃসংগম ক্রিয়ার মাধ্যমে স্ত্রী মাছ হাপাতে ডিম ছাড়ে।

রেণু প্রতিপালন ঃ

- সাধারণতঃ ডিম ছাড়ার ১৮-২২ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হয়।
- ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হওয়ার ৩৬-৪৮ ঘন্টা পর খাদ্য হিসাবে মুরগীর সিদ্ধ ডিমের কুসুম পানিতে গুলিয়ে ঘন ছাঁকনীর মাধ্যমে অল্প অল্প করে প্রয়োগ করতে হবে।
- ব্রিডিং হাপাতে রেণুপোনা প্রতিপালনের ৪-৫ দিন পর পোনাগুলো ৫-৬ মিমি আকারের হয়ে থাকে। এ অবস্থায় এদের নার্সারী পুকুরে মজুদ করতে হবে।
- যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, একটি ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের সুস্থ-সবল ও সম্পূর্ণ পরিপক্ক মা নোনা টেংরা হতে প্রায় ৩০,০০০-৫০,০০০ রেণুপোনা উৎপাদন করা যেতে পারে।

গলদা চিংড়ি

প্রযুক্তি ঃ গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড উন্নয়ন কলাকৌশল।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

শীত মৌসুমে গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে আগাম গলদা চিংড়ির ব্রুড উৎপাদন। চাষের সময় বৃদ্ধি করে বাজারজাতোপযোগী চিংড়ি উৎপাদনে সহায়ক।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পুকুর নির্বাচন ঃ

- যে এলাকায় পুকুরের পানি প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা যায়, সে এলাকায় গ্রীন হাউজ পদ্ধতিতে আগাম পরিপক্ক গলদা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য পুকুর নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।
- গ্রীন হাউজ পুকুরের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক, যেখানে সার্বক্ষণিক সূর্যের আলো পাওয়া সম্ভব হবে।
- সাধারণতঃ পুকুরের আকৃতি আয়তাকার এবং আয়তন ১৮০-২০০ বর্গমিটার হলে গ্রীন হাউজ তৈরি এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়।

চিত্র : গলদা চিংড়ি

গ্রীন হাউজ তৈরি ঃ শীত মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পুকুরের পানির তাপমাত্রা গলদা চিংড়ির প্রজনন অঙ্গের উন্নয়ন উপযোগী তাপ মাত্রায় (২৮-৩২°সে.) রাখার জন্য পুকুরের উপরে বাঁশের চটা ও পলিথিন দিয়ে গ্রীন হাউজ তৈরি করতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি ঃ পুকুরের তলা হতে ৬-৮ সেন্টিমিটার এর বেশি কাদা তুলে ফেলে প্রতি শতাংশে এক কেজি হারে পাথুরে চুন ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এরপর পুকুরে ১.০-১.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পানি সরবরাহ করে ২৫ পিপিএম হারে পানিতে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য অপর্যাপ্ত হলে ২.০-২.৫ পিপিএম হারে ইউরিয়া এবং ২.৫-৩.০ পিপিএম হারে টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য পুকুরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ২/৩ স্থানে ঝোঁপ তৈরি করা যেতে পারে, যা চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে।

চিংড়ি মজুদ ঃ প্রতি শতাংশে ২০টি হারে বাছাইকৃত সুস্থ সবল স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি (৫:১) অনুপাতে পুকুরে মজুদ করতে হবে। প্রতিটি স্ত্রী চিংড়ির ওজন ৬০-৮০ গ্রাম এবং পুরুষ চিংড়ির ওজন ১০০-১২০ গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী চিংড়ির ওজন যত বেশি হবে, ডিমের পরিমাণ ও বাজার মূল্য বেশি হবে।

খাদ্য সরবরাহ ঃ গলদা চিংড়ির ব্রুড তৈরির জন্য ৪৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মোট মজুদকৃত চিংড়ির ওজনের ৩-৪% হারে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতি কেজি চিংড়ির খাদ্যে ১-২ মিলি হারে কড লিভার তৈল মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ডিম পরিপক্কতা ত্বরান্বিত হতে সহায়ক হয়।

উপকূলীয় চিংড়ি

প্রযুক্তি ঃ উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরে ফসল বহুমুখীকরণ।

প্রযুক্তি বৈশিষ্ট্য ঃ

উপকূলীয় ঘেরে ভাইরাস এর আক্রমণের ফলে অনেক সময় সব চিংড়ি মারা যাওয়ার ফলে চাষী সর্বশান্ত হয়ে যায়। এ প্রযুক্তিতে চিংড়ি মারা গেলেও মাছের আয় হতে উৎপাদন ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয়। ২য় ফসলে মৌসুমী মাছ চাষ করে লাভজনক উৎপাদন পাওয়া যায় এবং ১ম ফসলে চিংড়িতে রোগ জীবাণু আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

চিত্র : উপকূলীয় চিংড়ি

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পুকুর প্রস্তুতি ঃ মাটি শুকিয়ে চুন (১ কেজি/শতাংশ) প্রয়োগ করে এবং রাক্ষুসে/অবাঞ্ছিত মাছ নিধন করে, পানিতে সঠিক মাত্রায় চুন ও সার প্রয়োগ করে পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন ঃ খাদ্যাভ্যাস, লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা এবং প্রজনন বৈশিষ্ট বিবেচনায় চিংড়ির সাথে তেলাপিয়া চাষ অধিক লাভজনক বলে বিবেচিত হয়েছে।

পোনা মজুদ হার ঃ ১ম ফসলে প্রতি শতাংশে ৮০টি চিংড়ির সাথে ৪০টি তেলাপিয়া এবং ২য় ফসলে শুধুমাত্র ৮০টি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ

- বাগদা চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ৩০-৪০% প্রোটিনযুক্ত পিলেট খাদ্য এবং তেলাপিয়ার জন্য ২৫% প্রোটিনযুক্ত ভাসমান খাদ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে।
- চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগের ১০-১৫ মিনিট পূর্বে পুকুরের নির্দিষ্ট দুই কোণে তেলাপিয়ার খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ মাসিকভিত্তিতে ১০.০-১২.৫ পিপিএম হারে ডলোচুন এবং পানির স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে ১.০-১.২ পিপিএম ইউরিয়া, ১.৫-১.৮ পিপিএম টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উৎপাদন ঃ ১ম ফসলে প্রতি হেক্টরে ৩২০ কেজি চিংড়ি ও ১৬০০ কেজি তেলাপিয়া এবং ২য় ফসলে ২৭০০ কেজি তেলাপিয়ার উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

বাগদা চিংড়ি

প্রযুক্তি ঃ আবদ্ধ পদ্ধতিতে আধা-নিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

চিংড়িতে ভাইরাস এর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ঘেরের পানি ভাইরাস এর বাহকমুক্ত করা ও পরবর্তীতে ভাইরাস এর বাহকমুক্ত পানি ঘেরে ব্যবহার করা। ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা ঘেরে মজুদ করা। পানির গভীরতা ১.০ মিটার এর অধিক রাখার ব্যবস্থা করা। বাহিরের জোয়ার কিংবা পার্শ্ববর্তী ঘেরের পানি কোনভাবেই যাতে ঘেরে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করা। কোন জৈব সার ব্যবহার না করা। ঘেরে জৈব পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পরিমিত খাদ্য প্রয়োগ করা। ঘেরে জমাকৃত জৈব পদার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঘেরের মাটি ও পানির বাফার ক্ষমতা, পি-এইচ ও ক্ষারত্বসহ অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীসমূহ স্থিতিশীল রাখা।

চিত্র : বাগদা চিংড়ি

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পুকুর প্রস্তুতি ঃ

- মাটি শুকিয়ে চুন (কেজি/শতাংশ) প্রয়োগ করে এবং পানির রাক্ষুসে/অবাঞ্চিত মাছ নিধন এবং সঠিক মাত্রায় চুন ও সার প্রয়োগ করে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে।
- পুকুরের এক কোণে একটি ইন-প- নার্সারী তৈরি করতে হবে।
- পানিতে ১.০-১.৫ পি.পি.এম. হারে রোটেনন এবং ১.৫ পি.পি.এম. হারে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ প্রাণীকূল নিধন করতে হবে।
- নিধনকৃত সব প্রাণী যথাশীঘ্র পানি হতে তুলে ফেলার পর পানি শোধনের জন্য ২০-২৫ পিপিএম হারে ব্লিচিং ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোনা মজুদ ঃ প্রতি বর্গমিটারে ১০-১৫ টি ভাইরাসমুক্ত মুক্ত সুস্থ সবল চিংড়ির পোনা নার্সারীতে মজুদ করতে হবে। ১০-১৫ দিন প্রতিপালনের পর লালন পুকুরে পোনা অবমুক্ত করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণে ৩৫-৪০% প্রোটিনযুক্ত পিলেট খাদ্য ছিটিয়ে কিংবা ট্রেতে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি ও মাটি ব্যবস্থাপনা ঃ

- যে কোন ধরণের জলজ আগাছা তুলে ফেলে প্রতি মাসে ১.৫-২.০ পিপিএম হারে ডলোচুন পানিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রয়োজনে জলাধারে পরিশোধনপূর্বক পানি পুকুরে ব্যবহার করতে হবে।
- প্রয়োজনবোধে ১-১.৫ পিপিএম হারে রোটেনন প্রয়োগ করে অবাঞ্ছিত মাছ নিধন করতে হবে। মৃত মাছ তুলে ফেলার পর ৩-৪ পিপিএম হারে ব্লিচিং প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- পানির গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য ৫০ দিন পর থেকে প্রতি মাসে ৩-৪ পিপিএম হারে জিওলাইট ও ১-১.৫ পিপিএম হারে প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- চাষের ৭০-৮০ দিন পর হেক্টরপ্রতি ১৫-২০ লি প্রোবায়োটিক্স মাটির সাথে মিশিয়ে পুকুরের তলায় সরবরাহ করতে হবে।

উৎপাদন ঃ প্রতি বর্গমিটারে ১০টি মজুদ ঘনত্বে উৎপাদন হবে ২০০০ কেজি/হেক্টর।

শীলা কাঁকড়া

প্রযুক্তি ঃ খাঁচায় শীলা কাঁকড়া ফ্যাটেনিং কলাকৌশল।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

খাঁচায় মজুদকৃত যে কোন কাঁকড়ার গোনাডের পরিপক্কতা তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করা যায়। কাঁকড়ার বাঁচার হার সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। খাঁচায় প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে কাঁকড়া মজুদ করায় একটি অন্যটিকে আক্রমণ করতে পারে না। প্রত্যেকটি কাঁকড়াকে সমানভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। ফলে, খাবারের অপচয় রোধ হয় এবং মজুদকৃত কাঁকড়ার মধ্যে খাবার নিয়ে কোন প্রতিযোগিতা হয় না। খাঁচায় কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করার ফলে পুকুরের বাকী অংশে অন্যান্য মাছ চাষ করে একই ভূমি হতে অধিক ফসল পাওয়া সম্ভব।

চিত্র : শীলা কাঁকড়া

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

খাঁচা তৈরি ঃ

- পরিপক্ক শক্ত বাঁশ ১.৫-২.০ সেমি. মোটা ফালি করে চিকন সুতা দিয়ে বানা তৈরি করতে হবে।
- এরপর বানাগুলোকে পাশাপাশি সংযুক্ত করে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ (২৫ সেমি × ২৫ সেমি × ৩০ সেমি) বিশিষ্ট খাঁচা তৈরি করতে হবে।
- প্রতিটি প্রকোষ্ঠের আয়তন ঠিক রেখে খাঁচার মোট আয়তন বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।
- খাঁচার উপরের ঢাকনা এমনভাবে বাঁধতে হবে যেন কাঁকড়া বেরিয়ে যেতে না পারে এবং নিয়মিত খাদ্য সরবরাহে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

পানিতে খাঁচা স্থাপন ঃ

- উপকূলীয় নদীর কম স্রোত সম্পন্ন অংশে, নদীর সরু চ্যানেলে কিংবা ঘেরে খাঁচা স্থাপন করা যেতে পারে।
- খাঁচা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যাতে খাঁচা পানির উপরে অন্তত ৩-৫ সেমি ভেসে থাকে এবং জোয়ার ভাটায় খাঁচা উঠানামা করতে পারে।

খাঁচায় কাঁকড়া মজুদ ঃ ১৮০ গ্রাম বা তদ্দুর্ধ ওজনের পরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়া সর্বোচ্চ গ্রেডভূক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। তাই ফ্যাটেনিং এর জন্য ১৭০-১৭৫ গ্রাম ওজনের অপরিপক্ক ডিম্বাশয়যুক্ত (খোসা কাঁকড়া), সুস্থ-সবল, সকল পা সম্পন্ন স্ত্রী কাঁকড়া খাঁচার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে মজুদ করলে ভাল হয়। ডিম্বাশয় পরিপক্ক হওয়ার পর উক্ত কাঁকড়ার ওজন ১৮০ গ্রাম হয়ে যাবে। তবে মজুদযোগ্য কাঁকড়ার প্রাচুর্য্যতা কম হলে এর চেয়ে কম ওজনের স্ত্রী কাঁকড়াও মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ খাবার হিসেবে স্বল্প মূল্যের মাছ যেমন তেলাপিয়া, সিলভার কার্প এবং গরু ছাগলের নাড়ি-ভূড়ি, শামুক-ঝিনুকের মাংস, কুচিয়া ইত্যাদি ছোট ছোট টুকরো করে, কাঁকড়ার দেহ ওজনের ৫-৮% হারে খাঁচার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দৈনিক সকাল ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে। গবেষণায় প্রতিয়মান হয়েছে যে পিলেট খাবার ব্যবহার করেও কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা ঃ খাঁচায় মজুদের ৮-১০ দিন পর কাঁকড়ার ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয়েছে কিনা তা দৈনিক পরীক্ষা করতে হবে। কাঁকড়াকে আলোর বিপরীতে ধরলে যদি কাঁকড়ার দুই পাশের পায়ের গোড়ার মধ্য দিয়ে আলো অতিক্রম না করে তাহলে বুঝতে হবে কাঁকড়ার ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয়েছে। পরীক্ষিত কোন কাঁকড়ার ডিম্বাশয় অপরিপক্ক থাকলে তাকে পুনরায় নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে রেখে পূর্বের নিয়মে খাবার সরবরাহ করতে হবে। অন্ধকার স্থানে টর্চ লাইটের আলো দিয়েও ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতা পরীক্ষা করা যায়। কয়েকদিন পর পর খাঁচা পরিস্কার করতে হবে যাতে খাঁচার ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে না যায়।

কাঁকড়া আহরণ ঃ সাধারণতঃ খাঁচায় ১০-১২ দিনের মধ্যেই কাঁকড়ার ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক কাঁকড়া আহরণ করে বিশেষ নিয়মে প্লাষ্টিকের ফিতা/নাইলন রশি দিয়ে চিমটাযুক্ত পা দু'টি বেঁধে ফেলতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পা ভেঙ্গে না যায়। কারণ, পা ভাঙ্গা কাঁকড়ার বাজার মূল্য অনেক কম। ধৃত কাঁকড়াকে ডিপোতে গ্রেডিং অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে।

প্রাণিসম্পদ

প্রযুক্তি ঃ গরু মোটাতাজাকরন

বাংলাদেশে গরুর মাংস খুব জনপ্রিয় এবং চাহিদাও প্রচুর। ছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব কুরবানীর সময় অনেক গরু জবাই করা হয়। সুতরাং, "গরু মোটাতাজাকরন" পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ন এবং একটি লাভজনক ব্যবসা।

গরু মোটাতাজাকরন বৈশিষ্ট ঃ

পশু নির্বাচনঃ

ক. বয়স নির্ধারনঃ মোটাতাজা করার জন্য সাধারনত ২ থেকে ৫ বছরের গরু ক্রয় করাতে হবে, তবে ৩ বছরের গরু হলে ভাল।

খ. শারীরিক গঠনঃ মোটাতাজাকরনে ব্যবহৃত গরুর দৈহিক গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচ্যঃ

- দেহ হবে বর্গাকার।
- গায়ের চামড়া হবে ঢিলা (দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে টান দিয়ে দেখতে হবে)।
- শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিক হারে মোটা, মাথাটা চওড়া, ঘাড় চওড়া এবং খাটো।
- পা গুলো খাটো এবং সোজাসুজিভাবে শরীরের সাথে যুক্ত।
- পিছনের অংশ ও পিঠ চওড়া এবং লোম খাটো ও মিলানো।
- গরু অপুষ্ট ও দূর্বল কিন্তু রোগা নয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

কৃমিমুক্তকরন ও টিকা প্রদান ঃ পশু ডাক্তারের নির্দেশনা মত কৃমির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। গরু সংগ্রহের পর পরই পালের সব গরুকে একসাথে কৃমিমুক্ত করা উচিত। তবে প্রতি ৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ টি করে এনডেক্স বা এন্টিওয়ার্ম ট্যাবলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। পূর্ব থেকে টিকা না দেওয়া থাকলে খামারে আনার পরপরই সবগুলো গরুকে তড়কা, বাদলা এবং ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে। এ ব্যপারে নিকটস্থ পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

ঘর তৈরি ও আবাসন ব্যবস্থাপনাঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারী ২/৩ টি পশু মোটাতাজা করে থাকে, যার জন্য সাধারনত আধুনিক সেড করার প্রয়োজন পড়েনা। তবে যে ধরনের ঘরেই গরু রাখা হোক ঘরের মধ্যে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘরের মল-মূত্র ও অন্যান্য আবর্জনা যাতে সহজেই পরিস্কার করা যায় সে দিকে খেয়াল রেখে ঘর তৈরি করতে হবে।

পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ গরু মোটাতাজাকরনে দু'ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে রশদ তৈরি করা হয়।

- আঁশ জাতীয়ঃ শুধু খড়, ইউ এম এস, সবুজ ঘাস ইত্যাদি। তবে এই প্রক্রিয়ায় খামারীদেরকে শুধু খড়ের পরিবর্তে ইউ এম এস খাওয়াতে হবে।
- দানাদারঃ খৈল, ভূষী, চালের কুড়া, খুদ, শুটকী মাছ, ঝিনুকের গুড়া, লবন ইত্যাদি।

খাদ্যের পরিমানঃ গরু যে পরিমান খেতে পারে সে পরিমান ইউ এম এস সরবরাহ করতে হবে।

- কোন খামারী সবুজ ঘাস খাওয়াতে চাইলে প্রতি ১০০ কেজি কাঁচা ঘাসের সাথে ৩ কেজি চিটাগুড় মিশিয়ে তা গরুকে খাওয়াতে পারেন। এক্ষেত্রে কাঁচা ঘাসও গরুকে পর্যাপ্ত পরিমানে সরবরাহ করতে হবে।

খাদ্যের মিশ্রণঃ খামারীদের সুবিধার জন্য নীচের সারনীতে একটি দানাদার মিশ্রণ তৈরির বিভিন্ন উপাদান পরিমান সহ উল্লেখ করা হল। নিম্নের ছক অণুযায়ী অথবা প্রয়োজন অণুযায়ী খামারীগণ বিভিন্ন পরিমান দানাদার মিশ্রণ তৈরি করে নিতে পারবেন।

উপাদান	***পরিমান (কেজি)***	***খাদ্যের পরিমান***
গম/চাল/খুদ/ভূট্টা ভাঙ্গা	২০	গরুকে তার দেহের ওজন অণুপাতে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পাশের দানাদার মিশ্রণটি গরুর ওজনের শতকরা ০.৮-১ ভাগ পরিমান সরবরাহ করতে হবে। দানাদার মিশ্রণটি একবারে না খাইয়ে দুই ভাগে ভাগ করে সকালে এবং বিকালে খাওয়াতে হবে। গরুকে পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।
গমের ভূষি	২৫	
ধানের কুড়া	২৫	
সরিষা/তিল/নারিকেলের খৈল	২০	
শুটকি মাছ	৫	
ঝিনুকের গুড়া	৪	
লবন	১	
মোট	***১০০***	

দৈহিক ওজন নির্ণয় ঃ মোটাতাজাকরন প্রক্রিয়ায় গরুর দৈহিক ওজন নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ। কেননা গরুর খাদ্য সরবরাহ, ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি কাজগুলো করতে হয় দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে। গরুর ওজন নির্নয়ের জন্য গরুকে সমান্তরাল জায়গায় দাড় করাতে হবে এবং নীচের ছবির নির্দেশিকা মোতাবেক ফিতা দ্বারা দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড়ের মাপ নিতে হবে। এই মাপ নীচের সূত্রের মাধ্যমে গরুর ওজন পাওয়া যাবে।

$$\textit{সূত্রঃ}\ \text{গরুর ওজন} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)} \times \text{বুকের বেড় (ইঞ্চি)}}{৩০০}\ \text{কেজি}$$

উপরের ছবি অণুযায়ী উরুর হাড়ের মাথা থেকে কাধের হাড়ের কোনা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে হবে (ছবিতে এক বৃত্ত থেকে আর এক বৃত্তের দূরত্ব)।

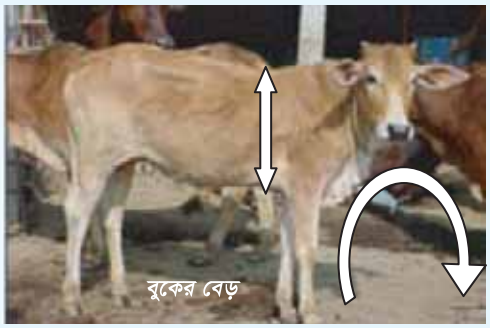

উপরের ছবি অণুযায়ী তীর চিহ্নিত স্থান বরাবর বুকের বেড়ের মাপ নিতে হবে। দৈর্ঘ্য এবং বুকের বেড় উভয় মাপই 'ইঞ্চি' হিসেবে নিতে হবে।

উপসংহারঃ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অণুযায়ী পালন করলে ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যেই গরু মোটাতাজাকরন করে বাজারজাত করা সম্ভব।

প্রযুক্তি ঃ গবাদিপশুর কৃমিরোগ দমন মডেল

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের জলবায়ু পরজীবির বংশবিস্তারের সহায়ক তাই আমাদের দেশে গবাদিপশুতে এই রোগের প্রাদূর্ভাব বেশী। কৃমি গবাদিপশুর পুষ্টি উপাদান শোষণ করে প্রতি বছর ব্যপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে। নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করে সহজেই গবাদি পশুকে কৃমি মুক্ত রাখা যায়।

কৃমিরোগ দমনের বৈশিষ্ট ঃ

পরজীবি বহুল এলাকায় সকল পশুকে একসাথে পরজীবি নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এরপর নিয়মিত ভাবে বছরে অন্ততঃ ২ বার বর্ষার আগে (মে-জুন) এবং শরতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জলজ স্যাঁতস্যাঁতে এলাকায় গবাদিপশু চড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। গবাদিপশুর গোবর স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় পরজীবির ব্যাপকতা বেশি সে সব জায়গায় আবদ্ধ পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন করলে সুফল পাওয়া যাবে। অধিকাংশ কৃমিনাশকই দামে সস্তা। গবেষণায় দেখা গেছে কোন কৃষক যদি কৃমিনাশকের জন্য ১ টাকা খরচ করে তবে সে দুধ ও মাংস বাবদ ১০ টাকা আয় হয়।

চিত্র : গবাদি পশুর কৃমি রোগ দমন

প্রযুক্তি ঃ ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশানো খড় (Urea Mollases straw)

আমাদের দেশের গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হল খড়। কিন্তু খড়ের পুষ্টিমান খুবই নিম্ন। তাই খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট দীর্ঘ গবেষণা ও কৃষক পর্যায়ে যাচাই করে দেশে প্রাপ্ত খড়, ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের মিশ্রণে তৈরি করেছে ইউ,এম,এস, গো-খাদ্য প্রযুক্তিটি। এটি ইউরিয়া, মোলাসেস এবং খড় এর একটি মিশ্রিত খাবার যা গরুকে প্রতিদিন শুকনা খড়ের পরিবর্তে চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

তৈরির পদ্ধতিঃ

- ইউএম এস তৈরির প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ, এম, এস এর শুষ্ক পর্দাথের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে।

চিত্র : খামারে ইউ এম এস তৈরি করা হচ্ছে

চিত্র : খামারে ইউ এম এস সংরক্ষণ

- সহজ ভাষায় যতটুকু খড় মিশ্রিত করব তার অর্ধেক পরিমান পানি, পানির অর্ধেক পরিমান মোলাসেস/নালী/চিটা এবং প্রতি কেজি খড়ের জন্য ৩০ গ্রাম ইউরিয়া নিতে হবে।
- যেমন, ১০ কেজি খড়ের জন্য ৫ লিটার পানি, ২.৫ কেজি মোলাসেস এবং ৩০০ গ্রাম (১০ x ৩০ গ্রাম) ইউরিয়ার প্রয়োজন।
- প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমান মেপে নিতে হবে।

- মোলাসেস ও ইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মত পরিষ্কার পানিতে এমনভাবে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবণটুকু খড়ের সাথে সহজে মেশানো যায়।
- শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবন চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবন সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

ইউএমএস প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হারঃ

শুকনো খড় (কেজি)	*পানি (লিটার)*	*চিটা/নালী গুড় (কেজি)*	*ইউরিয়া (গ্রাম)*
৫	২.৫ - ৩.৫	১.২	১৫০
১০	৫ - ৭	২.৪	৩০০
২০	১০ - ১৪	৪.৮	৬০০
৫০	২৫ - ৩৫	১২	১৫০০
১০০	৫০ - ৭০	২৪	৩০০০

ব্যবহার পদ্ধতিঃ ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরি খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে ২/৩ দিনের খড় একবারে তৈরি করলে ইউ এম এস পলিথিন দ্বারা ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে।

খাওয়ানোর পরিমানঃ গরুকে তার ইচ্ছা অণুযায়ী, অর্থাৎ গরু যে পরিমান খেতে পারে সে পরিমান ইউ এম এস সরবরাহ করতে হবে। তবে গরুকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করিয়ে নেওয়া ভাল।

আয়-ব্যয়ঃ খড়ের দাম বাদ দিলে ইউরিয়া, মোলাসেস ও শ্রমিক খরচ বাবদ কেজি প্রতি ইউ এম এস এর খরচ পড়ে ০.৬৫ হতে ০.৭৫ টাকা। মোলাসেস ও শ্রমিকের উপর এই খরচ নির্ভর করবে। এ পদ্ধতিতে খড়ের সঙ্গে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকা মূল্যের গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্তকতা ঃ অবশ্যই ইউ এম এস তৈরি করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ এম এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে না।

প্রযুক্তি ঃ বর্ষাকালে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে ২ কোটি টন ধানের খড় উৎপাদিত হয়। এর শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদিত হয় বর্ষা মৌসুমে। এ সময়ে বোরো ও আউস ফসল থেকে উৎপাদিত প্রায় ৮০ লক্ষ টন। খড় বৃষ্টি জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য কারনে শুকানো যায় না, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট ধানের খড়কে তাজা ও ভিজা অবস্থায় সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ পদ্ধতিতে ইউরিয়া ব্যবহার করে ভিজা খড় সংরক্ষণ করা হয়।

চিত্র : খড় সংরক্ষণ পদ্ধতি

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

- পানি জমে না এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যুক্ত স্থানে খড়কে সংরক্ষণ করা উচিত।
- গম্বুজের আকারে খড়ের গাদার পরিবর্তে আনুভুমিক লম্বা খড়ের গাদা তৈরি করতে হবে।
- যে স্থানে খড় সংরক্ষণ করা হবে প্রথমে সে স্থানে পুরানো খড়কুটা বা পুরানো পলিথিন বিছাতে হবে।
- এবার এক স্তর ভিজা খড় যেমন ২৫ কেজি খড় বিছাতে হবে। উক্ত পরিমাণ খড়ের জন্য ৩৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।
- এভাবে স্তরে স্তরে খড় এবং ইউরিয়া ছিটিয়ে খড়ের গাদা তৈরি করতে হবে। খড়ের গাদার আকার খাঁড়া গম্বুজাকার না হয়ে চওড়া হবে।
- খড় অতিরিক্ত ভিজা হলে পনি ঝড়িয়ে নিতে হবে।
- যখন সম্পূর্ণ খড় শেষ হবে তখন খড়ের গাদাকে এমনভাবে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে খড়ের গাদায় কোন বাতাস ঢুকতে বা বের হতে না পারে। পলিথিনের কিনারা গুলো মাটি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হবে।
- অতিরিক্ত পানি যুক্ত খড়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ৩/৪ স্তর পর পর এক স্তর শুকনো খড় দিলে খড়ের সংরক্ষণ ভাল হয়।
- খড়ে পানির পরিমানের উপর নির্ভর করে প্রতি একশত কেজি ভিজা খড়ে ১.৫ থেকে ২.০ কেজি পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োজন হয়।

সংরক্ষণ কালঃ

- সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খড় এক বছরের অধিক সময় সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের দুই সপ্তাহ পর থেকে যে কোন সময় ইচ্ছা করলে এ খড় গাদা থেকে বের করে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

সংরক্ষিত খড় খাওয়ানোঃ

- গাদা থেকে বের করা সংরক্ষিত খড়ে প্রচুর পরিমানে অ্যামোনিয়া থাকে। খোলা বাতাসে আধা ঘন্টা পরিমান সময় রেখে দিলে অতিরিক্ত অ্যামেনিয়া চলে যায়। এর পর উক্ত সংরক্ষিত খড়কে শুকনো খড় বা কাঁচা ঘাসের সাথে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- প্রথম প্রথম গরু না খেতে চাইলে আস্তে আস্তে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়।
- সংরক্ষিত ভিজা খড়কে পুনরায় শুকানোর কোন প্রয়োজন নেই এবং এত খড়ের পুষ্টিমান কমে যায়।

সংরক্ষিত খড়ের পুষ্টিমানঃ

- ইউরিয়া ভিজা খড়কে সংরক্ষণের পাশাপাশি এর পুষ্টিমানও বৃদ্ধি করে। শুধু শুকানো খড় খাওয়ালে একটি বাড়ন্ত গরু দৈনিক প্রায় ৩৭৯ গ্রাম ওজন হারায় কিন্তু শুধু সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে দৈনিক প্রায় ২৮০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়।

সংরক্ষণ খরচঃ

এক্ষেত্রে ইউরিয়া এবং পলিথিনের খরচই প্রধান। নিচে বর্তমান বাজার দর হিসাবে ৫ টন খড়ের সংরক্ষণ খরচ দেয়া হলাঃ

পলিথিনঃ ১৬ গজ (প্রতি গজ ৪৫ টাকা হিসাবে) = ৭২০ টাকা এবং ইউরিয়াঃ ৭৫ কেজি (প্রতি কেজি ২০ টাকা হিসাবে) =১৫০০ টাকা; মোট খরচ= ২২২০ টাকা।

পাঁচ টন খড়ের বর্তমান বাজার মূল্য কমপক্ষে ১৫০০০ টাকা। সুতরাং প্রায় ২২২০ টাকা খরচ করে মোটামুটি ১৫০০০

টাকার খড় রক্ষা করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকার খড়ের সংরক্ষণ খরচ প্রায় ২২ টাকা। কিন্তু পুষ্টিমানের বিচারে প্রতি ১০০ টাকার খড়ের সংরক্ষণ খরচ ২০ টাকা মাত্র।

সাবধানতাঃ

- সংরক্ষণ কালে ঢাকার কাজে ব্যবহৃত পলিথিনটি যাতে কোনভাবে নষ্ট না হয় সে দিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।
- পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে সব ক্ষেতের ধান পুরোপুরি চিটা হয়ে গেছে সে খড় এই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা উচিত নয়। কারণ এ ধরণে সংরক্ষিত খড়ে ইমিডেজল জাতীয় যৌগ উৎপাদন হয় যা খেলে গরুর অসুবিধা হতে পারে।

উপরোক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ষা মৌসুমে উৎপাদিত বিপুল পরিমান খড়ের পচন রোধই করে না, এর খাদ্যমানও বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এই সংরক্ষণ পদ্ধতি কৃষকের শ্রম সময় এবং আর্থিক সাশ্রয় করবে।

প্রযুক্তি ঃ দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ

বাংলাদেশে বৃষ্টির মৌসুমে কোন কোন এলাকায় প্রচুর পরিমানে ঘাস পাওয়া যায়। যেমনঃ দূর্বা, বাকসা, আরাইল, সেচি, দল, শষ্য খেতের আগাছা ইত্যাদি। বৃষ্টির মৌসুমে গো-সম্পদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিও হয়। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের অভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাই এ সময়ে উৎপাদিত অধিক পরিমান ঘাসকে সংরক্ষন করে রাখার জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ পদ্ধতিতে গর্তের মধ্যে ঘাস সংরক্ষণ করা হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

- প্রথমে শুষ্ক ও উচু যায়গা যেখানে পানি জমেনা এরকম স্থানে একটি গর্ত তৈরি করতে হবে।
- গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের উপর। গর্তটির তলা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।
- ১০০ সিএফটি একটি মাটির গর্তে ২.৫০ থেকে ৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।
- সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে।
- তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমানে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানো উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে।

চিত্র : সবুজ ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি

- গর্তের তলায় পলিথিন দিলে আগে বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিন না দিলে পুরু করে খড় বিছাতে হবে। এরপর দু'পার্শ্বে পলিথিন না দিলে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে।
- এরপর পরতে পরতে সবুজ ঘাস এবং শুকনো খড় দিতে হবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি সবুজ ঘাস এবং ১৫ কেজি শুকনো খড় দিতে হবে।
- ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৮ থেকে ১০ কেজি পানির মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন চিটাগুড় দিতে হবে না।

- এভাবে পরতে পরতে ঘাস ও খড় সাজাতে হবে এবং ভালভাবে পাড়িয়ে ভিতরের বাতাস যথাসম্ভব রেব করে দিতে হবে।
- এভাবে গর্ত ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। ঘাস সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরণ দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- সর্বশেষে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ ঘাস একদিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েকদিন ব্যাপী সাইলেজ তৈরি করা যায়।

সাবধানতাঃ

- নীচু জায়গায় গর্ত করা যাবে না। তাতে পানি জমে ঘাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- উপরের পলিথিন সুন্দর ভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি ঘাসের ভিতরে প্রবেশ না করে।
- চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমান বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে। বেশি পাতলা হলে ঘাস হতে চুঁইয়ে নীচে চলে যাবে। এমনভাবে দ্রবন তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
- ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়।
- গর্তের কোনাগুলো এবং পাশ সমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঘাসের সাথে খুব বেশি বৃষ্টির পানি থাকা বাঞ্চনীয় নয়।

খাদ্য গ্রহণঃ

এভাবে সংরক্ষিত ঘাস প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ কেজি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উক্ত বর্ণিত পদ্ধতিতে বর্ষা মৌসুমের প্রাপ্ত ঘাস সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গো-খাদ্যের অভাব কিছুটা হলেও সমাধান হবে। ঘাস সংরক্ষণের এ প্রযুক্তিটি ব্যবহারে দেশের গো-খাদ্যের অভাব কিছু হলেও সমাধান হবে ।

প্রযুক্তি ঃ লবনাক্ত এলাকার জন্য ঘাস উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ ঘাসগুলো দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল (১৫০-১৮৩ টন/হেক্টর/বৎসর), প্রত্যেক জাত হতে বছরে প্রায় ১২ (বার) ঘাস কাটা (কাটিং) যায়, বছরের যে কোন সময় কাটিং নেয়া যায়, ফলে সারা বছরই ঘাসের উৎপাদন সম্ভব, আলাদাভাবে বীজের দরকার হয় না, একবার রোপন করলে ৫ বছর ফলন পাওয়া যায়, কোন আগাছা দমন বা তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না, সারা বছরই সবুজ ঘাস উৎপাদন সম্ভব যা দুগ্ধবতী গাভীর জন্য খুবই দরকারি এবং দারিদ্র বিমোচন ও আত্নকর্মসংস্থানে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশের মোট ১২টি জেলার সমুদ্র উপকুলবতী জমির পরিমাণ প্রায় ১.৫০ মিলিয়ন হেক্টর। জেলাগুলো হচ্ছে নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্রগ্রাম, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পিরোজপুর, কক্রবাজার, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও ভোলা। এ জেলাগুলোতে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এসব ঘাস চাষ করা যেতে পারে ।

ঘাসের জাতসমূহ ঃ নেপিয়ার, পারা, স্পেসভিডা ইত্যাদি।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

লবনাক্ত এলাকায় ঘাস চাষ ঃ

জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঘাস চাষের উপযোগী করতে হবে। জমি তৈরির সময় গোবর সার প্রয়োগ করে ভাল ভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অত:পর নেপিয়ার বা স্পেলভিডা ঘাসের কাটিং লাইনের মাঝে হেলিয়ে সারিদ্ধভাবে লাগাতে হবে। প্রতিটি সারির এবং প্রতি কাটিং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ১ মিটার। চারা বা কাটিং সাধারণত: ১০-১৫ সেমি মাটির গভীরে রোপণ করতে হবে। প্রতি হেক্টরে ২০,০০০-২৫,০০০ কাটিং প্রয়োজন।

চিত্র : লবনাক্ত এলাকায় ঘাস চাষ

সার ব্যবস্থাপনা ঃ

সারের পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি) ঃ

ইউরিয়া	২২০ কেজি
টিএসপি	১২৫ কেজি
এমওপি	১২৫ কেজি
গোবর	৫ টন

এগুলোর মধ্যে গোবর সার জমি তৈরির সময় দিতে হবে। আর ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরির পর কাটিং লাগানোর ঠিক পূর্বে দিতে হবে। অত:পর প্রতিবার কাটিং এর ১০-১৫ দিন পর ইউরিয়া দিতে হবে ।

ফসল কর্তনঃ

- লাগানোর ৪৫ হতে ৬৫ দিন পর প্রথম কাটিং এবং অত:পর প্রতি ৩০ দিন পর ঘাস কাটা যায়।
- এপ্রিল - মে মাস পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত ঘাস সাইলেজ উপায়ে সংরক্ষণ করা যায়।
- পরবর্তী সময়ে বপনের জন্য কাটিং উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ঃ দেশি ভেড়া পালন

দেশে প্রাপ্ত প্রাণিসম্পদের মধ্যে ভেড়া অন্যতম অবহেলিত প্রানীজ সম্পদ। চরম অযত্নে ও অবহেলায় পালিত হলেও এদেশে ভেড়ার বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১২% । দেশের ৩.০১ মিলিয়ন ভেড়ার প্রায় ৭০ শতাংশই লালন-পালন করেন ভূমিহীন হতদরিদ্র ক্ষুদ্র খামারীরা। এই দেশজ প্রানীজ সম্পদ দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনে ব্যবহৃত হতে পারে। ভেড়া প্রধানত মাংসের জন্য পালন করা হয়। ভেড়া উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত দুই ধরণের : চারণভূমি ভিত্তিক ভেড়া উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ভূমিহীন ভেড়া উৎপাদন ব্যবস্থা।

চিত্র ঃ উপকুলীয় অঞ্চলে চারণরত ভেড়া

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

এ ধরণের ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা উপকূলীয় লোনা স্যাঁত স্যাঁতে চারণভূমিতে চরে অভ্যস্ত। এদের গায়ের রং সাধারণতঃ সাদা বা হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রংয়ের। এদের মুখমন্ডল, পা (হাঁটুর নীচের অংশ) এবং পেট উলমুক্ত। মুখ, পা সাধারণতঃ হালকা সাদাটে বাদামী রংয়ের। এদের বড় সাদাটে বাদামী রংয়ের শিং পিছনের দিকে বাঁকানো কিন্তু পেঁচানো নয়। এদের নাক সোজা, লম্বায় ১৮-১৯ সেমি। এদের কান তুলনামূলক ভাবে বড় ১০-১৩ সেমি, কাঁধ বরাবর উচ্চতা ৫৬-৬২ সেমি । এদের উল তুলনামুলক ভাবে বরেন্দ্র বা যমুনা অববাহিকার ভেড়ার তুলনায় মিহি, লম্বা (১০-১৫ সেমি)। এরা ৭-৮ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে যে কোন সময়ে বাচ্চা দিতে পারে। এরা সাধারণতঃ বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে ১-২ টি (গড়ে ১.২৫) বাচ্চা দেয়। সাধারণতঃ বাচ্চা জন্মের ২৮-৩০ দিনের মধ্যেই আবার গরম হয়, গর্ভধারণকাল গড়ে ১৪৮-১৫০ দিন। জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১.৫-২.০ কেজি। যদিও ভেড়ার দুধ দোহানো হয় না তবে মা যে পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তা বাচ্চার জন্য যথেষ্ট। বাড়ন্ত ভেড়ার দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার ৬০-৭০ গ্রাম। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ২৫-৩০ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ২০-২৫ কেজি। বাচ্চার জন্য বিকল্প দুধ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভেড়ার ল্যাম্ব স্টার্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে। অল্প খরচে বিকপ্প দুধ ব্যবহার করে বাচ্চার মৃত্যুহার অনেক কমানো যাবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

ভেড়ার খাদ্য ও পুষ্টি ঃ

খাদ্য ও পুষ্টি ভেড়া পালনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ভেড়ার মোট উৎপাদন খরচের ৬০-৭০% । ভেড়া উৎপাদনের অন্যতম খরচ হচ্ছে খাদ্য। খাদ্য খরচ কমানোর জন্য অন্যতম উপায় হচ্ছে খামারীর নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন অথবা প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত খাদ্যের ব্যবহার। প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন খাদ্যের উৎস্য হচ্ছে চারণভূমি। বর্তমানে আমাদের দেশে তেমন কোন চারণ ভুমি নেই। সাধারণত: উপকুলীয় চর, নদীর চর, পাহাড়ীয়া অঞ্চল, বন্যার বাঁধ, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার, ফসল কাটা মাঠ ইত্যাদি স্থানে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ চরে বেড়ায়। এসব স্থানে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত ঘাসই গবাদিপশুর অন্যতম খাদ্যের উৎস। পরিকল্পিত ভাবে ঘাস চাষ করলে এসব স্হানে ঘাসের উৎপাদন তথা গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহও অনেক বেড়ে যায়।

সারণী ১: ভেড়ার বাচ্চার জন্য মিল্ক রিপ্লেসার বা বিকল্প দুধ উপাদান এবং অনুপাত

উপাদান সমূহ	*শঠি (%)*	*ডিম + গমের আটা (%)*	*স্কিম মিল্ক (%)*
শঠি	১৯	-	-
স্কিম মিল্ক	-	-	৭০.০
ডিম	-	৩০	-
গমের আটা	-	১৮	-
সয়াবিন মিল	৬৪	২৭	-
ভূট্টার গুড়া	-	-	২০.০
সয়াবিন তৈল	১৫	২৩	৭.০
খাদ্য লবন	১	১	১.০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০	১০০.০

আমিষের প্রয়োজন ঃ

আমিষ বা প্রোটিন শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, মাংস, দুধ ও বাচ্চা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার খাদ্যে কতটুকু

আমিষ বা প্রোটিনের প্রয়োজন তা নির্ভর করে ভেড়ার ওজন, শারীরবৃত্তীয় অবস্থা এবং উৎপাদনশীলতার উপর। ভেড়ার প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ সাধারণত বিপাকীয় প্রোটিন হিসাবে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন ওজন এবং উৎপাদনশীলতায় ভেড়ার কি পরিমাণ বিপাকীয় প্রোটিনের প্রয়োজন । তাহা সারণী ২ এ দেখানো হলো।

সারণী ২ ঃ বিভিন্ন ওজন এবং উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে ভেড়ার প্রয়োজনীয় বিপাকীয় প্রোটিনের পরিমাণ (গ্রাম/দিন)

ওজন (কেজি)	জীবন ধারণ	জীবন ধারণ+ পশম বৃদ্ধি	জীবন ধারণ+ দৈহিক বৃদ্ধি+পশম বৃদ্ধি (৫০ গ্রাঃ/দিন)	জীবন ধারণ+দৈহিক বৃদ্ধি + গর্ভধারণ+পশম বৃদ্ধি
৫	৭.৩১	১৩.৫১	২১.২৪	২১.২৪ (গর্ভবতী নয়)
১০	১২.৩০	১৮.৫০	২৫.৯৬	২৫.৯৬ (গর্ভবতী নয়)
১৫	১৬.৬৭	২২.৮৭	৩০.১০	৫০.১০
২০	২০.৬৯	২৬.৮৯	৩৩.৯০	৫৩.৯০
২৫	২৪.৪৬	৩০.৬৬	৩৭.৪৮	৫৭.৪৮
৩০	২৮.০৪	৩৪.২৪	৪০.৯০	৬০.৯০
৩৫	৩১.৪৮	৩৭.৬৮	৪৪.২১	৬৪.২১
৪০	৩৪.৭৯	৪০.৯৯	৪৭.৪১	৬৭.৪১
৪৫	৩৮.০১	৪৪.২১	৫০.৫৪	৭০.৫৪
৫০	৪১.১৩	৪৭.৩৩	৫৩.৬১	৭৩.৬১
৫৫	৪৪.১৮	৫০.৩৮	৫৬.৬৩	৭৬.৬৩

উপকুলীয় চারণভূমি ঃ উপকুলীয় চারণভূমিতে সাধারণতঃ গরু, মহিষ, ভেড়া চরে বেড়ায়। চারণভূমিকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে পর্যায়ক্রমে গবাদিপশু চরালে ঘাস গজানো এবং বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। এর ফলে চারণভুমি থেকে পুষ্টি সরবরাহ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, উপকুলীয় চরাঞ্চলেও জৈব সার ও ইউরিয়া প্রয়োগ করে নেপিয়ার, পারা, জার্মানসহ প্রায় ১১ ধরণের উচ্চ ফলনশীল ঘাস উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে ভেড়াকে চাষকৃত ঘাসে না চরিয়ে কেটে খাওয়াতে হবে। বর্ষার শুরুতে এই ঘাস চাষ শুরু করতে হবে।

ভেড়ার দানাদার খাদ্য ঃ ভেড়ার দানাদার খাদ্য বলতে ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি; বিভিন্ন ধরণের ভূষি যেমন গমের চালের কুড়া, মাসকালাই, খেসারী, মটর ইত্যাদি; বিভিন্ন ধরণের খৈল যেমন সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সয়াবিন খৈল; বিভিন্ন ধরণের প্রাণীজাত খাদ্য যেমন ফিসমিল বা মাছের গুড়া; বিভিন্ন ধরণের খনিজ যেমন লবন, ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি বুঝায়। এসব খাদ্য উপাদান সমূহ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে দানাদার খাদ্য মিশ্রন তৈরি করে নিম্নে ব্যবহারের শতকরা হার দেওয়া হলো।

সারণী-৩ ঃ ভেড়ার দানাদার খাদ্যের বিভিন্ন উৎস, উপাদান এবং খাদ্য মিশ্রনের ব্যবহারের শতকরা হার

প্রধান উৎস	উপাদান	মিশ্রন তৈরিতে শতকরা হার
শক্তি এবং আমিষ	শষ্যবীজ ঃ চাল ভাঙ্গা, গম ভাঙ্গা, ভুট্টা ভাঙ্গা বিভিন্ন ধরণের ডাল ভাঙ্গা	০-৩০
শক্তি এবং আমিষ	ভূষি জাতীয় ঃ চালের কুড়া, গমের ভূষি, মাসকালাই/খেসারী.মসুর/মুগ ডালের ভূষি	২৫-৫০
আমিষ	খৈল ঃ তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন খৈল, নারিকেলের খৈল	১৫-২৫
আমিষ	প্রাণীজাত খাদ্য ঃ শুটকি মাছের গুড়া, প্রোটিন কনসেনট্রেট	০-৫
খনিজ	খনিজ উপজাত ঃ লবন, ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট, ঝিনুকের গুড়া, ডিমের খোসার গুড়া	০-৩
ভিটামিন ও খনিজ	বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০-০.০৫

দানাদার মিশ্রন নির্ভর করবে উক্ত খাদ্য মিশ্রন কোন বয়সি ভেড়ার জন্য ব্যবহৃত হবে। যেমন- ভেড়ার বাচ্চার দানাদার মিশ্রনে সাধারণত বেশি অনুপাতে শস্য বীজ থাকে। আবার বয়স্ক ভেড়ার দানাদার মিশ্রনে বেশি অনুপাতে কুড়া/ভূষি থাকে।

নিচে বয়স্ক এবং বাচ্চা ভেড়ার দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রনের শতকরা হার প্রদান করা হলো ।

সারণী-৪ ঃ বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রনের নমুনা (%)

খাদ্য উপাদান	বাচ্চা ভেড়া (৩-৬ মাস)	বাড়ন্ত ভেড়া (৭-১৫ মাস)	বয়স্ক ভেড়া (> ১৫ মাস)
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩০.০০	১৫.০০	১০.০০
বিভিন্ন ধরণের ডালের খুদ	৫.০০	-	-
গমের ভূষি/চালের কুড়া	২৯.০০	৪৫.০০	৫০.০০
মাসকালাই/খেসারী/মুসুর/মুগ/মটর ইত্যাদি ডালের ভূষি	৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
সয়াবিন খৈল/তিলের খৈল/সরিষার খৈল	২৫.০০	২০.০০	২০.০০
শুটকি মাছের গুড়া/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫০	১.০০	১.০০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া/ডিমের খোসার গুড়া	২.০০	২.০০	২.০০
সাধারণ খাদ্য লবন	১.০০	১.৫	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০	০.৫	০.৫
সর্বমোট ঃ	***১০০.০০***	***১০০.০০***	***১০০.০০***
মোট বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/কেজি শুষ্ক পদার্থ)	১১.৪০	১০.৯২	১০.৮৭
মোট প্রোটিন (গ্রাম/কেজি শুষ্ক পদার্থ)	১৬৩	১৬৪	১৬৫
মোট বিপাকীয় প্রোটিন (গ্রাম/কেজি শুষ্ক পদার্থ)	৭০	৬৭	৬৬

আয় ও ব্যয় ঃ বছরে ৫০ টি ভেড়া পালন করে খরচ বাদে প্রায় টাকা ৬২১৫০.০০ আয় করা যায়। তাছাড়া ভেড়া পালন করে ২ (দুই) জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে ও সংসারের ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করা যায় । ভেড়া পালন করে দারিদ্র বিমোচনের একটি অন্যতম উপায় হতে পারে ।

প্রযুক্তি ঃ দেশি মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবার দেশী মুরগি পালন করে থাকে। এদের উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশী মুরগির চেয়ে কম। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ও অতি নগন্য এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অধিকন্তু এদের মাংস ও ডিমের মূল্য বিদেশী মুরগির তুলনায় প্রায় দ্বিগুন এবং চাহিদা খুবই বেশি। দেশী মুরগির মৃত্যুহার বাচ্চা বয়সে অধিক এবং অপুষ্টিজনিত কারনে উৎপাদন আশানুরুপ নয়। বাচ্চা বয়সে দেশী মোরগ-মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে এবং সামান্য সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব।

চিত্র : দেশি মুরগি পালন

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্যবহার করে খামারীরা দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম, মাংস উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

প্রযুক্তি বৈশিষ্ট ঃ

- প্রযুক্তিটি গ্রামীন পর্যায়ে সকল গৃহস্থ পরিবারই ব্যবহার করতে পারবে। খামারের আকার অনুযায়ী প্রত্যেক খামারীর জন্য মোরগ-মুরগির সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

খামারের আকার	*আবাদী জমির পরিমান (শতাংশ)*	*মোরগ/মুরগি*
ছোট	৫০	১টি মোরগ ও ৩টি মুরগি
মাঝারী ও বড়	৫০ ও তার অধিক	১টি মোরগ ও ৬টি মুরগি

- প্রত্যেক খামারীগণ তাদের মুরগির খোয়ার ছাড়াও মুরগিগুলোকে সম্পুরক খাদ্য খাওয়ানোর জন্য বাঁশ তার জালি অথবা শুধু বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি ক্রিপ ফিডার তৈরি করবেন। এতে দুটো অংশ থাকবে। এক অংশে বাচচা ও অপর অংশে বয়স্ক মোরগ-মুরগির সম্পুরক খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- ছোট খামারীদের জন্য (ক্রিপ ফিডার) আকার ৪′×২.৫′ এবং বড় খামারীদের জন্য ৫′×৩′ হতে পারে। ক্রিপ ফিডারের তার জালি বা বাঁশের দরজার ফাঁকা ১.৫″ - ১.৭৫″ হবে, যাতে করে বাড়ন্ত বা বয়স্ক মুরগি ক্রিপ ফিডারের বাচ্চার জন্য খাদ্য প্রদানের অংশে প্রবেশ করে বাচ্চার সম্পুরক খাদ্য খেতে না পরে।
- প্রতিটি বয়স্ক মুরগিকে দৈনিক চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৩৫ গ্রাম সম্পুরক খাদ্য মুরগিকে খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারীগণ সারা বছর ১টি মুরগি বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করবেন। বাকী ২টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।
- মাঝারী ও বড় খামারীগণ প্রতিবারে তাদের ৬টি মুরগির মধ্যে ২টি মুরগিকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে, বাকী ৪টি মুরগি সারা বছর ডিম দিতে থাকবে ।
- ছোট বাচ্চা গুলোকে প্রথম ৬ সপ্তাহ প্রয়োজনীয় সম্পুরক খাদ্য ক্রিপ ফিডারের ভিতরে দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পুরক খাদ্যের পরিমান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফোটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ক্রিপ ফিডারের ভিতর তাদের মাকেও খেতে দিতে হবে, কেননা ছোট বাচ্চা প্রথম কয়েক দিন মাকে ছাড়া খাদ্য খায় না।
- দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পুরক খাদ্যের পরিমান হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়স কালীন সময়ে ছোট বাচ্চা গুলো মুরগির সাথে বাড়ির আঙ্গিনায় চড়ে খেতে অভ্যস্থ হবে।
- মুরগি গুলোকে নিরোগ রাখার জন্য মুরগির খোয়ার পরিস্কার পরিচছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া নিম্নরূপ অনুযায়ী রানীক্ষেত ও বসন্ত রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রতিষেধক প্রদানের কমসূচী ঃ

প্রতিষেধকের নাম	*যে বয়সে প্রদান করতে হবে*	*মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
বিসিআরডিভি	৫-৭ দিন	১ চোখে ১ ফোটা
বিসিআরডিভি (বোষ্টার)	১৪ দিন	১ চোখে ১ ফোটা
ফাউল পক্স	৩০-৩৫ দিন	পাখার চামড়ায় সূঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
আরডিভি	৬০ দিন	মাংশপেশীতে ১ সিসি

লাভ ও ফলাফল ঃ

- মুরগির মৃত্যুর হার কমে যাবে, বিশেষ করে বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে এ হার শতকরা বর্তমান হার ৫৫-৬০ ভাগ থেকে ২৫-৩০ ভাগে নেমে আসবে।
- এ পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করলে মুরগির দৈহিক ওজন শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ এবং ডিম উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে।
- সনাতনি পদ্ধতিতে ৬-৭ টি দেশি মুরগি পালন করে সাধারনত গড়ে এক জন খামারী দেশি মুরগি পালন থেকে প্রতি বছর টাকা ২০০০/- আয় করতে পারে। পক্ষান্তরে উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন খামারী দেশি মুরগি পালন করে গড়ে টাকা ৬,০০০- ৬,৬০০/- আয় করা সম্ভব।
- পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এই প্রযুক্তি গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে ।

বনজ গাছ

বনজ গাছের চাষাবাদ কৌশল

প্রযুক্তি ঃ বাংলাদেশ সুন্দরবনের প্রধান প্রধান প্রজাতির নার্সারিতে চারা উৎপাদন কৌশল

প্রযুক্তির বর্ণনাঃ বাংলাদেশ সুন্দরবনের প্রধান ১৬টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যথা- বাইন, মরিচা বাইন, সাদা বাইন, সুন্দরী, কাকড়া, সিংড়া, খলসী, গরান, আমুর, গর্জন, গেওয়া, কেওড়া, ছৈলা, পশুর, হেঁতাল, কিরপার নার্সারিতে চারা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে কম গাছ-পালা বিশিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চলে সার্থক বনায়ন করে উদ্ভিজ্জের সমাগম ও পরিবেশীয় উন্নয়ন তথা জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ সম্ভব ।

যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল ।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ প্রধান প্রধান ম্যানগ্রোভ প্রজাতির পরিপক্ক বীজ/ প্রপাগিউল যথা সময়ে যথা নিয়মে উপযুক্ত মার্তৃবৃক্ষ হইতে সংগ্রহ ও বাছাই এবং সময়মত নার্সারিতে চারা উৎপাদন । সহজে চারা উৎপাদন, উন্নতমানের চারা প্রাপ্তি, স্বল্প মূল্যে চারা উৎপাদন, বাগান সৃজনের জন্য সময়মত পর্যাপ্ত পরিমান চারা সরবরাহের নিশ্চয়তা, উৎপাদিত চারা সহজে পরিবহনযোগ্য, উৎপাদিত চারার টিকে থাকার হার অধিক এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য ।

প্রধান প্রধান প্রজাতিসমূহ ঃ

চিত্র : সুন্দরী বৃক্ষের সংগৃহিত ফল

চিত্র : গোলপাতা গাছের সংগৃহিত বীজ

চিত্র : আমুর গাছের পরিপক্ক ফল

চিত্র : পশুর বৃক্ষের সংগৃহিত বীজ

চিত্র : সংগৃহিত পরিপক্ক ধুন্ধুল বীজ

চিত্র : ভাতকাঠি গাছের সংগৃহিত প্রপাগিউল বা বীজ

চিত্র : ঝানা বা গর্জন গাছের প্রপাগিউল বা বীজ

চিত্র : গরান গাছের সংগৃহিত প্রপাগিউল বা বীজ

চিত্র : বিভিন্ন প্রজাতির উত্তোলিত ম্যানগ্রোভ নার্সারি

চিত্র : কাকড়া গাছের উত্তোলিত নার্সারি

চিত্র : মরিচা বাইন প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি

চিত্র : আমুর প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন দুইভাবে করা হয় যথা-

১. পলিব্যাগ নার্সারি

২. বেড নার্সারি

১. *পলিব্যাগ* নার্সারি যখন পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা হয় তখন তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলে ।

- চারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে সহজে সরানো যায় ।

- চারা রোপণ করলে কম মারা যায় ।

২. *বেড* নার্সারি

- সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উত্তোলন করা হয় ।

- অনেক সময় বেডে চারা উত্তোলন করে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয় ।

- বেড নার্সারী তৈরি করতে খরচ কম পড়ে ।

- বেডে বেশি চারার সংকুলান হয় ।

নার্সারীর স্থান নির্বাচন ঃ

উন্নতমানের চারা উত্তোলনের জন্য নার্সারীর স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে :

- পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও পূর্ণ সমতল আদ্রভূমি ।

- নার্সারীর স্থানে যাতায়াত এবং মালামাল ও চারা পরিবহনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ।

- ম্যানগ্রোভ নার্সারীতে সেচ সুবিধার জন্য নার্সারির ধারে নদী, খাল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি থাকা আবশ্যক ।

- উর্বর পলি মাটি এবং মাটির পি এইচ ৬.০ -৮.০ হওয়া ভাল ।

আদর্শ ম্যানগ্রোভ নার্সারীর পরিমাপ ঃ

- চারা উত্তোলনের পরিমানের উপর ভিত্তি করে নার্সারীর আয়তন ঠিক করতে হবে ।

- সাধারনতঃ নার্সারীর মাঝখানে চলাচলের পথ এবং প্রতি পার্শ্বে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য এক ফুট গভীর ও এক ফুট চওড়া ড্রেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- চারা উত্তোলনের জায়গা বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকবে।
- প্রতিটি সীড বেড ৪০´ × ৪´ (১২ মি. × ১.২ মি) আকারের হবে। তবে এ ধরণের স্থান পাওয়া না গেলে বেডের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ২০ ফুট বা ১০ ফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে।
- দু'টি বেডের মাঝখানে ১৮ ইঞ্চি পরিমান ফাঁকা স্থান থাকতে হবে।
- নার্সারির চারিদিকে ১.৫ মিটার থেকে ২.০ মিটার চওড়া এবং ১.৫ মিটার থেকে ২.০ মিটার উঁচু মাটির পরিদর্শন পথ তৈরি করতে হবে যা প্লাবন বা জোয়ার ভাটা নিয়ন্ত্রনের কাজে ব্যবহৃত হবে।

নার্সারীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরমঞ্জাদি ঃ

- ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ
- মাটি
- গোবর সার
- রাসায়নিক সার
- তারের চালুনি
- বেলচা, কোদাল, দা, ছুরি, সাবোল, নিড়ানী
- বাঁশের ঝুড়ি
- বাঁশ
- ঝর্ণা
- প্লাষ্টিক ট্রে
- বালতি
- করাত
- স্প্রে মেশিন
- কীট/ছত্রাক নাশক

পলিব্যাগ বসানোর জন্য বেড তৈরি ঃ

- আদ্র সমতল স্থানে নার্সারী বেড (৪০´ × ৪´) পূর্ব হতে পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে স্থাপন করতে হবে।
- বেডের ধার ১০-১৫ সেমি উঁচু করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাইম আটকাতে হবে।
- নার্সারী বেড কোদাল দ্বারা ভালমত চেঁছে পরিস্কার করে সমান করে নিতে হবে।

মাটি সংগ্রহ ঃ

- ভূমির উপরিভাগ হইতে বেলে দোয়াঁশ মাটি সংগ্রহ করতে হবে।
- পাতা পঁচা সারযুক্ত বনাঞ্চলের বা গাছপালা ঝোপঝাড়ের নিচের মাটি ভাল।
- আগাছার শিকড় ও আবর্জনা মুক্ত মাটি হতে হবে।
- শীতের শেষে ও বসন্তের শুরুতে মাটি সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

মাটি ও গোবর সার মিশ্রন ঃ

- সংগৃহিত মাটি এবং পঁচা গোবর সার ৩ঃ১ অনুপাতে অর্থাৎ তিন ভাগ মাটির সাথে এক ভাগ গোবর সার স্তরে স্তরে সাজিয়ে কমপক্ষে এক মাস স্তুপাকারে রেখে দিতে হবে।
- স্তুপের উপরে গজানো আগাছা পরিস্কার করে রাখতে হবে।
- পরবর্তিতে কোদাল দিয়ে স্তুপের মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে ঝুর ঝুরে করতে হবে।
- ঝুরা মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন বেলচার সাহায্যে মাঝারি আকারের ছিদ্রযুক্ত তারজালির দ্বারা ছেঁকে নিতে হবে।
- এভাবে আবর্জনা বিহীন মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন তৈরি হয়ে গেল।

পলি ব্যাগে মাটি ভর্তি করা ঃ

- বিভিন্ন আকারের পলিব্যাগ নার্সারীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন- ৬" × ৪", ৭" × ৫", ৯" × ৬" ইত্যাদি।
- ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগে মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন ভর্তি করতে হবে।
- বাম হাতে পলিব্যাগ ধরে ডান হাতে আস্তে আস্তে মাটির মিশ্রন পলিব্যাগে ভরতে হবে এবং হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে চাপ দিতে হবে। তারপর পলিব্যাগের উপরিভাগ দুই হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে দুই তিনবার ঝাকুনী দিতে হবে এবং মাটি পলিব্যাগে কানায় কানায় ভরতে হবে।
- মাটির মিশ্রণ ভর্তি ব্যাগগুলি নার্সারী বেডে সুন্দর করে খাড়াভাবে সাজাতে হবে।
- বীজ বপনের আগে পলিব্যাগে হাল্কা পানি দিয়ে নেয়া ভাল।
- পলিব্যাগে ছোট গর্ত করে ১/২ টি করে বীজ বপন করতে হবে।
- বীজ দেয়ার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। সাধারণতঃ বীজের আয়তন যত তত পরিমান মাটি বীজের উপর দিতে হবে।
- বীজ বপনের পর হাল্কা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর বেডে নিয়মিত পানি দিতে হবে।

খোলা মাটিতে বেড তৈরি ঃ

- পলিব্যাগ নার্সারী বেডের মতো খোলা মাটিতে সীড বেড ৪০´ লম্বা এবং ৪´ প্রস্থ হয়।
- নার্সারী বেডের মাটি আদ্র ও সমতল হতে ৩০-৪০ সেমি পর্যন্ত গভীর করে কাদাময় মাটি তৈরি করতে হবে।
- প্রতিটি মাটির সীড বেডে ৪০ কেজি গোবর সার এবং ৪০ কেজি আবর্জনা পঁচা সার মাটি কোপানোর সময় প্রয়োগ করে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- কোন কোন ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন-গোলপাতা সরাসরি তৈরিকৃত নার্সারির কাদামাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। ইহাকে ডিবলিং পদ্ধতি বলা হয়।

বেডে গজানো চারা পলিব্যাগে রোপন ঃ

- প্রজাতিভেদে যেমন কেওড়া, ছৈলা প্রভৃতি গাছের চারা মাটির বেডে গজানোর পরে প্রতিটি চারার যখন ৪ টি করে কচি পাতা বেরোবে ঠিক তখনই চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে।
- বিকেল বেলা চারা স্থানান্তরের উপযুক্ত সময়। চারা বেড থেকে উঠানোর আধঘন্টা আগে পানি দিয়ে বেড ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- প্রথমে সরু কাঠির সাহায্যে চারা এমনভাবে তুলতে হবে যেন শিকড় ছিড়ে না যায় এবং শিকড়ে কিঞ্চিত মাটি লেগে থাকে।
- চারাগুলি আলতো করে ট্রে-তে নিয়ে প্রস্তুতকৃত পলিব্যাগে রোপন করতে হবে।
- প্রথমে পলিব্যাগ ভাল করে ভিজিয়ে কাঠি দিয়ে ব্যাগের মাঝখানে চারার শিকড়ের মাপে আন্দাজমত একটি গর্ত করে চারাটি সাবধানে গর্তে বসিয়ে মাটি দিয়ে সুন্দরভাবে ভরাট করে দিতে হবে।
- চারা স্থানান্তরের পর বেডের উপর শেড দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ট্রে-তে চারা উত্তোলন ঃ

- ছোট বা ক্ষুদ্র বীজ যেমন-কিরপা বীজের চারা ট্রে-তে উত্তোলন করা হয়।
- ছিদ্রযুক্ত একটি প্লাষ্টিকের ট্রে-তে পাতলা মার্কিন কাপড় বা নিউজপ্রিন্ট কাগজ বিছিয়ে চাপ দিয়ে স্থাপন করে নিতে হবে।

- বিশোধিত বালি বা মাটি ঠান্ডা করে ট্রে টি ভরাট করতে হবে এবং কাঠি বা স্কেলের সাহায্যে হালকা চাপে ট্রের বালি বা মাটির উপরের স্তর সমান করে দিতে হবে।
- এবার বীজ বালির সাথে মিশিয়ে (১ ভাগ বীজ ২ ভাগ বালি) ট্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- তারপর মিহি বালির প্রলেপ বীজের উপর ছিটায়ে দিতে হবে।
- এরপর একটি বড় গামলায় ২ ইঞ্চি পরিমান পানি নিয়ে বীজ ট্রে টি গামলার ভিতরে বসিয়ে দিতে হবে যাতে বীজ ট্রের বালি বা মাটি গামলা থেকে পানি শোষণ করে সম্পূর্ণ ভিজে যায়।
- ভিজা বীজ ট্রে টি পাতলা সাদা পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দিয়ে অংকুরোদগমের জন্য ছায়ায় রেখে দিতে হবে।
- কয়েকদিনের মধ্যে অংকুরোদগম শুরু হলে পলিথিন কাগজ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- অতঃপর চারা ৪ পাতার হলে দ্রুত পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে।

ম্যানগ্রোভ নার্সারিতে চারা পরিচর্যা

নার্সারি বেডে বা পলিব্যাগে বীজ বপন বা চারা রোপণের পর যথাযথ পরিচর্যা করা প্রয়োজন। সুস্থ, সবল এবং নীরোগ চারা পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত পরিচর্যাসমূহ করতে হবে :-

পানি সেচ ঃ

- বীজ বা চারা রোপনের পর নিয়মিত ও পরিমানমত পানি সেচ দিতে হবে।
- ঝর্ণা বা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে পানি সেচ দিতে হবে।
- সকালে বা বিকালে নার্সারী বেডে পানি দিতে হবে।
- কোন মতেই নার্সারীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সেচ দেয় উচিত নয়।

আগাছা বাছাই ঃ

- মাটির বেড বা পলিব্যাগে বীজ অংকুরোদগমের পর হতেই আগাছা বাছাই করতে হবে।
- সাধারণতঃ প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর চোখা কাঠির সাহায্যে শিকড়সহ আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- আগাছা বাছাই এর আগে হালকা পানি দিয়ে বেড ভিজিয়ে নিতে হবে।

আচ্ছাদন প্রদান (সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণ) ঃ

- অনেক প্রজাতির বীজের অংকুরোদগম এবং চারার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বেডের উপর ছায়া প্রদানের প্রয়োজন পড়ে।
- সাধারণতঃ ছন, বাঁশের চাটাই, খড় দিয়ে আচ্ছাদনের চাল তৈরি করা যায়।
- চালা বেডের উপর দক্ষিণ দিকে ঢালু রেখে খুটির ফ্রেমের উপর স্থাপন করতে হবে।
- কোনক্রমেই চালা নার্সারী বেডের উপর দীর্ঘদিন রাখা উচিৎ নয়। তাহলে চারা লিকলিকে ও দুর্বল হয়ে যাবে।

মালচিং ঃ

- মাটি হতে রস যাতে বাষ্প হয়ে যেতে না পারে এবং মাটিতে যাতে তাপ বৃদ্ধি পায় সেজন্য খড় ইত্যাদি দিয়ে বেড বা পলিব্যাগ ঢেকে দেয়া হয়।
- সাধারনতঃ আচ্ছাদনের পরিবর্তে নার্সারীতে মালচিং ব্যবহার করা হয়।

শূন্যস্থান পূরণ ঃ

- নার্সারীতে পলিব্যাগে সরাসরি বীজ বপনের ফলে কোন ব্যাগে একাধিক চারা গজায় আবার কিছু ব্যাগ চারা শূন্য থাকে।
- চারা গজানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চারা কাঠি দিয়ে উঠিয়ে শূন্য ব্যাগে রোপণ করতে হবে।
- একের অধিক চারা পলিব্যাগে রাখা ঠিক নয় কারণ বেশি চারা থাকলে বৃদ্ধি তরান্বিত হয় না।
- পলিব্যাগে একাধিক চারা থাকলে একটি সুস্থ, সবল চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ

- কোন কোন সময় চারার প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা দরকার হয়। সাধারনতঃ চারায় ইউরিয়া, ফসফেট ও পটাস সার প্রয়োগ করা হয়।
- ইউরিয়া সার পানিতে গলে যায় বলে পানিতে মিশিয়ে ঝর্ণার সাহায্যে এবং ফসফেট ও পটাস সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়।
- প্রতিটি চারার বেডে (৪০´ × ৪´) ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম ফসফেট এবং ২৫০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পলিব্যাগের চারা পুনরায় সাজানো ঃ

- পলিব্যাগে যে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয় তা একই সাথে অংকুরোদগম বা বড় হয় না। কাজেই বীজ/প্রপাগিউল বপন বা চারা রোপণের ২০/৩০ দিন পর দেখা যায় যে কোন চারা বড় আবার কোন চারা ছোট। এমতাবস্থায় বেডে বড় ও ছোট চারা আলাদাভাবে পুনরায় সাজাতে হবে।
- চারার উচ্চতা অনুযায়ী বেডের প্রথমে বড় চারা তারপর ক্রমশঃ ছোট চারা সাজাতে হবে।
- তিন মাস অন্তর ব্যাগের চারা গ্রেডিং করে পূনঃ সাজিয়ে নিয়মিত পরিচর্যা করলে নার্সারীর সকল চারা সুস্থ, সবল, সতেজ ও সম-আকৃতির হবে।

শিকড় ছাঁটাই ঃ

- চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে পলিব্যাগের বাইরে শিকড় এসে যায়।
- চারা রোপণের পূর্বে ধারালো কাঁচি দিয়ে ব্যাগের গা ঘেসে শিকড় ছাঁটাই করে দিতে হবে।

চারা শক্তকরণ ঃ

- বনায়ন বা রোপণের অন্তত এক মাস পূর্বে চারাগুলো বেডে নেড়ে সাজাতে হবে।
- বেডের উপর শেড থাকলে ছায়া সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পরিমিত পানির চেয়ে কম পানি সেচ দিতে হবে। অর্থাৎ ২/৩ দিন পর পর পানি সেচ দিতে হবে।
- পলিব্যাগের চারার মূল ছাঁটাই এর মাধ্যমে চারা শক্ত করা যায়।

প্রযুক্তি ঃ জলবায়ুর পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভাব মোকাবেলায় আইলা দূর্গত এলাকায় বেড়ী বাঁধে নির্বাচিত প্রজাতির পরিকল্পিত বনায়ন কৌশল

প্রজাতির পরিকল্পিত বনায়ন কৌশলঃ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ বেড়ী বাঁধ ব্যবস্থাপনার সাথে পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে আইলা, সিডর ও জলোচ্ছাস এর হাত হতে পরিবেশ সুরক্ষা করা সম্ভব। এলক্ষে বন্যা দূর্গত এলাকা ও উপকূলীয় বাঁধ এবং সংলগ্ন বেড়ী বাঁধের ধারে পরিকল্পিত নির্ধারিত প্রজাতির গাছ বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ও আকস্মিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সিডর ও আইলার প্রকোপ হতে এতদাঞ্চলকে রক্ষা করা এবং সমূহ বিপদ হতে স্থানীয় জনগণকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব। মহাসড়ক, স্থানীয় রাস্তা এবং বেড়ী বাঁধের দুধারে টেরিসটোরিয়াল প্রজাতি এবং বেড়ী বাঁধের ঢালে-নদীর কিনারে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির দ্বারা বনায়ন করা উত্তম।

এক্ষেত্রে বৃক্ষ রোপণের জন্য প্রজাতি নির্বাচন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নকসা অবলম্বন এবং সময়মত বনায়ন করা আবশ্যক। এরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাঁধের ধারে ২ বা ৩ স্তর বিশিষ্ট বনায়ন করা আবশ্যক, যেমন বাঁধ ও রাস্তার পার্শ্বে রোপণের জন্য তাল, নারিকেল, খেজুর, বাবলা, জারুল, খৈয়া বাবলা, তেঁতুল একটির পর একটি ৫ মিটার অন্তর রোপণ করা যেতে পারে। বাঁধের ঢালে প্রথমে ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন সুন্দরী, বাইন, কেওড়া, গরাণ, খলসি ও গোলপাতার বাগান সৃজন করা যেতে পারে । বর্ষা মৌসুমে বিশেষ করে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বনায়ন করা আবশ্যক। এভাবে বনায়নের মাধ্যমে বেড়ী বাঁধ ও রাস্তা সুরক্ষার সাথে সাথে পরিবেশ উন্নয়ন ও জানমালের সুরক্ষা এবং গোখাদ্য ও অন্যান্য ফলজ বনজ ও জ্বালানী চাহিদা পূরণ করে জলবায়ুর পরিবর্তন তথা উষ্ণায়ন এর প্রভাব হতে উপদ্রুত অঞ্চলকে সুরক্ষা করা সম্ভব। যার ফলে, উপকূলীয় ইকোসিস্টেম অর্থাৎ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষিত হবে। ভূমি ক্ষয় রোধ, রাস্তা ও বেড়ি বাঁধ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি ও কাঠের চাহিদা পূরণ, ফল, ফুল, খাদ্য, ঔষধের চাহিদা মেটানো, দূর্যোগ প্রতিরোধ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পশু পক্ষীর খাবার যোগান, ঝড়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মরুকরণ রোধ, পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য।

চিত্র : চরে কাকড়া প্রজাতির বাগান

চিত্র : সুন্দরবনে চরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন

বনায়ন কৌশল ঃ সফলভাবে বাগান উত্তোলনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ-

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

- যে এলাকায় বাগান সৃজন করতে হবে সেই এলাকা ২/৩ মাস পূর্বেই নির্বাচন করে রাখতে হবে।
- স্থান নির্বাচনের সময় জমির মালিকানা, জমির শ্রেণী ও বনায়নের উপযোগীতা আছে কিনা যাচাই করতে হবে।
- প্রজাতি ভেদে সঠিক স্থান (জমি) নির্বাচন করতে হবে।
- আবার স্থান ভেদে সঠিক প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

গাছ লাগানোর পূর্বে নির্বাচিত এলাকা জরিপ এবং পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে ঃ

- কি পরিমান জমি বনায়ন করা হবে ।
- ভূমির প্রকার, অবস্থান এবং মাটির প্রকৃতি ।
- বর্তমান গাছপালা এবং অতীতের গাছপালা ।
- নির্বাচিত এলাকায় কোথায় কি জাতের চারা রোপণ করা যায় ।
- নির্বাচিত জমি কতটুকু প্রস্তুত করতে হবে তা নির্ধারণ করা ।
- রাস্তা, পায়ে চলার পথ, পানি সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি ।

গাছ লাগানোর স্থান প্রস্তুতকরণ ঃ

- নির্বাচিত এলাকার জঙ্গল, লতাপাতা ও অপ্রয়োজনীয় গাছপালা জানুয়ারী মাসে একবার কেটে ফেলতে হবে ।
- বড় গাছের মোথা থাকলে তুলে ফেলতে হবে ।
- কর্তিত জঙ্গল শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনবোধে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- চারা লাগানোর পূর্বে যদি পুনরায় আগাছা জন্মে তাহলে আবার আগাছা ২য় বার পরিস্কার করতে হবে ।

চারা রোপণের সময় ঃ

- বর্ষা মৌশুমের শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন মাসে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় । তবে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে ।
- উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর সেপ্টেম্বর মাসে চারা লাগানো ভাল ।

স্টেকিং করা ঃ

- স্টেকিং করার মূল উদ্দেশ্য হলো চারা রোপণের স্পট চিহ্নিতকরণ, রোপিত চারাকে খুঁটির সাথে বেধেঁ রাখা এবং মরে যাওয়া চারার স্থান চিহ্নিতকরণ ।
- নির্বাচিত স্থান প্রস্তত করার পর সম্পূর্ণ এলাকায় মে মাসের প্রথম ভাগেই চারা রোপণের স্পটগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য নিয়মিত দুরত্বে স্টেকিং করতে হবে ।
- এ কাজে ১ মি. লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি বা কোন গাছের সরু ডাল ব্যবহার করা যেতে পারে ।

বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন ঃ

- সঠিক স্থানে সঠিক প্রজাতির চারা রোপণ বনায়ন সফলতার পূর্বশর্ত ।
- ভূমির প্রকৃতি, মাটির গঠন, স্থানীয় চাহিদা ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে ।

চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করা ঃ

- বর্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি ষ্টেকিং করা খুঁটির গোড়ায় গর্ত তৈরি করতে হবে ।
- গর্তের আকার পলিব্যাগের আকার অনুযায়ী তৈরি করতে হবে । ৬" × ৪" আকারের পলিব্যাগের চারার জন্য ১´ × ১´ × ১´ আয়তনের গর্ত তৈরি করতে হবে এবং গর্তের পার্শ্বে খুঁটিগুলি পুঁতে রাখতে হবে, অন্য চারা যেমন নারিকেল চারার জন্য গর্তের আকার হবে ১.৫´ × ১.৫´ × ১.৫´ ।
- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গর্ত যেন ১৫-২০ দিন ঠিক মত আলো বাতাস পায় ।

সার প্রয়োগ ঃ

- গর্ত হইতে উঠানো টালকৃত মাটির নীচের অংশ প্রথমে এবং উপরের অংশ পরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।
- প্রতিটি গর্তে ১ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০ গ্রাম এমপি সার প্রতিটি গর্তে প্রয়োগ করে কোদাল দ্বারা মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে।
- চারা লাগানোর ন্যুন্যতম ১০-১৫ দিন পূর্বে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সারের পরিমাণ মাটির প্রকার ভেদে কম বেশি হয়ে থাকে।

চারা লাগানোর প্রয়োজনীয় দুরত্ব ঃ

- চারার মধ্যবর্তী ও সারির দুরত্ব কত হবে তা নির্ভর করে কি জাতের চারা ও কি কাজে ভবিষ্যতে ব্যবহার হবে এবং থিনিং প্লানের উপর।
- সাধারণতঃ বন বৃক্ষের চারার জন্য উত্তম দুরত্ব হলো ৬´ × ৬´ বা ৮´ × ৮´।
- খুব কাছাকাছি চারা লাগানো উচিত নয় এতে চারা লিকলিকে হয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি হয় না।
- বড় আকারের ফলজ গাছের বেড়ার দুরত্ব ক্ষেত্র বিশেষে ২০´-৩০´ হওয়া উত্তম।

চারা রোপণ পদ্ধতি ঃ আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন প্রকারের চারা পাওয়া যায় যার রোপনের পদ্ধতি নিম্নে প্রদান করা হলো।

পলিথিন ব্যাগের চারা ঃ

- নার্সারী থেকে চারাগুলো সতর্কতার সাথে বাগান করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে।
- চারা লাগানোর সময় ব্লেড বা ধারাল ছুরি দিয়ে পলিথিন ব্যাগটি কেটে নিয়ে ব্যাগটি ফেলে দিতে হবে। তারপর জমাট বাঁধা মাটিসহ চারাটি গর্তে ঠিকমত বসিয়ে চারপাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে।
- খেয়াল রাখতে হবে চারা লাগানোর সময় যেন মাটির বল ভেঙ্গে না যায় এবং চারার শিকড় গর্তের ভিতরে পেঁচিয়ে না যায়।
- চারা রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে যেতে না পারে।

ষ্ট্যাম্প জাতীয় চারা ঃ

- সাধারণতঃ ৬-৯ ইঞ্চি শিকড় এবং ১ ইঞ্চি পরিমান কান্ড রেখে ষ্ট্যাম্প তৈরি করা হয়।
- ষ্ট্যাম্প লাগানোর জন্য আগে থেকে কোন গর্ত করার দরকার নেই।
- একটু বৃষ্টিপাত হলে দা অথবা শাবল দিয়ে চারার শিকড়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ১ ইঞ্চি বেশি গভীর গর্ত করতে হবে।
- গর্তে ষ্ট্যাম্প চারাটি বসিয়ে চারপাশের মাটি ভালকরে চেপে দিতে হবে।
- ষ্ট্যাম্প বসানোর সময় কান্ড ও মূলের সংযোগস্থল মাটির সমতলে রাখতে হবে।
- সেগুন, শিমুল, জারুল, ছাতিয়ান, গামার গাছের চারার পরিবর্তে ষ্ট্যাম্প ভাল হয়।

শিকড় সমেত চারা ঃ

- এ ধরণের চারার বয়স সাধারণতঃ ১-২ বছর হলে নার্সারী হতে তুলে অন্যত্র লাগানো হয়।
- শিকড় সমেত চারা নার্সারী হতে উত্তোলনের অন্ততঃ একমাস পূর্বে চারা খাসীকরণ করতে হবে।

- চারার গোড়ার শিকড় এবং প্রধান মূল কাটার ২০-২৫ দিন পর সম্পূর্ণ চারাটি উত্তোলন করতে হবে এবং চারার গোড়ার মাটি কাটা চট, রশি, খড়, পলিথিন, কলাপাতা বা অন্য কিছু দিয়ে আটকিয়ে বেঁধে রাখা হয়।
- উত্তোলনকৃত চারা ১ সপ্তাহ ছায়ায় রেখে দিতে হবে।
- উত্তোলনের সময় চারাটি যতখানি মাটির নিচে থাকে, রোপণের সময়ও চারাটি মাটির ততখানি নিচে দিতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে গোড়ায় জড়ানো বস্তু সরিয়ে ফেলতে হবে।
- এ ধরণের লাগানোর পর পর গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- আম, কাঁঠাল ইত্যাদির চারার জন্য এ পদ্ধতি উত্তম।

সৃজিত বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ চারা রোপণের পর এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। বনায়ন সফল করতে অন্ততঃ চার বছর পর্যন্ত সতর্কতার সাথে বাগানের চারাগুলো বড় করে তুলতে হবে। চারাগাছের সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নিম্নে ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

পানি সরবরাহ ঃ

- চারা লাগানোর পর পানি দিয়ে চারার গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।
- বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন অনুযায়ী চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে রস না থাকলে চারা গাছ মারা যেতে পারে তাই নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন ঃ

- সৃজিত বাগানে প্রচুর আগাছা জন্মায় এবং তা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে রোপণকৃত চারাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে ফলে চারাগুলো দুর্বল হয়ে মারা যেতে পারে।
- এজন্য সৃজিত বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা অত্যাবশ্যক।
- আগাছা নিয়ন্ত্রনে রাখতে চারা রোপণের ১ম বছরে ৩ বার এবং পরবর্তী বছর সমূহে ২ বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- চারা গাছ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

বেড়া দেওয়া ঃ

- গৃহপালিত গবাদিপশু বাগানের চারাগাছ খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তাই বড় বাগান এলাকার চারিপাশে কঁচা বা অন্য কোন কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া দিতে হবে।
- চারার উচ্চতা বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে।
- বড় ধরণের বাগান সংরক্ষণের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা যেতে পারে।
- ছোট বাগান বা প্রতিষ্ঠানে সৃজিত চারা গবাদিপশুর উপদ্রব হতে রক্ষার জন্য বাঁশের খাঁচা/বেড়া প্রদান করা যেতে পারে।
- ঘেরাবেড়ার উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ও ব্যাস ২ ফুট রাখা দরকার।

মাটি আলগা করণ ঃ

- রোপণকৃত চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা মাঝে মাঝে নিড়ানী দ্বারা আলগা করে দিতে হবে।
- এ কাজ সাধারণতঃ বছরে ২ বার করা হয়।

শূন্যস্থান পূরণ ঃ

- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়।
- যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
- এজন্য নার্সারিতে পর্যাপ্ত চারা আগে থেকেই বড় ব্যাগে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
- শূন্যস্থান পূরণের জন্য চারার বয়স কমপক্ষে ১ বছর হওয়া উচিত।

ডালপালা ছাটাই ঃ

- গাছ একটু বড় হয়ে ক্যানোপি কাছাকাছি মিশে আসলে নিচের দিকে ঝুলে থাকা ডালপালা ধারাল দা দিয়ে কান্ডের খুব কাছাকাছি এবং সমান্তরাল করে কেটে দিতে হবে।
- এভাবে অতিরিক্ত ডালপালা কেটে দিলে গাছের কান্ড সোজা ও বড় হয় এতে ভবিষ্যতে মূল কান্ডটি মূল্যবান কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ছাটাইয়ের সময় মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকায় খাওয়া গাছ ও ডালপালা অবশ্যই কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগ-বালাই দমন ঃ

- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন রকমের রোগ বালাই-এর শিকার হতে পারে।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চারাগাছের আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- রোগের পরিমান বেশি হলে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তি ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে গোলপাতার বনায়ন কৌশল

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ গোলপাতা (*Nypa fruticans*) পামি পরিবারভূক্ত একটি ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যা সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বত্রই কম বেশি জন্মে থাকে। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং উপযোগীতা অত্যন্ত বেশি। উপকূলীয় অঞ্চলে রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, বসতবাড়ীর আশেপাশের নীচু জায়গায় গোলপাতা বনায়ন অধিক লাভজনক, সহজ ও উপার্জন সহায়ক চাষ পদ্ধতি। অতি সহজে এগুলো সুন্দরবনের চেয়েও অধিক হারে বর্ধন সক্ষম প্রজাতি। গোলপাতা গাছ বেশি উঁচু হয়না। সাধারণতঃ এর পাতা ৩-৫ মিটার লম্বা হয় এবং দেখতে অনেকটা নারিকেল গাছের পাতার মতো। সুন্দরবনের তিনটি লবণাক্ত অঞ্চলেই গোলপাতা দেখা যায়। তবে ইহা মিষ্টি পানি অঞ্চল এবং পরিমিত বা মৃদু লোনা পানির অঞ্চলে বেশি জন্মায়।

চিত্র : বেড়ী বাঁধে নদীর পার্শ্বে সৃজিত গোলপাতা বাগান

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে গোলপাতার ভূমিকা অপরিসীম এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ হাজার লোক গোলপাতার উপর নির্ভরশীল এবং এ অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ ঘরবাড়ী গোলপাতা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। শরণখোলা, চাঁদপাই, খুলনা ও সাতক্ষীরা সুন্দরবনের এ ৪টি রেঞ্জের মধ্যে কম লবণাক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ শরণখোলা, খুলনা ও চাঁদপাই অঞ্চলে উঁচু মানের গোলপাতা জন্মে থাকে।

চিত্র : গোলপাতার মঞ্জুরী ও ফুল

চিত্র : গোলপাতার ফুটন্ত মঞ্জুরী ও ফুল

চিত্র : গোলপাতার মঞ্জুরীতে মৌমাছি

চিত্র : গোলপাতার পাকা মঞ্জুরী

চিত্র : গোলপাতার সংগহিত কাঁদি

চিত্র : নার্সারির জন্য সংগৃহিত বীজ

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

(ক) জমির ধরণ/পানির অবস্থান ঃ খাল ও নদীর তীর, বাঁধ, রাস্তার ধার ও চর এলাকা, বসতবাড়ির আশে পাশে যেখানকার মাটি আদ্র ও সিক্ত। জোয়ার ভাটা প্রবণ এলাকায় এর বৃদ্ধি অনেক ভাল।

(খ) মাটির বর্ণনা ঃ পলি ও কর্দমাক্ত মাটি।

(ঙ) বাগান সৃজনের জন্য স্থান নির্বাচনঃ

স্থান নির্বাচন ঃ স্থান নির্বাচন কালে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

- খাল বা নদীর মোহনা ও কিনারায় জেগে ওঠা নতুন চর বা খালি জায়গা নির্বাচন করতে হবে।
- এসব এলাকায় জমি মোটামুটিভাবে সমতল ও উঁচু হতে হবে। নিচু, গর্ত বা বেশি ঢালু জমি পরিত্যাগ করা উচিত।
- নির্বাচিত জমির মাটি মোটামুটিভাবে শক্ত প্রকৃতির, কর্দমাক্ত এবং ঘাস প্রজাতি (যেমন-উরিঘাস, ধানশী, নলখাগড়া, মালিয়া ঘাস, হোগলা পাতা প্রভৃতি) দ্বারা আচ্ছাদিত হতে হবে। বেশি নরম মাটির জায়গা এবং ঘাস জম্মায়নি এমন জায়গা পরিহার করা উচিত।
- নির্বাচিত স্থানে জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হতে হবে। অতিরিক্ত পলি পড়া স্থান এবং জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় না এমন স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

বাগান এলাকা প্রস্তুতকরণ ঃ প্রস্তাবিত এলাকায় অবস্থিত জঙ্গল বিশেষ করে উরিঘাস, ধানশী, মালিয়া ঘাস, নলখাগড়া বা হোগলা পাতাসহ লতাপাতা ও অপ্রোজনীয় গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে। কর্তিত জঙ্গল এলাকা নদী বা খালের তীরবর্তী নীচু হওয়ায় প্রতিনিয়ত জোয়ার ভাটার দ্বারা প্লাবিত হওয়ার কারণে কর্তিত জঙ্গলসমূহ জোয়ারের পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। নতুবা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্তুপাকারে জমা করে রেখে দিলে পরবর্তীতে উহা পঁচে গিয়ে জমিতে জৈব/সবুজ সারে পরিণত হবে। এতে করে প্রস্তাবিত বাগান এলাকা সম্পূর্ণভাবে আগাছা মুক্ত হবে। ফলে গোলপাতার চারা লাগানোর জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চারার দূরত্ব ঃ গোলপাতার চারার মধ্যবর্তী ও সারির দূরত্ব কত হবে তা নির্ভর করে মডেল ও ভবিষ্যতে গাছগুলোর ব্যবহারের উপর। সাধারণতঃ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো এবং পরীক্ষামূলকভাবে সৃজিত বাগানে লাগানো গোলপাতার গাছে বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চারার মধ্যবর্তী ও সারির দূরত্ব ২ মিটার × ২ মিটার উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। এ দূরত্ব হিসেবে প্রতি হেক্টর বাগান সৃজনে ২৫০০টি গোলপাতার চারার প্রয়োজন।

চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় ঃ গোলপাতার মাতৃগাছে সাধারণঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক বীজ পাওয়া যায় তখন তা সংগ্রহপূর্বক প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে বপন দ্বারা চারা উত্তোলন করা হয়। চারার বয়স যখন ৩/৪ মাস হয় তখন উহা লাগানোর উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হয়। এরূপ বয়সের চারাতে ২/৩টি করে পাতা গজায়, বীজগুলো চারাতে সংযুক্ত থাকে এবং চারার উচ্চতা ১ ফুট থেকে ১.৫ ফুট হয়ে থাকে। এরূপ উচ্চতা বিশিষ্ট গোলপাতার চারা আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে লাগানোর সর্বোত্তম সময়। কারণ প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় লাগালে জোয়ার ভাটায় কম পলিমাটি দ্বারা লাগানো চারাগুলো আবদ্ধ হলেও একেবারে চারা সম্পূর্ণ দেহটি মাটির নীচে চলে যাবে না। ফলে চারাগুলো পরিমিত আলো বাতাস পেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভে সক্ষম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বন বিভাগের লোকজন সরাসরি বীজ বা অংকুরিত বীজ প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় এপ্রিল/মে মাসে সরাসরি বপন করে। এক্ষেত্রে জোয়ার ভাটার তীব্রতায় এবং পলিমাটির অধিক স্তরীভূত হওয়ায় অংকুরিত চারা সময়ের ব্যবধানে মাটির অনেক নীচে তলিয়ে যায় এবং বাগান সৃজন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

স্ট্যাকিং ও গর্ত খনন ঃ বাগান এলাকা প্রস্তুতের পরই মডেল ও দূরত্ব অনুসারে (২ মিটার × ২ মিটার) রশি দ্বারা মেপে নির্দিষ্ট স্থানে জঙ্গল থেকে সংগৃহীত গরানের খুঁটি বসাতে হবে (স্ট্যাকিং)। এক হেক্টর বাগানের জন্য উপরোক্ত দূরত্ব অনুসারে প্রায় ২৫০০টি খুঁটি প্রয়োজন হবে। চারা লাগানোর পূর্বে স্ট্যাকিংসমূহের (খুঁটির) গোড়াতে হালকা গর্ত (নরম/কাদামাটির ক্ষেত্রে) বা প্রয়োজনীয় গর্ত (মাটি শক্ত হলে) করে নিতে হবে এবং গর্তের পাশে খুঁটি বা স্ট্যাকিংগুলো পুতে রাখতে হবে। গর্তের গভীরতা এমন হতে হবে যাতে চারাতে সংযুক্ত বীজটি মাটির নীচে প্রবেশ করে।

চারা সংগ্রহঃ ইতিপূর্বে নার্সারিতে উত্তোলিত ৩/৪ মাস বয়সের গোলপাতার চারাগুলো খুব সতর্কতার সাথে কাঁদামাটি থেকে তুলতে হবে যাতে চারাতে সংযুক্ত বীজটি ঝরে পড়ে না যায়। চারাগুলো তোলার পর তার নগ্ন শিকড়ের কাদামাটিগুলো পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় লাগানোর জন্য দেশীয় খোলা নৌকাযোগে পরিবহন করতে হবে। চারা এলাকায় পৌঁছানোর পর লাগানোর নিমিত্তে ঝুড়িতে করে সতর্কতার সাথে প্রতিটি গর্তে সরবরাহ করতে হবে। প্রস্তাবিত বাগান এলাকার নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে নার্সারি সৃজন করা উচিত যাতে কম সময়ে চারাগুলো এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হয়।

চারা রোপণ ঃ সুন্দরবন তথা উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস গোলপাতার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। গোলপাতার চারাগুলো সাবধানে গর্তে বসিয়ে চারার পার্শ্বের মাটি দ্বারা চারার গোড়াতে কচ্ছপের পিঠের মত সামান্য উঁচু (২″ - ৩″) করে ঢেকে দিতে হবে যাতে চারার সংযুক্ত বীজটি ও নগ্ন শিকড়গুলো মাটির অভ্যন্তভাগে প্রবিষ্ট থাকে। চারাগুলো রোপণের পর চারাকে স্ট্যাকিং খুঁটির সাথে রশি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে যাতে চারাটি বা তার পাতাগুলো বাতাসে হেলে না পড়ে।

বাগানের যত্ন ঃ গোলগাছের চারা রোপণের পর চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। একটি সফল বাগান প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৪ বছর যাবৎ কঠোর সতর্কতার সাথে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। চারাগাছের সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুসরণ করা আবশ্যকঃ-

আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় আগাছা ও লতাপাতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় রোপণকৃত চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সৃজিত বাগান সমূহে আগাছা নিয়ন্ত্রণে দিন মজুর নিয়োগ করে ১ম বছরে ৪ বার (৩ মাস অন্তর), ২য় বছরে ৩ বার (৪ মাস অন্তর), ৩য় ও ৪র্থ বছরে ২ বার (৬ মাস অন্তর) আগাছা বাছাই করলে ভাল হয়। উল্লেখ্য যে, চরাঞ্চলে গোলপাতার বাগানে পলিযুক্ত মাটিতে ঘাস জাতীয় আগাছার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় তা দমনে যথা সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গরু ছাগল ও বন্যপশুর উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ ঃ গোলপাতার চারার মোথা বন্য শুকরের প্রিয় খাদ্য বিধায় তা ভক্ষণের জন্য এ প্রাণীর বিচরণ ঘটে থাকে এবং ক্ষতির সম্ভনা থাকে। এ প্রাণীরা মোথা খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ চারাটি নষ্ট করে ফেলে। তাই সৃজিত বাগানে ঘেরা বেড়ার পরিবর্তে লোকবলের দ্বার পাহারার ব্যবস্থা করা গেলে বন্য শুকরের উপদ্রব বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়া সৃজিত বাগানে গরুছাগলের উপদ্রব হতে প্রয়োজনে ঘেরা বেড়া প্রদান করতে হবে।

শূন্যস্থান পূরণ ঃ চারা রোপণের প্রথম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়। তাই যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরের মধ্যে চারা রোপণের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

ভাসমান কচুরীপানা ও শেওলার উপদ্রব ঃ সুন্দরবন তথা উপকূলীয় এলাকায় কম লবণাক্ত পানিতে বর্ষাকাল শেষে শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে হাওড়-বিল থেকে আগত প্রচুর কচুরীপানা এবং শেওলা বা আগাছা জোয়ার-ভাটার পানিতে চরাঞ্চলে সৃজিত গোলপাতার বাগানে প্রবেশ করে থাকে। এতে ভাসমান কচুরীপানা বা আগাছার চাপে রোপণকৃত চারাগুলো নীচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এছাড়া পর্যাপ্ত শেওলা চারাগুলোকে আকড়িয়ে আড়ষ্ট করে মেরে ফেলে। এদের উপদ্রব থেকে চারাগুলোকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ঘেরাবেড়া বা লোকবল দ্বারা প্রতিনিয়ত কচুরীপানা, আবর্জনা ও শেওলামুক্ত রাখা।

রোগ-বালাই দমন ঃ চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

শুকনা পাতা ছাটাই ঃ বাগান উত্তোলনের ২য় বা ৩য় বর্ষে গাছের গোড়ার শুকনা পাতাগুলো ধারাল কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কেটে ফেলতে হবে। এতে গাছগুলো সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠবে।

প্রযুক্তি ঃ সুন্দরবনের খলসি প্রজাতির বনায়ন কৌশল

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট ঃ উপকূলীয় অঞ্চলের নদী, খাল, রাস্তা ও বাড়ীর আশে পার্শ্বে পুকুরপাড়, নীচু জায়গায় মধুবৃক্ষ নামে পরিচিত খলসি বৃক্ষের বনায়ন অত্যন্ত লাভজনক। উল্লেখ্য সুন্দরবনের পশ্চিম অংশে লবণাক্ত অঞ্চলে খলসি প্রজাতি যত্রতত্র নদীর কিনারে জন্মে থাকে। সুন্দরবন হতে বছরে প্রায় ২০০ মেট্রিক টন মধু উৎপাদিত হয়। এ প্রজাতির বৃদ্ধি অলবণাক্ত বা মৃদু লবণাক্ত অঞ্চলেও বর্ধিত হারে জন্মে থাকে। এমনকি বসতবাড়ীর আশে পাশে পুকুর পাড়ে, বাঁধ ও রাস্তার পার্শ্বে খলসি গাছের বৃদ্ধি অধিক হারে লক্ষনীয় এবং মধু উৎপাদন সহায়ক এ প্রজাতির নার্সারি উত্তোলন কৌশল খুবই সহজ। জুলাই-আগস্ট মাসে বীজ বা প্রপাগিউল সংগ্রহ করে পলিব্যাগে সরাসরি সংগৃহীত বীজ বা প্রপাগিউল ডিবলিং পদ্ধতিতে লাগিয়ে দিলেই কয়েক দিনের মধ্যেই চারা গজায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প যত্নে এক বছর পরই উক্ত চারা রোপণ করে খলসি গাছ রোপণ করা লাভজনক ও মধু উৎপাদন করা সম্ভব। মধু অর্থকারী বিধায় খলসি গাছের বনায়ন করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন সহায়ক।

চিত্র : খলসি প্রজাতির বাগান উত্তোলন

খলসি প্রজাতির দ্বারা নতুন চরে সহজে কম খরচে বাগান সৃজন, চর সুরক্ষা, দ্রুত বনায়নের মাধ্যমে মধু উৎপাদন তরান্বিত করন এবং প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়ন যোগ্য ।

খলসি প্রজাতির দ্বারা বাগান সৃজনঃ

চিত্র : খলসি গাছের পুষ্প মঞ্জুরী ও প্রপাগিউল

চিত্র : খলসির নার্সারি

সফলভাবে খলসি প্রজাতির বাগান উত্তোলনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ-

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

বাগান সৃজনের স্থান নির্বাচন ঃ

- যে এলাকায় বাগান সৃজন করতে হবে সেই এলাকা ২/৩ মাস পূর্বেই নির্বাচন করে রাখতে হবে ।
- স্থান নির্বাচনের সময় জমির শ্রেণি ও বনায়নের উপযোগীতা আছে কিনা যাচাই করতে হবে ।

বাগান সৃজনের স্থান প্রস্তুতকরণ ঃ

- নির্বাচিত এলাকার জঙ্গল, লতাপাতা ও অপ্রয়োজনীয় গাছপালা জানুয়ারী মাসে একবার কেটে ফেলতে হবে ।
- বড় গাছের মোথা থাকলে তুলে ফেলতে হবে ।
- কর্তিত জঙ্গল শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনবোধে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- চারা লাগানোর পূর্বে যদি পুনরায় আগাছা জন্মে তাহলে আবার আগাছা ২য় বার পরিস্কার করতে হবে ।

খলসি চারা রোপণের সময় ঃ

- বর্ষা মৌশুমের শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন মাসে খলসি চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় । তবে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে ।
- উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর সেপ্টেম্বর মাসে খলসি চারা লাগানো ভাল ।

স্টেকিং করা ঃ

- স্টেকিং করার মূল উদ্দেশ্য হলো চারা রোপণের স্পট চিহ্নিতকরণ, রোপিত চারাকে খুঁটির সাথে বেধেঁ রাখা এবং মরে যাওয়া চারার স্থান চিহ্নিতকরণ ।
- নির্বাচিত স্থান প্রস্তত করার পর সম্পূর্ণ এলাকায় মে মাসের প্রথম ভাগেই চারা রোপণের স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য নিয়মিত দুরত্বে স্টেকিং করতে হবে ।
- এ কাজে ১ মি. লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি বা কোন গাছের সরু ডালা ব্যবহার করা যেতে পারে ।

খলসি চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করা ঃ

- বর্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি ষ্টেকিং করা খুঁটির গোড়ায় গর্ত তৈরি করতে হবে।
- গর্তের আকার ৬"× ৬" × ৬" আয়তনের হবে এবং গর্তের পার্শ্বে খুঁটিগুলি পুঁতে রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ

- গর্ত হইতে উঠানো টালকৃত মাটির নীচের অংশ প্রথমে এবং উপরের অংশ পরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।
- প্রতিটি গর্তে ১/২ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি এবং ০৫ গ্রাম এমপি সার প্রতিটি গর্তে প্রয়োগ করে কোদাল দ্বারা মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে।
- খলসি চারা লাগানোর ন্যুন্যতম ১০-১৫ দিন পূর্বে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সারের পরিমাণ মাটির প্রকার ভেদে কম বেশি হয়ে থাকে।

খলসি চারা লাগানোর দুরত্ব ঃ ৪ × ৪ ।

চারা রোপণ পদ্ধতি ঃ

- নার্সারী থেকে চারাগুলো সতর্কতার সাথে বাগান করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে।
- চারা লাগানোর সময় ব্লেড বা ধারাল ছুরি দিয়ে পলিথিন ব্যাগটি কেটে নিয়ে ব্যাগটি ফেলে দিতে হবে। তারপর জমাট বাঁধা মাটিসহ চারাটি গর্তে ঠিকমত বসিয়ে চারপাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে।
- চারা লাগানোর সময় যেন মাটির বল ভেঙ্গে না যায় এবং চারার শিকড় গর্তের ভিতরে পেঁচিয়ে না যায়।
- চারা রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে যেতে না পারে।

বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

চারা রোপণের পর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য এবং নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

পানি সরবরাহ ঃ

- চারা লাগানোর পর পানি দিয়ে চারার গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।
- বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন অনুযায়ী চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে রস না থাকলে চারা গাছ মারা যেতে পারে তাই নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন ঃ

- সৃজিত বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা অত্যাবশ্যক।
- আগাছা নিয়ন্ত্রনে রাখতে চারা রোপণের ১ম বছরে ৩ বার এবং পরবর্তী বছর সমূহে ২ বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- চারা গাছ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

ঘেরাবেড়া দেওয়া ঃ

- গৃহপালিত গবাদিপশু এবং বণ্য প্রাণী যেমন হরিণ বাগানের চারাগাছ খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তাই বাগান এলাকার চারিপাশে বেড়া দিতে হবে।
- চারার উচ্চতা বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে।

- বড় ধরণের বাগান সংরক্ষণের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা যেতে পারে।

মাটি আলগা করণ ঃ

- রোপণকৃত চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা মাঝে মাঝে নিড়ানী দ্বারা আলগা করে দিতে হবে।
- এ কাজ সাধারণতঃ বছরে ২ বার করা হয়।

শূন্যস্থান পূরণ ঃ

- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়।
- যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
- এজন্য নার্সারিতে পর্যাপ্ত চারা আগে থেকেই বড় ব্যাগে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
- শুন্যস্থান পূরণের জন্য চারার বয়স কমপক্ষে ১ বছর হওয়া উচিত।

রোগ-বালাই দমন ঃ

- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন রকমের রোগ বালাই-এর শিকার হতে পারে।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চারাগাছের আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- রোগের পরিমান বেশি হলে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

পাটি এবং মোড়া তৈরি

প্রযুক্তি ঃ পাটি এবং মোড়া তৈরি পদ্ধতি

ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার এ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে যাদের বসত বাড়ীতে ছায়াযুক্ত অথবা পুকুরের পাশে ছায়াযুক্ত পতিত জায়গা আছে সেখানে পাটি গাছ লাগানো সম্ভব। প্রযুক্তিটি নোয়াখালী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

প্রযুক্তির বৈশিস্ট্য সমুহ ঃ

দরিদ্র জনগোষ্টীর বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পাটি গাছ থেকে পাটি উৎপাদন এবং মোড়া তৈরির ক্ষেত্রে ধারোলো অস্ত্র এবং যন্ত্র ব্যবহার করে মসৃণ ও নানান নকশী বুননের মাধ্যমে সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। ভালো পাকা পাটি গাছের কান্ড, বড় কান্ড, শক্ত ঘন বুনন, মিহি বুনন ও শক্ত বাঁধনের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যে শক্তি বাড়ানো হয়। ভালো মোড়ার ক্ষেত্রে শক্ত, পাঁকা বাশ দিয়ে শলা তৈরি করা এবং শক্ত ও নমনীয় প্লাস্টিক বেতি ব্যবহার করতে হবে। শিল্পদ্রব্য যাতে সহজে না পঁচে ও ঘুন পোকায় খেয়ে নষ্ট না করতে পারে সেজন্য ৫% বোরিক পাউডারের পানির দ্রবণে শিল্পদ্রব্য ২-৩ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলে ভালো শোধন হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ

পাটি ঃ

পাটি তৈরির উপকরন ঃ

ক) পাটিগাছ
খ) রং
গ) প্লাস্টিক বেতি
ঘ) হাড়ি
ঙ) পানি
চ) দা ইত্যাদি

পাটি তৈরির কাজ সমূহ ঃ

পাটি গাছ সংগ্রহ ঃ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পাটি গাছের ৩-৫ হাত লম্বা সবুজ কান্ড সংগ্রহ করা হয়। সাধারনত : এক থেকে দেড় বছর বয়সের গাছের কান্ড সংগ্রহ করা হয়।

বেতি উঠানো এবং কান্ড রং করা ঃ সংগৃহীত পাটিগাছের কান্ড থেকে দাঁ দিয়ে বেতি উঠানো হয় এবং যেসব বেতি রং করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে কান্ডগুলোর উপরের সবুজ আবরন চাকু দিয়ে ঘষে উঠিয়ে ফেলা হয়, এর পর রং করে রৌদ্রে শুকিয়ে বেতি উঠানো হয়। রং করা বেতি সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

পানিতে সিদ্ধ করা ঃ পাটিগাছের কান্ড হতে ছাড়ানো বেতি ২.৫-৩.০ ঘন্টা সিদ্ধ করে নিতে হয়।

রৌদ্রে শুকানো ঃ সিদ্ধ করা বেতি রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। পাটি তৈরির ক্ষেত্রে বেতি যত পাতলা এবং চিকন হয় পাটি তত মসৃণ এবং শীতল হয়। সাধারনত বাজারে যেসব পাটি পাওয়া যায় সেসব পাটির বেতি ১-২ মিমি চওড়া হয়ে থাকে। হাতে বুননের মাধ্যমে এসব শীতল পাটি তৈরি করা হয়। ৩-৪ হাত মাপের একটি শীতল পাটি তৈরি করতে ১৬০-১৮০ টি পাটিগাছের বেতি ব্যবহার করা হয় এবং ৩.৫-৪.৫ হাত মাপের একটি পাটি তৈরিতে ২০০-২৪০ টি পাটিগাছের বেতি ব্যবহার করা হয় । একটি পাটির বেতি রং করতে ১৫-২০ টাকার রংয়ের প্রয়োজন হয়। ৩-৪ হাত মাপের একটি পাটি ৫-৬ দিন (খন্ডকালীন সময় ৪-৫ ঘন্টা/দিন/জন) এবং ৩.৫-৪.৫ হাত মাপের একটি পাটি ৬-৭ দিনে তৈরি করা যায়।

মোড়া ঃ মোড়া তৈরি।

আপদকালীন সময়ে এবং অবসরে পাটি ও মোড়া তৈরি করে বাড়তি আয় করতে পারবে। সাধারনত নারীরা এ ধরনের কাজ করে থাকে। আপদকালীন সময়ে পাটি ও মোড়া বিক্রি করে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকে।

মোড়া তৈরির উপকরন ঃ

১) বাঁশ

২) সুতলী

৩) বিভিন্ন রং এর প্লাষ্টিক বেতি

৪) দা

৫) রিকশা/সাইকেলের পুরানো টায়ার ইত্যাদি

শলাকা/ কাঠি তৈরি ঃ

সাধারনত মজবুত টেকসই মোড়া তৈরির ক্ষেত্রে পাকা বাঁশের শক্ত শলাকা ব্যবহার করা হয়। তাই সংগৃহিত পরিপক্ক বাঁশ থেকে দা দিয়ে কেটে ১-১.৫ ফুট মাপের শলাকা তৈরি করা হয়। বাঁশ ভেদে প্রতিটি বাঁশ হতে ৪০০-৬০০ টি শলাকা তৈরি হয়। প্রতিটি শলাকার পরিধি ৪-৭ মিমি।

মোড়া তৈরির পদ্ধতি ঃ

মোড়া তৈরিতে শক্ত শলাকা ব্যবহার করা হয় এবং মোড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন রং এর প্লাষ্টিক বেতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বাঁশের শক্ত মজবুত শলাকা গুলো মাটিতে রেখে আড়াআড়ি করে একটার পর একটা শলাকা গেথে মাঝখানে প্লাষ্টিক বেতি দিয়ে বেধে মোড়ার কাঠামো তৈরি করা হয় এরপর উপরে সুতলী দিয়ে টানা বাধ দেওয়া হয়। উপর এবং নিচে টায়ার পেচিয়ে বেধে উপরে প্লাষ্টিক বেতি দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের বুনন করা হয়। একটি মোড়া বানাতে ২-৩ দিন সময় লাগে খন্ডকালীন সময়ে ৩-৪ ঘন্টা/জন/দিন। প্রতিটি মোড়া তৈরিতে ২০০ শলাকা, ১৫০ গ্রাম রঙিন বেতি এবং ২ টাকার সুতলী ব্যবহার করা হয়।

লাভ ক্ষতির বিবরণ ঃ

পাটির আয়-ব্যয় : মহিলারা সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে পাটি তৈরির কাজ করে এবং এক মাসে ৫টি পাটি তৈরি করে। নিম্নে ৫টি পাটি তৈরির আয় ব্যয় হিসাব দেখানো হলো ঃ

আয় (টাকা)	*ব্যয় (টাকা)*
৫টি পাটির মূল্য ৫০০ × ৫ = ২৫০০.০০	১। পাটিগাছ ১২০০টি ×১.০০ = ১২০০.০০ ২। রং ২০ × ৫ = ১০০.০০ ৩। প্লাস্টিক বেতি = ১০০.০০ ৪। অন্যান্য = ১০০.০০
মোট আয় = ২৫০০.০০	= ১৫০০.০০
নীট মুনাফা = ২৫০০-১৫০০=১০০০.০০	

মোড়ার আয়-ব্যয় ঃ গৃহস্থালীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময় কাজে লাগিয়ে মাসে ১০টি মোড়া তৈরি করা হয়। যার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ব্যয় (টাকা)	*আয় (টাকা)*
মুলি বাঁশ ৫টি × ৩০ = ১৫০.০০ রঙিন প্লাস্টিক বেতি ১.৫ কেজি × ১০০ = ১৫০.০০ সুতলী = ৫০.০০ পুরোনো টায়ার ৫টি × ৩০ = ১৫০.০০	মোড়া বিক্রি : ১০ টি × ১০০= ১০০০.০০
মোট ব্যয় = ৫০০.০০	= ১০০০.০০
মোট আয় = ১০০০-৫০০ = ৫০০	

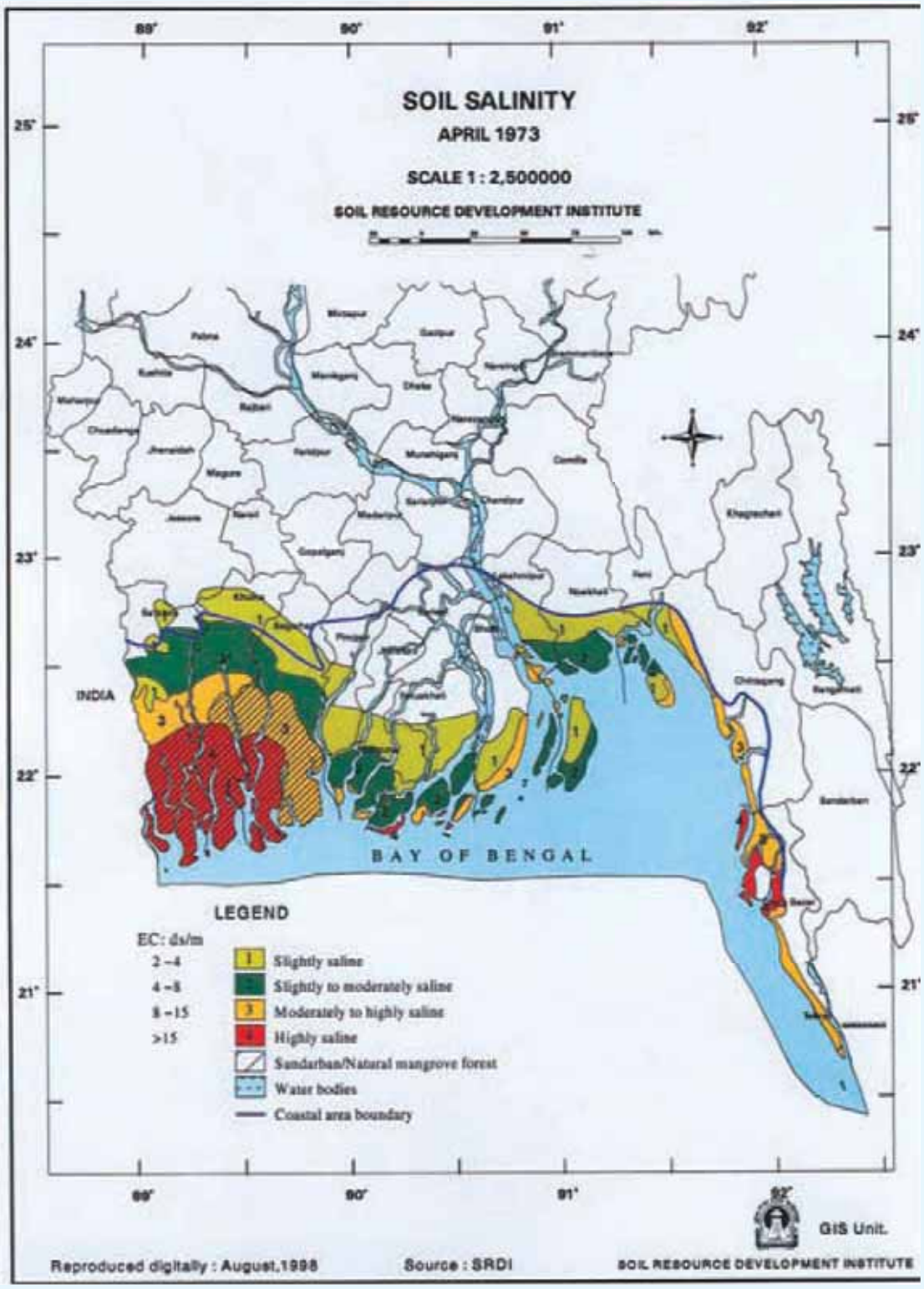
SOIL SALINITY
APRIL 1973
SCALE 1 : 2,500000
SOIL RESOURCE DEVELOPMENT INSTITUTE
INDIA
BAY OF BENGAL
LEGEND
EC: ds/m
2 – 4
4 – 8
8 – 15
>15
1 Slightly saline
2 Slightly to moderately saline
3 Moderately to highly saline
4 Highly saline
Sundarban/Natural mangrove forest
Water bodies
Coastal area boundary
GIS Unit.
Reproduced digitally : August,1998
Source : SRDI
SOIL RESOURCE DEVELOPMENT INSTITUTE

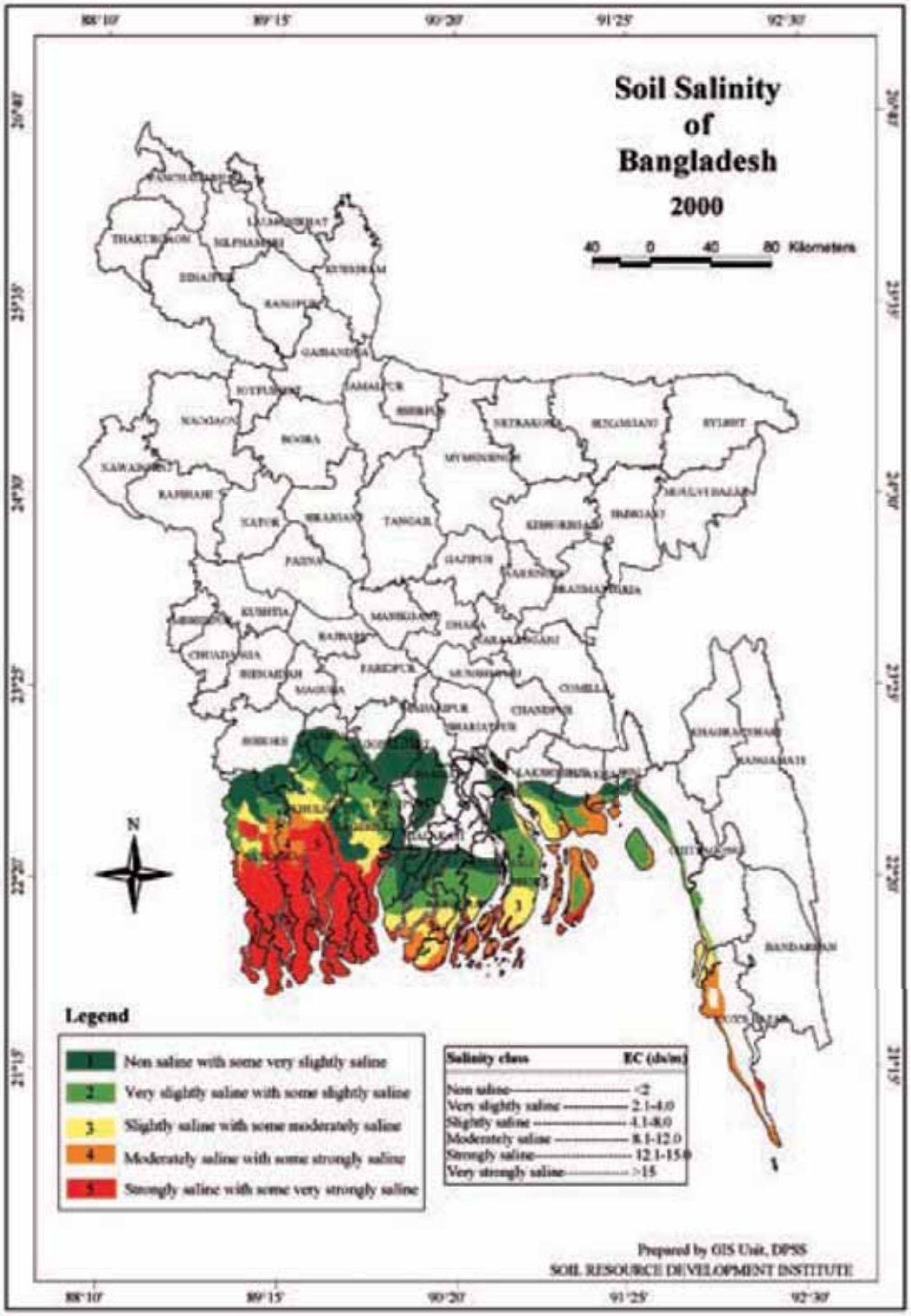
Soil Salinity
of
Bangladesh
2000
40 0 40 80 Kilometers
N
Legend
1 Non saline with some very slightly saline
2 Very slightly saline with some slightly saline
3 Slightly saline with some moderately saline
4 Moderately saline with some strongly saline
5 Strongly saline with some very strongly saline
Salinity class EC (ds/m)
Non saline <2
Very slightly saline 2.1-4.0
Slightly saline 4.1-8.0
Moderately saline 8.1-12.0
Strongly saline 12.1-15.0
Very strongly saline >15
Prepared by GIS Unit, DPSS
SOIL RESOURCE DEVELOPMENT INSTITUTE

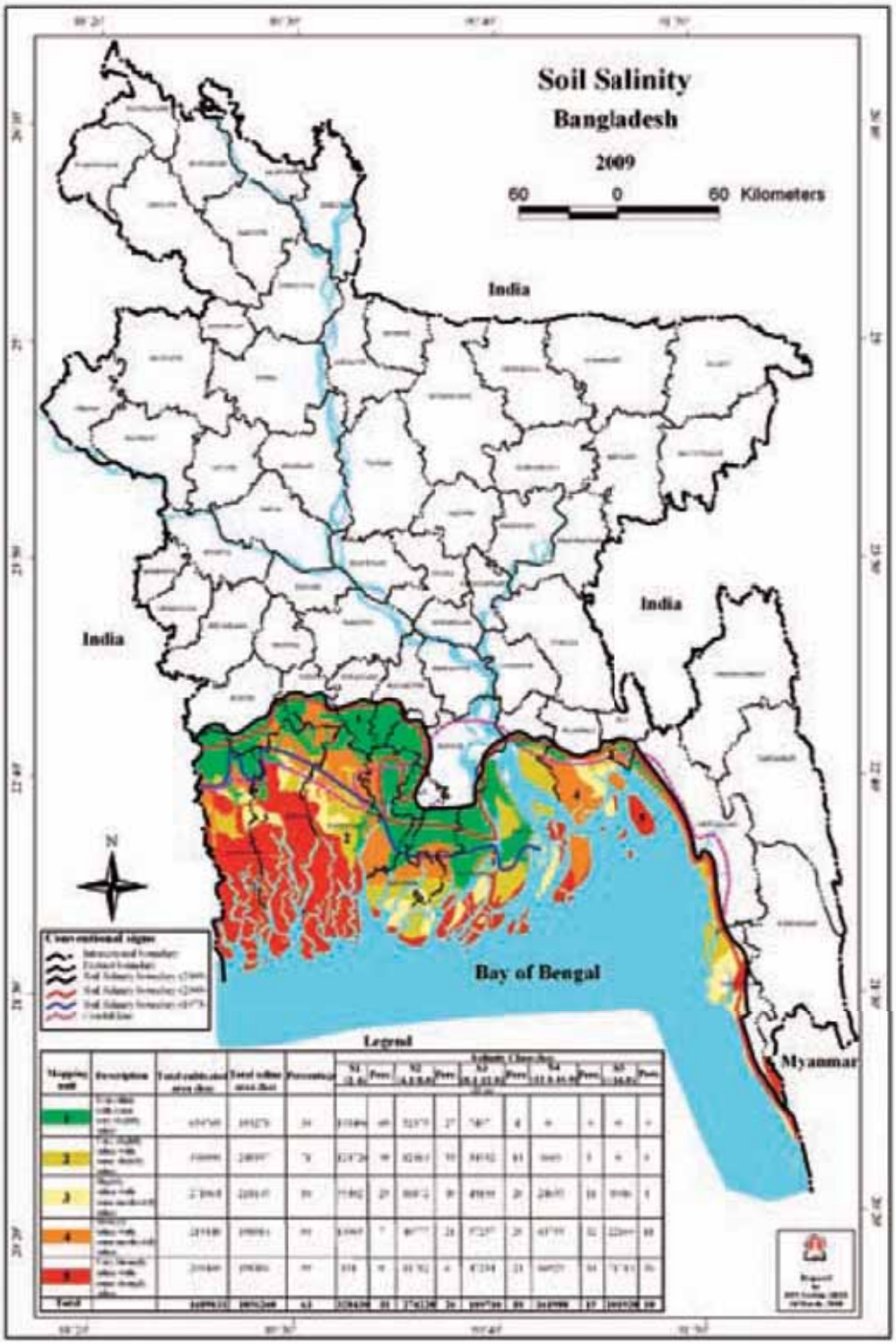
Soil Salinity
Bangladesh
2009
60 0 60 Kilometers
India
India
India
Bay of Bengal
Myanmar
N
Legend

”দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি ”
পুস্তিকায় তথ্য প্রদানকারী ইনস্টিটিউট ও বিজ্ঞানীবৃন্দের তালিকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. মদন গোপাল সাহা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর ।
ড. গোলাম মোর্শেদ আব্দুল হালিম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর ।
ড. মোঃ মসিউর রহমান, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর ।
ড. বাবুল চন্দ্র সরকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর ।
ড. মুন্সী রাশীদ আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর ।
মোছাম্মদ মাসুদা খাতুন, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর ।
ড. প্রশান্ত কুমার সরদার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, খুলনা ।
ড. মুহাম্মদ মহীউদ্দীন চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, নোয়াখালী ।
ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম খান, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ,বরিশাল ।
মোঃ আতিকুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, এআরএস, সাতক্ষীরা ।
ড. এইচএম খায়রুল বাসার, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, পটুয়াখালী ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. এফআইএম মঈনুদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কার্য্যালয়, সাতক্ষীরা ।
ড. মুহম্মদ নাসিম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গাজীপুর ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. রহিমা খাতুন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ঢাকা ।
ড. মোঃ মজিবুর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ঢাকা ।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. এসএম নুরুন্নাহার, পরিচালক (গবেষণা), ঈশ্বরদী, পাবনা ।
খলিফা শাহ আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উপকেন্দ্র, বরিশাল ।
মোঃ সাউরুখ হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী, পাবনা ।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. এম রাইসুল হায়দার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ ।
মোঃ কামরুজ্জামান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উপকেন্দ্র, সাতক্ষীরা ।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক, ঢাকা ।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

বিধান কুমার ভান্ডার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খুলনা ।
মোঃ নাজমুল হাছান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ঢাকা ।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. শ্যামলুন্দু বিকাশ সাহা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা।

সৈয়দ লুৎফর রহমান, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ডা: মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. মোঃ মাসুদুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা, ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ, খুলনা।

তথ্যনির্দেশঃ

১। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকায় ৩০ মার্চ ২০১৩ তারিখে কর্মশালায় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ।

২। কৃষি প্রযুক্তি হাত বই (খন্ড-১) ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর পৃঃ ১-৪৮৮।

৩। পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, ২০০৮, পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

৪। নির্বাচিত কৃষি প্রযুক্তি ম্যানুয়েল, ২০০৮, কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (এটিটি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, পৃঃ ১-২৯।

৫। বিএআরআই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন কর্মশালার নিবন্ধনসমূহ ২০০৫ প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। পৃঃ ১-১৩৯।